হোমো সাপিয়েন্স

RETELLING OUR STORY

ডা. রাফান আহমেদ

সমর্পণ

www.QuranerAlo.net

হোমো সাপিয়েনস

RETELLING OUR STORY

বইটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি Hard Copy সংগ্রহ করে অথবা লেখক বা প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানকে সৌজন্য মূল্য প্রদান করে সহযোগিতা করুন।

www.QuranerAlo.net

Contents

লেখকের অন্যান্য বই :

বিশ্বাসের যৌক্তিকতা (বেস্ট সেলার)
অবিশ্বাসী কাঠগড়ায় (বেস্ট সেলার)
প্রত্যাবর্তন (সহলেখক। বেস্ট সেলার)
অবিশ্বাসের বিভ্রাট (সহলেখক)
বিজ্ঞান আলাপন : ইসলাম, বিজ্ঞান, বিবর্তন (সহলেখক। প্রকাশিতব্য)

www.QuranerAlo.net

Contents

হোমো স্যাপিয়েনস

RETELLING OUR STORY

ডা. রাফান আহমেদ

সমর্পণ
প্রকাশন

www.QuranerAlo.net

গ্রন্থস্বত্ব © সংরক্ষিত ২০২০

প্রথম মুদ্রণ : একুশে বইমেলা ২০২০
দ্বিতীয় মুদ্রণ : একুশে বইমেলা ২০২০
তৃতীয় মুদ্রণ : একুশে বইমেলা ২০২০
চতুর্থ মুদ্রণ : একুশে বইমেলা ২০২০

ISBN: 978-984-8041-52-9

পৃষ্ঠাসজ্জা ও ইলাসট্রেশন : রাফান আহমেদ
কাভার ডিজাইন : মুহাম্মদ শরীফুল আলম
মুদ্রণ ও বাঁধাই : বই কারিগর, ০১৯৬ ৮৮ ৪৪ ৩৪৯
অনলাইন পরিবেশক : রকমারি.কম, ওয়াফি লাইফ
একমাত্র পরিবেশক : ইতি প্রকাশন
প্রকাশক : আহমাদ রোকন উদ্দিন

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য: ৩৯২ টাকা মাত্র

সমর্পণ প্রকাশন

৩৪, মাদরাসা মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা।
+৮৮ ০১৭৭৯ ১৯ ৬৪ ১৯
facebook.com/somorponprokashon

Homo Sapiens : Retelling Our Story by Dr. Rafan Ahmed
Published by Somorpon Prokashon, Dhaka, Bangladesh.

First Edition in 2020. BDT ৳ 392, USD $ 7.00, GBP £ 5

www.QuranerAlo.net

www.QuranerAlo.net

অভিমত

"A magician's trick may look amazing and bewildering. But it only takes one secret to be unveiled to see the trick for what it is. Dr Rafan gives hard hitting facts that expose Scientism for what it is. This is a must read for Muslim youth across the world.

- Subboor Ahmad, MA (Philosophy), Birkbeck, University of London
Public Speaker & outreach specialist of iERA
Co-author - The Failed Hypothesis (upcoming)

"রাফান আহমেদের 'হোমো স্যাপিয়েনস : রিটেলিং আওয়ার স্টোরি' বইটির পাণ্ডুলিপি পড়লাম। বইটি সুলিখিত। তথাকথিত বিজ্ঞানমনস্কদের নানা ধরনের বুজরুকি ও জালিয়াতি এতে আলোকপাত করা হয়েছে। যিনি বিজ্ঞানচর্চা করেন তিনি বিজ্ঞানী। কিন্তু যিনি বিজ্ঞানের ভুল ব্যাখা ও অপপ্রয়োগের মাধ্যমে বিশেষ কিছু অধিবিদ্যাগত সমস্যাকে নিজের মনোমতো করে সমাধান করতে চান, আমার ভাষায় তিনি হলেন বস্তুবাদী, ভাববাদীর মতো বিজ্ঞানবাদী। ডা. রাফান অত্যন্ত সহজ ভাষায় তথ্য ও প্রমাণ উপস্থাপন করে বিজ্ঞানবাদিতার এই ট্রেন্ডকে সিস্টেমেটিকেলি রিফিউট করেছেন। নাস্তিকতার নামে বিজ্ঞান-ধর্মের অনুসারীদের স্বরূপ উন্মোচনে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

- মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, সহযোগী অধ্যাপক (দর্শন বিভাগ), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

"জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিজ্ঞান-দর্শন, ইতিহাস, রাজনৈতিক আর আদর্শিক টানাপড়নের পটভূমিতে, মানুষ ও তার অস্তিত্বের গল্পকে লেখক অসাধারণ সহজবোধ্য গল্প-কথনে ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন। A tour de force into the story of *Homo sapiens*' universe!

- রইসউদ্দিন রাকিব, BS (Hons), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
সহলেখক - বিজ্ঞান আলাপন : ইসলাম, বিজ্ঞান, বিবর্তন (প্রকাশিতব্য)

www.QuranerAlo.net

সাধারণ মানুষের মাঝে প্রচলিত 'পপসাইন্স' বিজ্ঞানের সাথে অ্যাকাডেমিক বিজ্ঞানের বিশাল দূরত্ব লক্ষ করা যায়! বক্ষ্যমাণ বইতে দেশে প্রচলিত বিজ্ঞানবই ও পাঠ্যপুস্তক সামনে রেখে, পশ্চিমা বিজ্ঞান একাডেমিয়ার তথ্যসূত্র টেনে এই বাস্তবতাকে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। লেখক স্বীয় গবেষণায় দেখেছেন—আজকের বিজ্ঞান যতটা না নিরপেক্ষভাবে প্রকৃতির স্বরূপ জানার চেষ্টায় লিপ্ত, তার থেকেও বেশি অঙ্গীকারবদ্ধ স্বীয় প্রকৃতিবাদী মতাদর্শের প্রতি। এমন মানসিকতাকে নিশ্চয়তা লাভের একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে অবলম্বন করা সুস্থচিন্তার জন্যে মারাত্মকভাবে বাধাস্বরূপ। বিজ্ঞানবাদিতার ইতি টানতে, সুস্থধারার বিজ্ঞানচর্চায় উদ্বুদ্ধ করতে এবং সমসাময়িক বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞানের নবদর্শনে এই বইটি শিক্ষার্থী এবং আগ্রহীদের উপকারে আসুক—এই কামনা করি।

- মাহদী ইসলাম, MBBS, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ

বিজ্ঞানের নামে বিজ্ঞানবাদিতা গিলতে চাই না। বরং সত্যিকারের বিজ্ঞানকে জানতে, বুঝতে ও চর্চা করতে চাই। আর এই আকাঙ্ক্ষা পূরণে ডা. রাফানের বইটি উপকারী হবে বলে মনে করি।

- আবু ইউসুফ সুমন, Dept. of Biochemistry & Biotechnology, USTC
তরুণ ছড়াকার

বিজ্ঞান আধুনিক সভ্যতার এক আশীর্বাদ বলা যায়। কিন্তু এই বিজ্ঞানকে অপপ্রয়োগ ও অপব্যাখ্যা করে একটি মহল কীভাবে স্রষ্টার অস্তিত্বকে মিথ্যা প্রমাণের হীনচেষ্টা করে আসছে—তার কিছু নমুনা উপস্থাপন করা হয়েছে 'হোমো স্যাপিয়েনস : রিটেলিং আওয়ার স্টোরি' বইতে। বিজ্ঞানকে কীভাবে প্রায় ধর্মের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, এর বিভিন্ন দিককে একটা নির্দিষ্ট ছাঁচের মধ্যে ফেলে দিয়ে কীভাবে মানুষকে নিরিশ্বরবাদী দর্শনের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে—তা দলিল-সহ এই বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বিভিন্ন দেশের মতো আমাদের দেশের পাঠ্যপুস্তকগুলোতেও এই কালো-ছায়ার বিস্তার ঘটেছে। লেখক আলোচ্য-বইতে এই কালো-ছায়াকে হঠিয়ে সত্যের আলো দ্বারা বিষয়গুলোকে পাঠকের সামনে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছেন। কিশোর ও তরুণদের জন্য বইটি খুব উপকারী হবে।

- মুহাম্মদ মুশফিকুর রহমান মিনার, ECE, KUET
লেখক - অন্ধকার থেকে আলোতে ১, ২, ৩
সহলেখক - প্রত্যাবর্তন, সত্যকথন, অবিশ্বাসের বিভ্রাট

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের এই যুগে অনেকেই সৃষ্টি রহস্যের বৈজ্ঞানিক যুক্তি খুঁজে নিতে চান। এমন মানুষদের ও বিশেষ করে তরুণদের চিন্তা জগতে এক নতুন দিক উন্মোচনে বইটি সাহায্য করবে। বিজ্ঞানের সাইনবোর্ড হাতে নাস্তিকতার অনুপ্রবেশ ঠেকাতে রাফান আহমেদ ভাইয়ের এই নেক প্রয়াসকে আল্লাহ তায়ালা কবুল করুন। আমীন।

- ডা. সাফায়েত উল কবীর, MBBS, ঢাকা মেডিকেল কলেজ

www.QuranerAlo.net

যে ধর্মীয় মূল্যবোধ, নীতি ও নৈতিকতাকে কেন্দ্র করে আরবরা জ্ঞানবিজ্ঞানের মশাল জ্বেলেছিল, আজ সেই বিজ্ঞানকে ব্যবহার করে মানুষকে জড়বাদ ও ভোগবাদে দীক্ষিত করা পাশ্চাত্যের একটি ট্রেন্ড। বিজ্ঞানকে ধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বী বানিয়ে তোতাপাখির মতো পশ্চিমের অনুকরণের থেকে সতর্ক করতে এই বইটি উপকারী হতে পারে। তথ্যবহুল এই বইয়ের প্রতিটি টপিক এ রয়েছে লেখকের পরিশ্রমের ছোঁয়া।

- ডা. তানবীর আহমেদ, MBBS, MD (Respiratory Medicine)
কলকাতা, ইন্ডিয়া

ডা. রাফান বর্তমানের তরুণ লেখকদের একজন। ইতোমধ্যে তার দুটো বই—'বিশ্বাসের যৌক্তিকতা' এবং 'অবিশ্বাসী কাঠগড়ায়' ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে। রাফানের লেখনীর উল্লেখযোগ্য দিক হলো—বস্তুবাদীদের রেফারেন্স নিয়ে এসে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা। মহাবিশ্বের উৎপত্তি, প্রাণের উৎপত্তি এবং প্রজাতির বিবর্তন নিয়ে মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক পাঠ্যপুস্তক এবং প্রচলিত বিজ্ঞান বইগুলোতে যে বয়ান দেওয়া হয়েছে, তাকে প্রমাণ ও যুক্তির নীরিখে যাচাই করা হয়েছে তার বক্ষ্যমাণ বইতে। রেফারেন্স হিসেবে নিয়ে আসা হয়েছে অ্যাকাডেমিক বইপত্র, পিয়ার রিভিউড গবেষণাপত্র, বিবর্তনবাদী ও বস্তুবাদী ভাবুকদের মুখনিঃসৃত বাণীকে। বিজ্ঞানের দর্শনকে সহজ ভাষায় বুঝিয়ে স্পষ্ট করে দেখানো হয়েছে—যারা বিজ্ঞানকে বিশ্বাসমুক্ত ও একমাত্র নির্ভরযোগ্য জ্ঞান বলে দাবি করে, তারা নিজেরাই বিশ্বাসকে ভিত্তি হিসেবে ধরে বিজ্ঞান পরিচালনা করে। এসকল মানুষের মুখোশ মোচন করে, বিজ্ঞানকে তাদের আগ্রাসন থেকে বাঁচানোর স্বপ্নে বইটি রচিত।

- ডা. আব্দুল্লাহ সাঈদ খান, MBBS (DMC), BCS (স্বাস্থ্য), FCPS (শেষ পর্ব)
MPH (3rd semester), North South University, Dhaka

বিজ্ঞান আর বিজ্ঞানবাদের মধ্যে পার্থক্য জানতে হবে বিজ্ঞানের প্রত্যেক ছাত্রকে। যারা সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বাধীন ইচ্ছার ঢোল পেটায়, যারা মুক্তচিন্তার ফাঁপরবাজি করে; তারাই লুকোছাপা করে নিজেদের তত্ত্ব প্রমাণের দাবি করছে। চিন্তাকে বদ্ধ করে একমুখী স্রোতে ঠেলছে। আলোচনার সাথে সমালোচনাও পাশাপাশি রেখে কোথায় মুক্তচিন্তার পরিবেশ তৈরি করবে, করছে উল্টোটা। এরকম এক চিন্তার খরায় রাফান আহমেদের 'হোমো স্যাপিয়েনস : রিটেলিং আওয়ার স্টোরি' এক পশলা বৃষ্টি। বিজ্ঞানবাদের কারচুপি থেকে শুরু করে ডারউইনিজমের ফাঁক-ফোকর সব উঠে এসেছে আলোচনায়। পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার খুঁটি ভোগবাদ-বস্তুবাদের সহযোগী এই ডারউইনিজম। দার্শনিক ভিত্তির উপর বিজ্ঞানবাদের কারসাজি সাজিয়ে ফ্যাক্ট হিসেবে গেলানো হচ্ছে আমাদের। সময় এখন সচেতন হবার। বিশেষ করে, নবম-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা, যারা বিজ্ঞানবাদে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে, তাদের কাছে বইটা পৌঁছোনোর অনুরোধ।

- ডা. শামসুল আরেফীন, MBBS (ShMC), BCS (স্বাস্থ্য)
লেখক - ডাবল স্ট্যান্ডার্ড ১ ও ২, কষ্টিপাথর, মানসাঙ্ক, কুররাতু আইয়ুন

www.QuranerAlo.net

ইতোমধ্যেই ডাক্তার ভাইয়ার একাধিক বই প্রকাশিত হয়েছে। পাঠকসমাজে বইগুলো যথেষ্ট সুনাম কুড়িয়েছে। এই বইয়ের ব্যাপারে বলব—মিথ্যের কুহেলিকা উদ্‌ঘাটন করতে বইটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে, ইন শা আল্লাহ।

প্রভু আমার! জ্বালিয়ে দাও আর-বার,
অগ্রজ রাফানের শানিত কলমের ঝংকার।
দূর হোক সাহিত্য-মাঝে যত জাহিলি-আঁধার,
সত্যের জয় হোক, জয় হোক ঈমানের দীপ্ত-শিখার।

- জাকারিয়া মাসুদ
লেখক - সংবিৎ, ভ্রান্তিবিলাস, তুমি ফিরবে বলে

মডার্নিজমের প্রভাবে সায়েন্টিফিক ন্যাচারালিজমকে এমনভাবে জনপ্রিয় করে তোলা হয়েছে, যাতে সাধারণ বিজ্ঞানপাঠকের মনে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে একটা খণ্ডিত ধারণা জন্মায়। একদিকে বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতাগুলো অস্বীকার করা হয়, আরেকদিকে বিজ্ঞানকে পূত-পবিত্র ও নিরপেক্ষ দেখানোর চেষ্টা চলে। অথচ বৈজ্ঞানিক সমাজ আর দশটা মানবীয় সমাজের মতোই; নিউটন আর লিবনিজের সেই ভুবনবিখ্যাত দ্বন্দ্বের মতো হাজারো নোংরা আক্রমণ-প্রতি আক্রমণে কলুষিত। বিবর্তন তত্ত্ব নিয়েও একই জিনিস হয়েছে। এই তত্ত্বের হাজারো জটিলতা ও সীমাবদ্ধতাকে এড়িয়ে একটা সরলীকৃত জনপ্রিয় ভার্শনকে কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রদের সামনে "পরম সত্য" হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে বছরের-পর-বছর। এই মিথগুলো গুঁড়িয়ে দেবার লক্ষ্যে প্রিয় রাফান আহমেদ ভাইয়ের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা, অন্তরকে পুলকিত করল।

- মুহাম্মাদ জুবায়ের, BS (EEE), BUET
সহলেখক - চয়ন। সম্পাদক - অবিশ্বাসী কাঠগড়ায়, প্রদীপ্ত কুটির, ভ্রান্তিবিলাস

বিশ্বের উৎপত্তি, সময়ের আর্বিভাব থেকে প্রাণের উৎপত্তি বিষয়গুলোর উপর আমাদের বিজ্ঞানীদের মহলে একধরনের বস্তুবাদী ও একপাক্ষিক বয়ান প্রায়ই শোনা যায়। বিষয়গুলো এমনভাবে জনসাধারণের মাঝে তুলে ধরা হয় যেন প্রতিটি বাণীই মহাসত্য, ধ্রুব ও চিরন্তন! কিন্তু পপসাইন্স ও প্রকৃতিবাদ এর বাইরে গিয়ে নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বোঝা যাবে, বিজ্ঞানীরা অনেক অমীমাংসিত বিষয় লুকিয়ে রেখেছেন! রাফান রাহমেদের বইটি জ্ঞান, বিজ্ঞান ও সভ্যতা নিয়ে নবচিন্তায় উদ্‌বুদ্ধ করবে, পাশাপাশি আমাদেরকে ঐশ্বরিক জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তার ইঙ্গিত দেবে। বইটির বহুল প্রসার কামনা করছি।

- নাজমুল সরদার আশিক, EEE, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়।
Campus Ambassador,
International Astronomy and Astrophysics Competition

www.QuranerAlo.net

Contents

এক নজরে

ফরওয়ার্ড ১৩

নক্ষত্রের কোরাস ১৬
ঝরনার কথা ২১
মহাকাশে নৃত্য ২৭
মহাবিস্ফোরণ এবং অতঃপর ৩০
বিনি সুতোর মালা ৩৭
বিজ্ঞানের গান ৪৪
ল্যাবরেটরির অন্তঃপুর ৫১
বিবর্তনের ইতিবৃত্ত ৬০
বিবর্তনচিন্তার কাঠামো ৬৯
বুদবুদ রহস্য ৭৯
প্রাণের গান ৮৬
হেকেলের ভণ্ডামো ৯৪
পাথরের মাঝে ১০০
কঙ্কালের কান্না ১০৯
দি মিথ অফ ১% ১১৭
রয়েছ নয়নে নয়নে ১২২
এপেন্ডিক্স সরগরম ১২৯
দি ডিসেপশন পয়েন্ট ১৩৮

পরিশিষ্ট ১ ও ২ ১৪৫
কৃতজ্ঞতা-স্বীকার ১৫১
তথ্যসূত্র ও কিছু কথা ১৫২
সন্ধান ১৭৯

www.QuranerAlo.net

ফরওয়ার্ড

অনেক বছর ধরে ইনফ্লেশন তত্ত্ব, বিবর্তন তত্ত্বকে 'নিশ্চিত সত্য' বলে প্রচার করা হচ্ছে। যদিও এই তত্ত্বগুলো নিয়ে অজস্র প্রশ্ন, খটকা রয়ে গেছে। তাই, সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে গেলে এসব প্রশ্নের উত্তর আসা আবশ্যক। সাধারণ পাঠকের পক্ষে এই বিদ্যার অলিগলির ভিতরে গিয়ে খতিয়ে দেখার সময় সুযোগ হয় না। সেজন্য তরুণ লেখক ও চিকিৎসক ডা. রাফান এ বিষয়টি বিজ্ঞানের আতশকাচে খতিয়ে দেখে আপনাদের সামনে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন।

একদম মহাবিশ্ব-সৃষ্টির-গোড়া-সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব থেকে মানুষের গল্প শুরু করেছেন। মানুষের মাঝে মহাবিশ্বের বিকাশ নিয়ে যে ধারণা ধ্রুব সত্য বলে প্রচারিত, তাকে খতিয়ে দেখেছেন। যেভাবে একটি বৈজ্ঞানিক অনুকল্প দাঁড়ায় এবং তা যাচাই করতে হয়, তা দিয়ে তিনি মহাবিশ্বের আজকের অবস্থায় আসার ব্যাখ্যাকে সাধারণ পাঠকের কাছে উপস্থাপন করেছেন। মহাবিশ্বের সুনিপুণ সমন্বয়ের বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তুলে পাঠককে দেখিয়েছেন কীভাবে এই সমন্বয়ের সর্বোত্তম ব্যাখ্যাকে এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে। পশ্চিমা একাডেমিয়ার ভারী বই, জার্নাল ঘেঁটে গবেষকদের মতামত তুলে এনেছেন। এমন সব বিষয়ের অবতারণা করেছেন যা আমরা প্রায় কেউই জানি না!

চমকপ্রদ এই আলোচনা থেকে তিনি পাঠককে নিয়ে গেছেন বিজ্ঞানের ঘরে। নিজে চিকিৎসক হওয়ার সুবাদে বৈজ্ঞানিক গবেষণা পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন মেডিকেলে পড়ার সময়। পাশাপাশি নিজ আগ্রহে বিজ্ঞানের দর্শন নিয়ে পড়ছেন। এডিনব্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরশিক্ষা কোর্সের মাধ্যমে বিজ্ঞানের দর্শন বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করেছেন। এ দুইয়ের মিশেলে তিনি বিজ্ঞানের ঘরের আনাচে-কানাচে থেকে এমন সব বাস্তবতা তুলে এনেছেন, যা নিঃসন্দেহে বিজ্ঞান অনুরাগীদের হতবাক করবে; হতাশও করতে পারে। তবে যারা মনখোলা রেখে শিখতে আগ্রহী, তারা এতে পুলকিত হবে।

বিজ্ঞানের ঘরে পাঠককে ঘুরিয়ে নিয়ে এরপর তিনি শুরু করেছেন—প্রাণের কথা, আমাদের কথা। পাঠ্যবই ও পপসাইন্স বইগুলো প্রাণের আবির্ভাব ও বিকাশ নিয়ে বিবর্তন তত্ত্বের আলোচনায় মুখর। মাধ্যমিক উচ্চ-মাধ্যমিক শ্রেণির পাঠ্যবই ও বাংলাদেশের জনপ্রিয় বিজ্ঞান-লেখকের বিভিন্ন বই সামনে রেখে তিনি খোঁজ চালিয়েছেন অ্যাকাডেমিক রিসোর্সে। প্রচলিত বিবর্তন তত্ত্বের মৌলিক কাঠামোর ছক এঁকে, বিভিন্ন বইতে বিবর্তনের-স্বপক্ষে-উপস্থাপন-করা উপাত্তগুলোকে বিশ্লেষণ করেছেন। বিবর্তনবাদের স্বপক্ষে যেসব রেটরিক দাঁড় করানো হয়েছে, যেমন—প্রাণের জাগতিক উৎপত্তি, বিভিন্ন প্রাণির ফসিল ও ভ্রূণে-থাকা সাদৃশ্য, মানুষ ও শিম্পাঞ্জির জিনোমে ৯৯ শতাংশ মিল, ডিএনএ'র ৯৮

www.QuranerAlo.net

শতাংশই আবর্জনা, চোখের ডিজাইন ত্রুটি, এপেনডিএক্স অপ্রয়োজনীয় অঙ্গ ইত্যাদির পক্ষে-বিপক্ষে-থাকা রিসার্চ পেপার ও মূলধারার গবেষকদের মত থেকে বাস্তবতা দেখিয়েছেন এবং বিবর্তন দিয়ে 'সব সমাধা হয়ে গেছে'—এমন ধারণার অসারতা প্রমাণ করে দিয়েছেন।

আমাদের মনে রাখতে হবে, বিজ্ঞান কোনো মানুষ নয় যে—এক মুখে এক কথা বলে। আসলে অজস্র বিজ্ঞানীর শতশত রিসার্চে-পাওয়া হাজারটা মতামতের সমাহারে বিজ্ঞানের ক্ষণকালীন সিদ্ধান্ত গড়ে ওঠে মাত্র। যে-কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের পক্ষে-বিপক্ষে হাজারো মতামত থাকে। রিসার্চ মেথডলজির ওপর ভিত্তি করে কোনো রিসার্চ ইন্টারেস্টিং মনে হলেও, পরে দেখা যায়—ওই রিসার্চটি রিপ্রডিউস করা যাচ্ছে না বা তা শুধু অতি সীমিত ক্ষেত্রে কাজ করে অথবা রিসার্চ মেথডলজিটাই প্রশ্নবিদ্ধ! একেক বিজ্ঞানী একই ডাটা নিয়ে গবেষণা করে ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তে যায়। কাজেই বিজ্ঞান আসলে শত মুখে হাজার রকম কথা বলে। আর যা বলে তা অধিকাংশ সময়েই ভুল হয়। এই বাস্তবতা সাধারণ মানুষের কাছে বিদ্ঘুটে লাগতে পারে। কিন্তু যারা বৈজ্ঞানিক গবেষণার সাথে জড়িত, তাদের কাছে এটাই বিজ্ঞানের আসল চেহারা।

বক্ষ্যমাণ বইতে ডা. রাফান বিজ্ঞানের অন্তঃপুর থেকে তথ্য-উপাত্ত এনে বিবর্তবাদ িয়ে প্রচলিত বয়ানকে মাইক্রোস্কোপের নিচে রেখেছেন মাত্র। শুধু বিজ্ঞান নয়, বরং তিহাস ঘেঁটেও চমকপ্রদ তথ্য হাজির করেছেন। বইটি পড়লেই বুঝবেন লেখক বেশ ালোভাবে সাইন্টিফিক লিটারেচারগুলো ঘেঁটেই বইটি সাজানোর চেষ্টা করেছেন। আমার পড়ে বেশ ভালো লেগেছে। বিশেষ করে—ডিএনএ'র ৯৮ শতাংশই জাঙ্ক, মানুষ ও শিম্পাঞ্জির জিনোমে ৯৯ শতাংশই একরকম ইত্যাদি দাবির বাস্তবতা দেখে অবাক হয়েছি। কেন বিবর্তনবাদের পক্ষের লোকেরা এ রিসার্চগুলো গ্রহণ করতে এত ক্ষুব্ধ হয়েছেন, তা বোধগম্য হয়েছে আমার।

এ বইটিকে বিবর্তনবাদ নিয়ে বাংলায় লেখা একটি চমৎকার লিটারেচার—বললে অত্যুক্তি হবে না। ইউনিভার্সিটি-পড়ুয়াদের জন্য বইটি সুখপাঠ্য হবে বলেই মনে করি। তবে বিশেষ করে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা এই বইটি থেকে অনেক কিছু শিখতে পারবে। কারণ তাদের বইগুলোতে বিবর্তনবাদের পক্ষে শুধু একটি ক্ষুদ্র অংশ দেখানো হয়েছে, বিবর্তনের জয়গান গাওয়া হয়েছে। কিন্তু ছবির পুরোটা সম্পর্কে ধারণা পেতে এই বইটি পড়া দরকার। সাইন্টিফিক রিসার্চ : কেন ও কীভাবে কাজ করে—তা বুঝতেও এই বইটি বেশ সাহায্য করবে। এরকম একটি বই লেখার জন্য ডা. রাফানকে ধন্যবাদ।

M. Rezaul Karim Vuiya
BS (Civil), BUET
MS (Civil), University of Louisiana at Lafayette
PhD Student, University of Louisiana at Lafayette

www.QuranerAlo.net

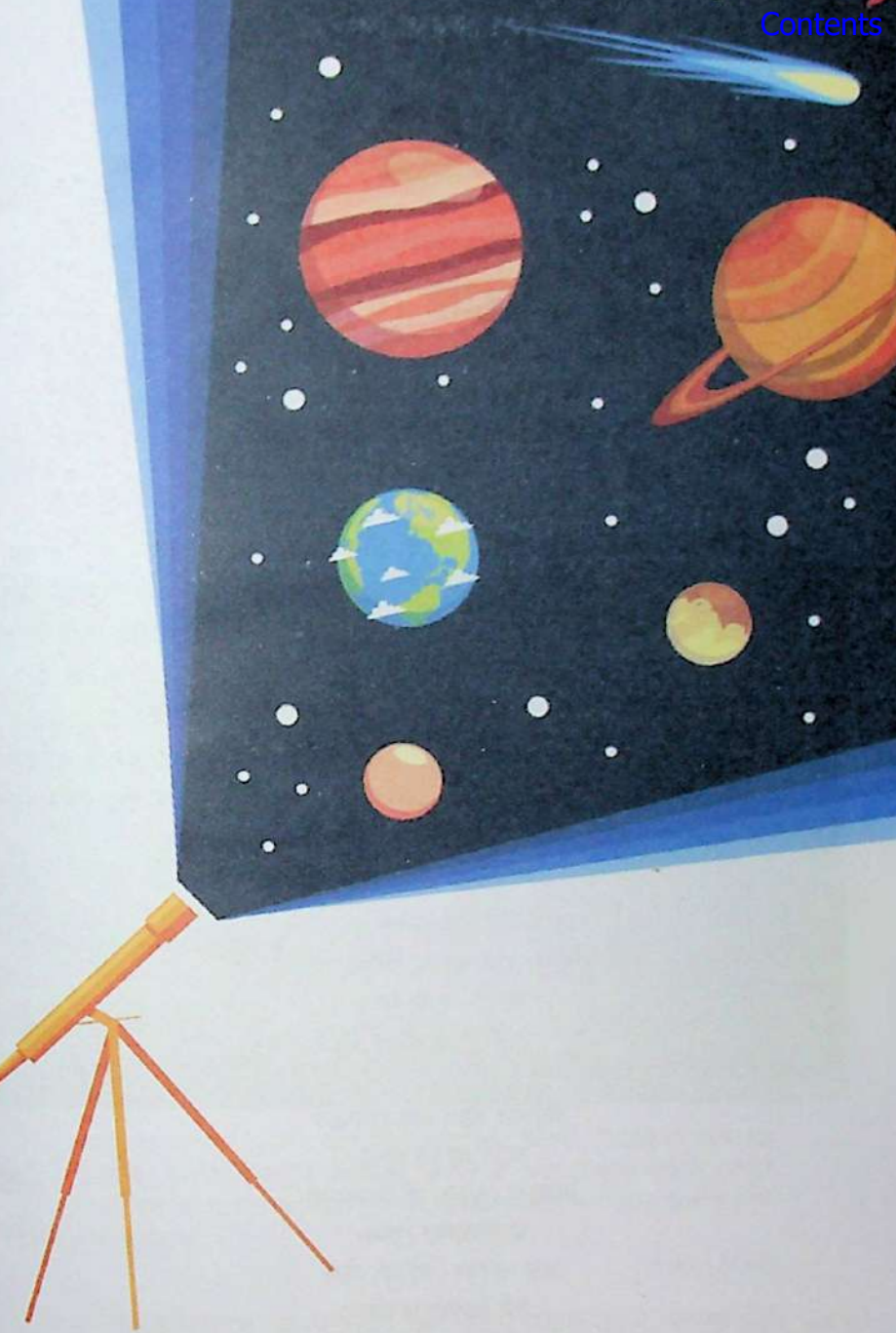

www.QuranerAlo.net

নক্ষত্রের কোরাস

Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are!
~ Jane Tylor

সন্ধ্যা-সময়ে মাগরিবের সালাত পড়ে হাঁটতে বের হলাম। ঝিরিঝিরি হাওয়া চারপাশে গুনগুন করে বয়ে চলছে; আলতো করে কপোলকে ছুঁয়ে দিচ্ছে। আকাশের লালিমা এখনও মিটে যায়নি। ছেয়ে-যাওয়া আঁধারের সাথে লাল রঙ মিশে এক অদ্ভুত আবেশের আসর বসিয়েছে। সকালে যদিও একপশলা বৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু আকাশ এখন হেমন্তের মতো পরিষ্কার। মেঘের লেশমাত্র নেই। হঠাৎ ডানে-থাকা ঝোপের দিকে চোখ আটকে গেল। কী যেন জ্বলে উঠল না! ভুল দেখলাম নাকি? নাহ! ওই তো, আবার জ্বলে উঠল! আরে, জোনাকি দেখি! অনেক দিন পর জোনাকি দেখলাম। ছেলেবেলার সেই কবিতার কথা মনে পড়ে গেল :

তারা একটি দুটি তিনটি করে এল
তখন– বৃষ্টি-ভেজা শীতের হাওয়া
বইছে এলোমেলো,
তারা– একটি দু'টি তিনটি করে এল।
...
আলোর পাখি নাম জোনাকি
জাগি রাতের বেলা,
নিজকে জ্বেলে এই আমাদের
ভালোবাসার খেলা।
তারা নইকো- নইকো তারা
নই আকাশের চাঁদ
ছোট্টো বুকে আছে শুধুই
ভালোবাসার সাধ। [জোনাকি, আহসান হাবিব]

হাঁটতে হাঁটতে আবার আকাশের দিকে চোখ পড়ল। আকাশের বুকেও অনেক জোনাকি জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। ওদের একটা গালভরা নাম আছে জানো? নক্ষত্র

www.QuranerAlo.net

Contents

(stars)। খটমটে না নামটা? আচ্ছা সহজ নাম বলি—তারা। আমরা-তোমরা-তাঁরা না কিন্তু, ওরা হলো আকাশের তারা।

আকাশের বুকে ঝলসানো রুটির মতো গোলগাল চাঁদ আর ঝিকিমিকি রুপার ফুলের মতো তারা নিয়ে কত-যে সাহিত্য রচিত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই!

রাতের নক্ষত্র, তুমি বলো দেখি কোন্ পথে যাব?
'তোমারই নিজের ঘরে চলে যাও '— বলিল নক্ষত্র চুপে হেসে –
'অথবা ঘাসের 'পরে শুয়ে থাকো
আমার মুখের রূপ ঠায় ভালোবেসে
[নিরালোক, জীবনানন্দ দাশ]

জমকালো আকাশে আলোর আঁধার হয়ে হাস্যোজ্জ্বল শুভ্রপথ, ইংরেজিতে মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সি। আকাশ পুরোপুরি জমকালো অমানিশায় ঘেরা না হলে শুভ্রপথ দেখতে পাওয়া যায় না। গবেষকরা বেশকিছু জায়গা খুঁজে বের করেছেন যেখান থেকে ছায়াপথ দেখা সহজ হয়।

ছবিসূত্র : পিক্সাবে

আকাশের ক্যানভাসে ওদের নিত্য খেলা দেখে অবাক হয়নি, ভাবুক হয়নি এমন একজনকেও বোধ করি খুঁজে পাওয়া যাবে না। একজনও বোধ করি খুঁজে পাওয়া যাবে না, যে একবার হলেও অবাক হয়ে ভাবেনি—এগুলো কী? কীভাবে অস্তিত্বে এল? কে তৈরি করল এই মহাযজ্ঞ?

www.QuranerAlo.net

মেঘহীন ঘুটঘুটে রাতের আকাশে চেয়ে থাকলে এক মাথা থেকে অপর মাথায় অসংখ্য নক্ষত্রকে সাদা কুয়াশার চাদরের মতো বিস্তৃত থাকতে দেখা যায়। নক্ষত্রের এমন একেকটা পরিবারকে বলা হয় ছায়াপথ; আরেকটা সুন্দর নাম হলো নক্ষত্রবীথি। আমাদের ছায়াপথের একটা সুন্দর নাম আছে—মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি (Milky way galaxy)। আমি নাম দিয়েছি শুভ্রপথ, যদিও কে জানি আগেই নাম দিয়ে রেখেছে আকাশগঙ্গা।

ধুচ্ছাই, এমন খটমটে নাম দিল কেন?

যাই হোক, আমাদের ছায়াপথই কিন্তু একমাত্র নয়। মহাকাশ-বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন, মহাবিশ্বে বিশালাকার এসব নক্ষত্রপুঞ্জের সংখ্যা ২০,০০০ কোটিরও বেশি! (লিন্ডসে ক্রুক, ২০১৭) কল্পনা করা যায়, কী প্রকাণ্ড এই মহাবিশ্ব! শুনে মুখ হাঁ হয়ে যাচ্ছে? আরে দাঁড়াও না, গল্প তো শুরু হচ্ছে কেবল।

এই ছায়াপথগুলো কী দিয়ে গঠিত, জানো? গাদা-গাদা নক্ষত্র, মহাজাগতিক ধূলিকণা ও গ্যাস মিলেমিশে একেকটা ছায়াপথে পরিণত হয়েছে। গাদা-গাদা মানে কিন্তু অনেক, অনে.....ক! কেবল আমাদের ছায়াপথের তারার সংখ্যা শুনলে ভিমড়ি খেয়ে যাবে—আনুমানিক প্রায় ৩০ হাজার কোটি! সূর্য এদের মাঝে কেবল একটি! অনুমান করা হয় গড়পরতায় প্রতিটি ছায়াপথে অন্তত ১০ হাজার কোটি নক্ষত্র আছে! তা হলে মোট নক্ষত্রের সংখ্যা কত দাঁড়াল? সোজাকথা গণনার বাইরে। বর্তমান ধারণা অনুযায়ী এসব নক্ষত্রের মাত্র দশ শতাংশকে ঘিরে গ্রহপুঞ্জ (Planets) আবর্তিত হয়। গ্রহকে ঘিরে ঘুরতে থাকে উপগ্রহ (Satellites) বা চাঁদ। এদের নিয়েই তৈরি হয় একেকটা সোলার সিস্টেম।

ছায়াপথে আরও ঘুরে বেড়ায় অসংখ্য গ্রহাণু (Asteroids); এদের কেউ কেউ কোনো গ্রহের চারিদিকে দলবেঁধে ঘুরে বেড়ায়; কেউ-বা উদ্‌বাস্তু হয়ে ধূমকেতু-তে রূপ নেয় (Comets)।

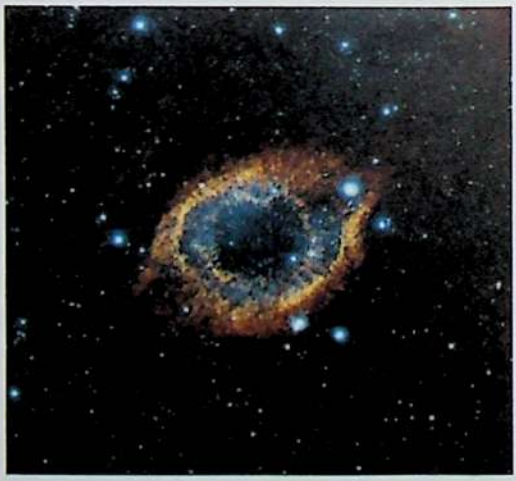

হেলিক্স নেবুলার মডেল

ছবি: নাসা

ছায়াপথে আরও দেখতে পাওয়া যায় নানারঙা নীহারিকা (Nebula)। সাহিত্যের ভাষায় বললে, নীহারিকা হলো মহাশূন্যের বিপুল-ক্যানভাসে-আঁকা বর্ণিল মনোমুগ্ধকর মেঘমালা। ধূলিকণা, হাইড্রোজেন ও প্লাজমা দ্বারা গঠিত প্রকাণ্ড দানবাকৃতির

www.QuranerAlo.net

Contents

আন্তঃনাক্ষত্রিক-মেঘ হলো এই নীহারিকা। এখানে নক্ষত্রদের জন্ম হয় বলে মনে করা হয়। আমাদের সবচেয়ে কাছের নেবুলাটির নাম হলো হেলিক্স নেবুলা।

ছায়াপথে-থাকা-নক্ষত্ররাজি, গ্রহ ইত্যাদির মাঝখানে যে ফাঁকা জায়গা থাকে তাকে মহাকাশ বা মহাশূন্য বলা হয়। পাঠ্যবইয়ের ভাষায়, 'মহাবিশ্বের অনেককিছুই মহাকাশ-নামক সীমাহীন ফাঁকা জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে।' (বিজ্ঞান। অষ্টম শ্রেণি, ২০১৯) তবে মহাকাশ একবারে ফাঁকা জায়গা, এতে পদার্থ অনুপস্থিত—এমন বলা ঠিক না। কারণ মহাকাশ জুড়ে থাকে মহাজাগতিক ধূলিকণা, গ্যাস, তড়িৎচৌম্বক বিকিরণ, চৌম্বক ক্ষেত্র, নিউট্রিনো, প্লাজমা ইত্যাদির মহাসমারোহ! (এলিজাবেথ হাওয়েল, ২০১৭)

কোনো এক হেমন্ত বা শীতের ঘুরঘুটি আঁধার রাতে, আকাশের পানে তাকিয়ে তুমি এই নক্ষত্রবীথির সাথে মিতালি করতে পারো। ভাগ্য ভালো থাকলে এক প্রতিবেশীর সাথেও দেখা হয়ে যেতে পারে। এটি হলো আমাদের সবচেয়ে কাছের ছায়াপথ অ্যান্ড্রোমিডা। সূর্যেরও এমন একটা প্রতিবেশী আছে—লাল বামন নক্ষত্র প্রক্সিমা সেন্টোরি; এদের যদিও খালি চোখে দেখতে পাবে না। আব্বুকে বলে কোনোমতে যদি একটা টেলিস্কোপ জোগাড় করে ফেলতে পারো তা হলে হয়তো ছায়াপথের দেখা মিলবে। জ্যোৎস্না-ভেজা-রাতে চাঁদের কালো দাগও দেখতে পারবে। রুপালি জোছনার আবেশে দু-চার চরণ কবিতাও হয়তো লিখে ফেলতে পারো।

ঘর খুলিয়া বাহির হইয়া
জোছনা ধরতে যাই
হাত ভর্তি চান্দের আলো
ধরতে গেলে নাই।
[অবাক জোছনা, হুমায়ূন আহমেদ]

যখন তুমি চিন্তা করতে শিখে যাবে তখন বুঝতে পারবে, মহাবিশ্বে আমাদের স্থান কতটা নগণ্য! আমাদের মিল্কিওয়ে ছায়াপথের বিশালতার মাঝে সূর্যকে খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর; পৃথিবীর কথা তো আগেই বাদ। স্পেস প্রোব ভয়েজার-১ আমাদের ছায়াপথের মধ্যে থেকেই পৃথিবীর যে ছবি পাঠিয়েছে তাতে পৃথিবীকে প্রায় দেখতেই পাওয়া যায় না। সর্বসাকুল্যে আসমানি বর্ণের একেবারে মলিন একটা বিন্দু দেখতে পাওয়া যায়, একটা Pale blue dot!

এই বিশাল মহাবিশ্বে অগণিত গ্রহ-নক্ষত্রের মাঝে প্রায় এক অস্তিত্বহীন বিন্দুতে আমাদের বসবাস। কত তুচ্ছ, কত নগণ্য! তারপরও আমাদের কত অহংকার, কত গর্ব তাই না? একটু ভেবে দেখো না! মহাজাগতিক সমুদ্রের মাঝে আমাদের খুঁজেই পাওয়া যায় না। অথচ আমরা অর্থ-ক্ষমতা-জ্ঞান-গায়ের রঙ-বংশ-গোত্র-ভাষা-দেশ-জাতি নিয়ে গর্ব করে বেড়াই। এই গর্বপ্রসূত অন্যায়-অত্যাচার-হত্যাকাণ্ডে মানব-ইতিহাসের পাতা থেকে চুইয়ে পড়ছে রুধির! ইতিহাস ঘেঁটে দেখা গেছে—মানব-ইতিহাসে সংঘটিত

www.QuranerAlo.net

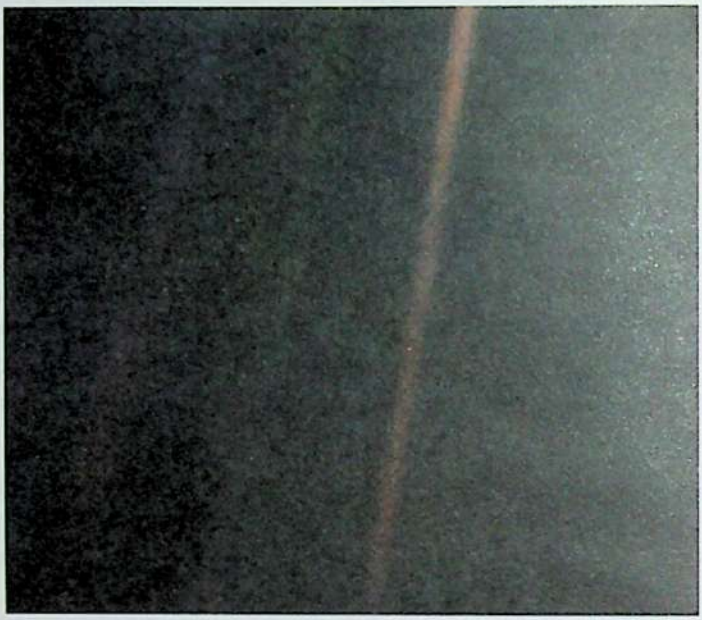

ভয়েজার-১ থেকে পাঠানো ছবি। এর মাঝে কোনো এক জায়গায় পৃথিবী আছে। দেখো তো খুঁজে পাও কি না।

ছবি : নাসা

যুদ্ধের প্রায় ৯৩ শতাংশই হয়েছে জাগতিক স্বার্থের কারণে; ক্ষমতা, আধিপত্য, সম্পদ, ভূমির লোভে! (ক্রস শেইম্যান, ২০০৯)

অথচ মনে হয়, বিস্তৃত মহাজগতের আচ্ছন্নকারী আঁধারের মাঝে আমরা এক বিন্দু ছাড়া কিছুই না।

কী, মন খারাপ হয়ে গেল? মন খারাপ করে দেওয়ার জন্য বলিনি, স্রেফ নিজের অবস্থানকে বোঝানোর জন্যই বলা। আমরা চাইলে, মহাবিশ্বের এই ব্যাপ্তি থেকে অহংকার না করার শিক্ষা নিতে পারি। আচ্ছা দাঁড়াও, একটা রহস্যের কথা তোমাদের বলিনি। আপাতদৃষ্টিতে এক নগণ্য বিন্দু মনে হলেও আমরা কিন্তু একমাত্র ও অভাবনীয়। আমরা বলতে বোঝাচ্ছি এই মহাবিশ্ব ও প্রাণ। সকল প্রাণ; এককোষী থেকে বহুকোষী, এমিবা থেকে মানুষ। কেন বললাম জানো?

চলো তা হলে, ধীরে ধীরে রহস্যের খোঁজে যাওয়া যাক।

www.QuranerAlo.net

ঝরনার কথা

Read, in the Name of your Lord
~ Holy Qurán, 96 : 1

আদিকাল থেকেই মানুষ আকাশ-পানে তাকিয়ে একে বুঝতে চেয়েছে। জগৎ বুঝতে চাওয়ার প্রচেষ্টায় নানা-ভাবনা, নানা-চিন্তা কালে-কালে আবির্ভূত হয়েছে। গ্রিকরা একরকম ভাবত। কালের আবর্তে সে ভাবনা বদলে গেছে। গ্রিক চিন্তাবিদগণ মূলত থিওরিস্ট ছিলেন—স্বীয় অনুমান-অনুধাবন কাজে লাগিয়ে কিছু ধারণা প্রকাশ করতেন। কিন্তু সেগুলোকে গবেষণা/পরীক্ষালব্ধ কোনো উপায়ে উপস্থাপনের উপায় জানা ছিল না কারও। পরবর্তীকালে বিজ্ঞানযাত্রার সূচনা ঘটে তৎকালীন মুসলিম বিশ্বে। বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ স্মৃতিচারণ করেন (অ্যাডাম স্মিথ, ১৮৬৯) :

> ... সর্বপ্রথম খলিফাদের সাম্রাজ্যেই পৃথিবীর মানুষ এক প্রশান্তি আস্বাদন করেছিল, যা বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় ছিল... তাদের কোমল, ন্যায়পরায়ণ ও ধর্মীয় শাসকবর্গ সেই প্রশান্তি ছড়িয়ে দিয়েছিল বিস্তৃত সাম্রাজ্যে। প্রকৃতির সাথে সম্পর্ক জানার ব্যাপারে মানুষের কৌতূহলকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলেছিল ...

৮ম-১৪শ শতকের মাঝে মুসলিম-সাম্রাজ্যে ঘটে-যায় এক অভূতপূর্ব জ্ঞানবিপ্লব। অনেকেই এই সময়কালকে গোল্ডেন এইজ অব ইসলামিক সাইন্স বলে অভিহিত করেন। এই কয়েক শতাব্দীতে মুসলিমরা জ্ঞান ও বিজ্ঞানে যে অভূতপূর্ব অগ্রগতি এবং উন্নতি লাভ করেছিল, মানব-ইতিহাসে তার দ্বিতীয় কোনো নজির পাওয়া যায় না। মরুভূমির শুষ্ক ও তপ্ত বালুতে জেগে ওঠে, সুদূর স্পেন থেকে নিয়ে ভারতবর্ষ পর্যন্ত বিকশিত হওয়ায় ইসলামি সভ্যতা তখন অসংখ্য বৈচিত্রময় সংস্কৃতি, ধর্ম এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্যের ধারকে পরিণত হয়। পূর্ববর্তী সভ্যতাগুলোর অবদানগুলোকে একত্র ও সমন্বিত করে বিজ্ঞানচর্চার এক নব-দিগন্তের সূচনা হয়। মুসলিম-সাম্রাজ্য তখন নানা চিন্তার, নানা বৈশিষ্ট্যের অসংখ্য জ্ঞানী মানুষের এক মিলনমেলায় রূপ নেয়। (ফিরাস আল-খাতিব, ২০১৭)

ইতিহাসের পাতা খুলে জানা যায়, এই অভূতপূর্ব জ্ঞানবিপ্লবের পিছনে ঐশী বাণীর প্রেরণা ছিল। ঐশী জীবনবিধান বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সকল জ্ঞানার্জন ধর্মীয় দায়িত্ব হিসেবে গণ্য হতো। আরব বিজ্ঞানী ও দার্শনিকগণ আসমানি বাণীতে সেই অনুপ্রেরণা খুঁজে পেয়েছিলেন। (জোনাথন লিয়নস, ২০১০) ঐশী বাণী থেকে পাওয়া

www.QuranerAlo.net

Map of Major Contributions in Muslim Civilization

Dar al-Islam, or the Muslim world, stretched over three vast continents, from Toledo in Spain, through Arabia and Indonesia to China, and as far south as East Africa. It reached its peak in the 12th century under the Abbasids. Cities in the Middle East and Spain became global centers of culture, trade, and learning. Their atmosphere of tolerance and creativity stimulated groundbreaking advances in medicine, engineering, philosophy, mathematics, astronomy, and architecture. Explore the map below to see what happened, where—and when.

www.QuranerAlo.net

Water-Raising Machine
Al-Jazari (early 13th century)
Al-Jazari's greatest legacy is the application of the crank and connecting rod systems, which transmits rotary motion into linear motion. His machines were able to raise huge amounts of water without anyone lifting a finger.
[page 121]

Chemistry
(721–815)
This was a period when chemical instruments and processes that form the basis of today's chemistry were created and developed. Jabir ibn Hayyan discovered vitally important acids like sulfuric, nitric, and nitromuriatic acid, while Al-Razi set up a modern laboratory, designing and using more than 20 instruments like the crucible and still.
[page 90]

Trick Devices
(ninth century)
Three brothers, the Banu Musa brothers, were great mathematicians who funded the translation of Greek scientific treatises; they also invented fabulous trick devices that, some say, are precursors to executive toys.
[page 52]

House of Wisdom
(eighth-fourteenth century)
This immense scientific academy was the brainchild of four generations of caliphs who drew together the cream of Muslim scholars. It was an unrivaled center for the study of humanities and for sciences, where the greatest collection of worldly knowledge was accumulated and developed.
[page 72]

Cryptology
Al-Kindi (801–873)
Second World War problem solvers carried on the code-breaking tradition first written about by polymath Al-Kindi from Baghdad when he described frequency analysis and laid the foundation of cryptography.
[page 258]

Distillation
Jabir ibn Hayyan (721–815)
Jabir ibn Hayyan perfected the distillation process using the alembic still, which is still used today. The Muslim world produced rose water, essential oils, and pure alcohol for medical use. Today distillation has given us products ranging from plastics to gasoline.
[page 92]

Khwarizmi

Kabul

Baghdad

Kufa

Delhi

Patna

Canton

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Algebra
Al-Khwarizmi (780–850)
Al-Khwarizmi introduced the beginnings of algebra; it then developed into a form still used today by many who lived after him.
[page 84]

Shampooing
Sake Dean Mahomed (18th century)
Shampooing was introduced to Britain at Brighton by Sake Deun Mohamet, from Patna, India, who became the "Shampooing Surgeon" to King George IV and King William IV.
[page 51]

Mocha

Coffee
(eighth century)
Khalid the goat herder noticed his excitable animals had eaten red berries, which led to the early Arabic drink al-qahwa. Coffee drinking flourished across the Muslim world in the 1500s and spread to Europe through trade in 1632.
[page 36]

Lands encompassed by Muslim civilization at various times from the seventh century onward

Salim T.S. Al-Hassani (Edt), 1001 Inventions : The Enduring Legacy of Muslim Civilization; p. 14-15

www.QuranerAlo.net

অনুপ্রেরণা বুকে ধারণ করে ধর্মীয় ও পার্থিব জ্ঞান আহরণে চঞ্চল মধুকরের মতো ঘুরে বেড়াতে থাকেন জ্ঞানপিপাসু মানুষেরা। ধর্মীয় প্রয়োজনে, নতুন কিছু পাওয়ার নেশায় তারা একে একে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পদচিহ্ন রাখা শুরু করেন। আধুনিক বর্ণমালার ভিত্তি যে আরবি কুফী বর্ণমালা তা আবিষ্কৃত হয়েছিল ফোরাত নদীর তীরে। ইসলামি জীবনব্যবস্থায় জ্ঞান অর্জন ও বিস্তারকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার কারণে কাগজ বিশেষ গুরুত্ব পেতে শুরু করে। রেশম পোকার মথ ব্যবহার করে চীনাদের কাগজ তৈরির পদ্ধতি মুসলিমরা গ্রহণ করে এবং তাতে আরও উন্নতি ঘটায়। ফলে উন্নত কাগজশিল্প গড়ে ওঠে। যাকাত-ফিতরা প্রভৃতির হিসেব-নিকেশের তাগিদে গণনা-পদ্ধতি উন্নতি লাভ করে। আরবি সংখ্যার ব্যবহার, গণিতে জাগরণ ঘটানো সংখ্যা 'শূন্য'-র ব্যাবহারিক প্রচলন, বীজগণিতকে স্বতন্ত্র বিজ্ঞানে রূপ দেওয়া, অ্যালগরিদম আবিষ্কার—এ সবই ঘটে-চলে ইসলামি-সাম্রাজ্যের পণ্ডিতদের হাত ধরে। পশ্চিমে আরবি সংখ্যার অনুপ্রবেশ ঘটে দ্বাদশ শতকে, 'শূন্য'হীন বড়ো বড়ো সংখ্যা লেখার ঝামেলাপূর্ণ রোমান পদ্ধতির জায়গা দখল করে নেয় সোজাসাপ্টা আরবি সংখ্যামালা।

ইসলামে প্রতিমা, প্রতিকৃতি তৈরি নিষিদ্ধ হওয়ার দরুন বহু মুসলিম শিল্পী তাদের শৈল্পিক দক্ষতার স্ফুরণ ঘটিয়েছে—পাথর, তাঁত ও কাঠের উপর জ্যামিতিক নকশায়; এরাবেস্ক-নামক অভিনব শিল্পের মাধ্যমে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জ্যামিতি ও ত্রিকোণমিতির অঙ্গন মুসলিমদের অবদানে সমৃদ্ধ। সাইন আর কোসাইন টেবিল তৈরি হয়েছে, কিউবিক সমীকরণ সংজ্ঞায়িত হয়েছে, দ্বিঘাত সমীকরণের রুট বা মূলসংখ্যা নির্ধারিত হয়েছে। এভাবে ধীরে ধীরে বিশ্লেষণধর্মী ও সাধারণ ত্রিকোণমিতি প্রসার লাভ করেছে এবং জ্যামিতিক জ্ঞান উন্নত হয়েছে। ধাতুবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, জৈব ও অজৈব রসায়ন, চিকিৎসাবিদ্যা, ভূগোল, উদ্ভিদবিদ্যা ও কৃষিবিদ্যা-সহ অন্যান্য ক্ষেত্রেও বিজ্ঞানের বেশ অগ্রগতি ঘটে সে সময়। প্রযুক্তিগত

সালাতের সময় ও দিক নির্ণয়ের তাগিদে মুসলিম বিজ্ঞানী আল ফারাযি'র তৈরি করা অ্যাসট্রোল্যাব। জ্যোতির্বিদ হ্যারল্ড উইলিয়ামস-এর মতে কম্পিউটার ও টেলিস্কোপ আবিষ্কারের আগে অ্যাসট্রোল্যাব ছিলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গণনাযন্ত্রের একটি।

ছবি: ১০০১ ইনভেনশনস

www.QuranerAlo.net

উন্নতি সাধিত হয় এক্সল, লিভার, পুলি, উইন্ডমিল প্রভৃতি যন্ত্রের এবং বেশ কিছু পদ্ধতির যেমন : ক্যালসিনেশান, বিজারণ, পাতন, স্ফটিকীকরণ পদ্ধতি ইত্যাদি। অভিকর্ষ তত্ত্ব ও বায়ুর স্থিতিস্থাপক তত্ত্ব-সহ আরও অনেক তত্ত্বের উন্নতি ঘটে। চিকিৎসাশাস্ত্রেও ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়। গড়ে ওঠে প্রথম হাসপাতাল, আবিষ্কৃত হয় নতুন-নতুন পথ্য ও শল্যচিকিৎসার নানা যন্ত্রপাতি ও পদ্ধতি। (ডা. লরেন্স ব্রাউন, ২০১১)

এই মুসলিম পণ্ডিতগণই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ছক গড়ে তুলতে মূল ভূমিকা পালন করেন। তাঁদের মাঝে প্রথম যিনি নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ধারণা যাচাই-বাছাইয়ের ছক আঁকেন, তিনি ছিলেন *অপটিক্স*-এর জনক হাসান ইবনু হাইসাম (৯৬৫-১০৪০ খ্রি.), একজন মুসলিম পণ্ডিত। বর্তমানে তাঁকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির জনক হিসেবে গণ্য করা হয়। (জিম আল খলিলি, ২০০৯, ২০১২) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির রূপরেখা আঁকার পিছে যে বাসনা তার চালিকাশক্তি হিসেবে ছিল তা হলো, স্রষ্টার নৈকট্য হাসিল করা। (আলিয়াস ও হানাপি, ২০১৫) পরবর্তীকালে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ধারণা তাঁর থেকে গ্রহণ করেন ইউরোপের পণ্ডিত রজার বেকন। কিন্তু বড়ো আফসোসের ব্যাপার হলো—বেকন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রস্তাবনার কোনো কৃতিত্ব হাসান ইবনু হাইসামকে দেননি; দিয়েছেন আরেক খ্রিস্টানকে—যে কিনা ক্রুসেডারদের একজন ছিল! আজকের বিজ্ঞানে যে *পিয়ার রিভিউ* পদ্ধতি বহুল প্রচলিত, এই পিয়ার রিভিউ পদ্ধতি প্রথম বর্ণনা করেন ইসহাক ইবনু আলি রাহউই! (জ্যাকালিন কেলি এট এল., ২০১৪)

তোমাদের পাঠ্যবইতে এসব কথা পাবে না! কয়েকবছর আগ পর্যন্তও রজার বেকনকেই 'পরীক্ষামূলক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রবক্তা' বলে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে তোমাদের পাঠ্যবইতে! (পদার্থবিজ্ঞান। নবম-দশম শ্রেণি, ২০১৭) যে মুসলিমদের হাত ধরে আজকের বিজ্ঞানের সূচনামশাল জ্বলে উঠল, সেই আলো অন্যরা সুকৌশলে সরিয়ে নিয়ে গেল। মানুষকে জানতে দেওয়া হলো না যে, মুসলিম সভ্যতার অবদানের কারণেই একসময় অন্ধকার ইউরোপে আসে নবজাগরণ বা রেনেসাঁ! (রবার্ট ব্রিফল্ট, ১৯০৯)

> পঞ্চদশ শতক নয় বরং মরুবাসী ও স্পেনের অধিবাসী আরবদের দ্বারাই সংস্কৃতির পুনর্জাগরণের প্রভাবে প্রকৃত রেনেসাঁ সংঘটিত হয়েছিল। ইটালি নয়, বরং মুসলিম স্পেনই ছিল ইউরোপের নবজাগরণের জন্মস্থান-স্বরূপ।

জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অবদানের পাশাপাশি জ্যোতির্বিদ্যাতেও অগ্রগতি ঘটা শুরু হয়। পৃথিবীর যে বর্তুলাকার, এ ব্যাপারে তারা নিশ্চিত ছিলেন। (ইসলাম কিউএ, ২০১৪) মক্কায় অবস্থিত কা'বার দিকে সালাত আদায়ের আদেশ বাস্তবায়নের তাগিদে সঠিক দিক-নির্ধারণ-পদ্ধতির প্রয়োজন দেখা দেয়; ফলে ভৌগলিক নকশা, চুম্বক-কম্পাস, অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ হিসেব, নক্ষত্রের নকশা, উন্নত অ্যাস্ট্রোল্যাব-সহ নানা জিনিস আবিষ্কৃত হয়; গড়ে ওঠে মানমন্দির। সে সময় মুসলিমরা এমন উন্নত কিছু ভৌগলিক

www.QuranerAlo.net

Contents

নকশা তৈরিতে সক্ষম হয়, যা কয়েক শতাব্দী ধরে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। (সালিম হাসানি, ২০১১)

তাদের থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্রোত একসময় ইউরোপের দিকে ধাবিত হয়। আরব বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন বইপত্র আরবি থেকে ল্যাটিনে অনুবাদের মাধ্যমে পশ্চিমা পরিমণ্ডলে প্রবেশ করে। একই সাথে মুসলিম-বিজ্ঞানীদের নামগুলোও ল্যাটিনে লেখা শুরু হয়; ফলে তাদের মুসলিম পরিচয় কালির আঁচড়ে হারিয়ে যায়!

www.QuranerAlo.net

মহাকাশে নৃত্য

We all live under the same sky, but
we don't all have the same horizon
~ Konrad Adenauer

জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পাশাপাশি মহাকাশ নিয়ে আরবদের নানা ভাবনা পশ্চিমে এসে অগ্রসর হতে থাকে। বিভিন্ন চিন্তাবিদদের হাত ধরে পর্যায়ক্রমে ভাবনাগুলো গাণিতিক রূপ পেতে থাকে। বিজ্ঞানের সূচনাকাল ও বিকাশের সময় ঘেঁটে দেখা যায়, এ-সকল গবেষক স্রষ্টার বিশ্বাস দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিলেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন পরম স্রষ্টা জগতে নিয়ম প্রতিষ্ঠা করেছেন; জগতের শৃঙ্খলাবদ্ধ রূপ দেখে তাই প্রকৃতি সম্পর্কে জানার পিপাসা তাদের অগ্রগামী করে দেয়। তাঁরা আরও অবাক হয়েছেন এটা দেখে যে—জগতকে গণিতের ভাষায় প্রকাশ করা যায়। মহাকাশবিদ্যাকে ইংরেজিতে কসমোলজি (cosmology) বলা হয়। এটি যে গ্রিক (κοσμος) শব্দ-থেকে-আসা তার অর্থের মাঝে রয়েছে—শৃঙ্খলা, নিয়মানুগ আচরণ, সৌন্দর্য ইত্যাদি। পদার্থবিদ রিচার্ড ফাইনম্যান অবাক হয়ে বলেছিলেন, 'প্রকৃতির সূত্রবদ্ধরূপ আমার কাছে অলৌকিক মনে হয়... এই সূত্রগুলো গণিতের ভাষায় প্রকাশ করা যায়... এ ব্যাপারটা এক রহস্য...।'

> "স্রষ্টা হলেন সর্বোচ্চ পর্যায়ের গণিতজ্ঞ। মহাবিশ্বের বুননে তিনি অতি উচ্চস্তরের গণিত ব্যবহার করেছেন।"
>
> - পল এম. ডিরাক
> তাত্ত্বিক পদার্থবিদ

মহাবিশ্ব যে যৌক্তিক ও সুশৃঙ্খল—এমন মনোভাবের উপর বিজ্ঞান খুঁটি গেড়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রকৃতিতে সুসামঞ্জস্যতা বিদ্যমান, বৈজ্ঞানিক কর্মপদ্ধতি পরিচালনার জন্য এই ধারণা আবশ্যক।

আইজ্যাক নিউটনের নাম তো তোমরা সবাই শুনেছ। মহাকর্ষ সূত্র প্রস্তাবনার জন্য তিনি বিখ্যাত। তোমরা গল্প শুনেছ : আপেল গাছের নিচে বসে থাকা অবস্থায় নিউটনের মাথায় ঠুস করে আপেল পড়ে। আমি-তুমি হলে হয়তো আপেলটা মুছে খেয়ে ফেলতাম। কিন্তু নিউটন খাওয়া বাদ দিয়ে—আপেল নিচেই পড়ল কেন? এই চিন্তা করতে-করতে একসময় তার মাথায় মহাকর্ষের সূত্র চলে আসে। গল্পটা যদিও ঠিক না। আর মহাকর্ষও এত সোজা কিছু না। বহু বছর কেটে গেছে বিজ্ঞানীরা এখনও মহাকর্ষের প্রকৃত রূপ

www.QuranerAlo.net

ঠাহর করে উঠতে পারেননি! (অ্যামান্ডা গ্যাফটার, ২০১০)

নিউটন ছিলেন একজন একত্ববাদী (unitarian) খ্রিস্টান। বাইবেলের প্রাচীন পাণ্ডুলিপি ঘেঁটে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এতে অনেক বিকৃতি ঘটেছে। যিশুকে ঘুরিয়ে-প্যাঁচিয়ে খোদার আসনে বসানো হয়েছে; ত্রিত্ববাদের ধারণা পরবর্তী সময়ের আবিষ্কার। তাই তিনি সে ভ্রান্ত ধারণা বর্জন করে একত্ববাদকে বেছে নেন। (স্টিভেন জোনস, ২০১১) জগতের নিয়মবদ্ধ আচরণ দেখে নিউটন আপ্লুত হতেন। স্রষ্টার নির্ধারণ করা সেই নিয়মের খোঁজে তিনি চিন্তাভাবনা করতে থাকেন এবং কিছু ব্যাখ্যা দাঁড় করান। আমাদের চেনা সূর্য, চাঁদ, গ্রহ ইত্যাদি মহাজাগতিক বস্তুর বিচলন ব্যাখ্যা করার জন্য বহু বছর আইজ্যাক নিউটনের প্রস্তাবিত মহাকর্ষ সূত্র ব্যবহার করা হয়েছে। তোমরা পদার্থবিদ্যার বইতে এর গাণিতিক রূপ দেখেছ :

> "সূর্য, গ্রহ ও ধূমকেতুর এই মনকাড়া সজ্জা শুধুমাত্র এক মহাবুদ্ধিমান ও শক্তিশালী সত্তার কর্তৃত্ব ও ইচ্ছা থেকেই পরিচালিত হতে পারে।"
>
> - আইজ্যাক নিউটন

$$F = Gm_1m_2/r^2$$

প্রায় ২৫০ বছর ধরে মহাজাগতিক বস্তুর গতিবিধি বর্ণনা ও গণনা করার জন্য নিউটনের সূত্র ব্যবহৃত হয়েছে। এই সূত্রের মূলনীতি ব্যবহার করে মানুষ চাঁদ থেকে ঘুরে এসেছে। তবে একসময় দেখা গেল, তার প্রস্তাবিত ব্যাখ্যার সাথে কিছু পর্যবেক্ষণ মিলছে না। (ইথান শিগেল, ২০১৬) যেমন : বুধগ্রহের গতি নিয়ে হিসেব-নিকেশ করে দেখা গেল, নিউটনের তত্ত্বের ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে তা মিলছে না।

তাই জগতের সেই নিয়মকে বোঝার চেষ্টায় নতুন পদক্ষেপ নিয়ে আসলেন আরেক দিকপাল। জগতের নিয়মবদ্ধতা দেখে আইনস্টাইনও বিমোহিত হতেন। জগতকে যে মানুষ বুঝতে পারে—এ ব্যাপারটা তাকে মোহিত করে রাখত। সেই শৃঙ্খলার খোঁজে আইনস্টাইন ভিন্ন পথে যাত্রা করেন। বিংশ শতকের শুরুতে এসে আলবার্ট আইনস্টাইন নিউটনের বক্তব্যের ভিতটাই নাড়িয়ে দিলেন! বদলে দিলেন স্থান-কাল-মহাকর্ষের ধারণা। কিছু অনুমানের উপর দাঁড়িয়ে তিনি *জেনারেল থিওরি অফ রিলেটিভিটি* প্রস্তাব করেন। তারপর থেকে গ্রহ, নক্ষত্র-সহ বিশ্বলোকের এই প্রকাণ্ড আকারের গ্যালাক্সিগুলোর গতিবিধি ব্যাখ্যার জন্য এই সূত্র ব্যবহার করা হচ্ছে।

> "এই মহাবিশ্বে সুশৃঙ্খলার ছাপ অবাক করার মতো। মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমরা যতই আবিষ্কার করি ততই খুঁজে পাই যে এটি যৌক্তিক নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। কেউ চাইলে বলতেই পারে যে, এই সুশৃঙ্খলতা স্রষ্টার কাজ। আইনস্টাইনও তাই ভেবেছিলেন।"
>
> - স্টিফেন হকিং
> তাত্ত্বিক পদার্থবিদ

www.QuranerAlo.net

$$R_{ab} - \frac{1}{2} R\, g_{ab} + \Delta\, g_{ab} = \kappa\, T_{ab}$$

আইনস্টাইনের ফিল্ড ইকুয়েশন। আইনস্টাইন যখন হিসেব মিলাতে যান তখন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যান। এমন কিছু সামনে আসে যার জন্য তিনি ও সে-সময়ের বিজ্ঞানীরা প্রস্তুত ছিলেন না।

আইনস্টাইন একেবারে প্রথমে যখন এই সূত্রের ছক কাটলেন, তখন এমন কিছু সামনে এল যার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। সূত্র থেকে এমন সম্ভাবনা দেখা গেল যে, বিশ্বজগৎ প্রসারিত হতে পারে! কিন্তু আইনস্টাইন-সহ সেকালের পদার্থবিদরা ভাবতেন মহাবিশ্ব স্থির ও সীমাহীন; এর শুরু—শেষ নেই (Static infinite universe)! তাই আইনস্টাইন কোনোভাবেই এই প্রসারণের ব্যাপারটি মানতে পারলেন না। মহাকর্ষ বল তো দুটি বস্তুকে নিজের কেন্দ্রের দিকে টেনে রাখবে, তা হলে প্রসারণ কীভাবে হয়? মহাবিশ্ব নিশ্চয়ই নিজে-নিজে প্রসারিত হতে পারে না।

তাই মহাকর্ষের টানে সব গ্যালাক্সি যেন এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হয়ে না যায় সেজন্যে তিনি তার সূত্রের মাঝে একটা ধ্রুবক-সংখ্যা সেঁটে দিলেন। এটি হলো মহাজাগতিক ধ্রুবক (□), যার কাজ হচ্ছে মহাকর্ষের আকর্ষণকে ঠেকিয়ে রাখা যাতে করে গ্যালাক্সিগুলো এক জায়গায় চলে না আসে।

www.QuranerAlo.net

মহাবিস্ফোরণ এবং অতঃপর

The universe had a beginning
~Alexander Vilenkin

যদিও আইনস্টাইন মহাবিশ্বের প্রসারণের ব্যাপারটি মানতে চাননি, কিন্তু পরে দেখা গেল বিশ্বজগৎ আসলেই ক্রম প্রসারমান। আলেক্সান্ডার ফ্রিডম্যান আইনস্টাইনের সমীকরণ ব্যবহার করে তাত্ত্বিকভাবে প্রমাণ করে দেখান যে—মহাবিশ্ব আসলে স্থির নয় বরং প্রসারিত হওয়ার কথা। কয়েকবছর পর নামকরা পদার্থবিদ ও খ্রিস্টান যাজক জর্জ লেমেটার তাত্ত্বিকভাবে ও পর্যবেক্ষণ-সহ মত দেন ব্যাপারটা আসলে তাই। লেমেটার বললেন যেহেতু নক্ষত্রগুলো একে অন্য থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, তাই অতীতে ফিরে গেলে একপর্যায়ে দেখা যাবে সমস্ত পদার্থ একত্রে ঘনীভূত অবস্থায় ছিল। অনেকটা 'মহাজাগতিক ডিম'-এর মতো। এর মানে হচ্ছে মহাবিশ্ব অনাদি কাল থেকেই অস্তিত্বে ছিল এমন কথা ভুল। একদা মহাবিশ্বের অস্তিত্ব ছিল না, পরে অস্তিত্বে এসেছে বাস্তবত এক মহাগর্জনের মাধ্যমে!

লেমেটারের ব্যাখ্যা শুনে তখন অনেক বিজ্ঞানীই নাক সিঁটকালেন। তারা বললেন ধর্মীয় কারণে লেমেটার এই মত সাজিয়েছেন। কারণ স্বাভাবিকভাবেই বুঝে আসে, যে জিনিস আগে ছিল না, কিন্তু পরে অস্তিত্বে এসেছে; এমন কিছুর অস্তিত্বের পিছে কোনো-না-কোনো কারণ তো থাকতে হবে। যেহেতু মহাবিশ্বের শুরু হয়েছে অনস্তিত্ব থেকে, তাই এর পিছেও কোনো কারণ থাকার কথা। কিন্তু এই কারণ হতে হবে মহাবিশ্বের বাইরের কোনো কিছু। কারণ মহাগর্জনের পরেই স্থান-কাল-পদার্থ-সূত্র এদের উদ্ভব। তা হলে তো স্রষ্টার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে! (ইউজিন নাগাসাওয়া, ২০১১) নাহ, এটা মানা যাচ্ছে না! কিছু বিজ্ঞানী চাইলেন না বিজ্ঞান দিয়ে স্রষ্টার ইঙ্গিত আসুক। তাই সে সময়ের অন্যান্য পদার্থবিদেরা লেমেটারকে পাত্তা দিলেন না।

পরে লেমেটারের পক্ষে পর্যবেক্ষণমূলক প্রমাণ নিয়ে হাজির হন জ্যোতির্বিদ এডুইন পাওয়েল হাবল। তিনি মাউন্ট উইলসন অবজারভেটরির শক্তিশালী টেলিস্কোপ দিয়ে গ্যালাক্সিগুলোকে পর্যবেক্ষণ করে গ্যালাক্সি-থেকে-আসা আলো বিশ্লেষণ করতে লাগলেন। তুমি যদি দৃশ্যমান আলোর চার্ট খেয়াল করো তা হলে দেখবে লাল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বড়ো, নীল আলোরটা ছোটো। কোনো গ্যালাক্সি যদি আমাদের কাছে আসতে থাকে তা হলে তা-থেকে-নিঃসৃত আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য ছোটো হতে থাকবে, ফলে নীল

www.QuranerAlo.net

আলোর দেখা মিলবে। একে বলা যেতে পারে ব্লু শিফট। অন্যদিকে গ্যালাক্সিটি যদি দূরে সরে যেতে থাকে তা হলে তা-থেকে-নিঃসৃত আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য দীর্ঘ হতে থাকবে; ফলে লাল আলোর দেখা মিলে। এটা হলো রেড শিফট। এডুইন হাবল হিসেব কষে গ্যালাক্সির এই গতির জন্য একটা সমীকরণও দাঁড় করিয়ে ফেললেন ($v=H_0d$) যদিও হাবলের বেশ কয়েক বছর আগেই জর্জ লেমেটার এই সূত্রের ছক এঁকেছিলেন। (হেলগ ক্রাঘ, ১৯৯৬)

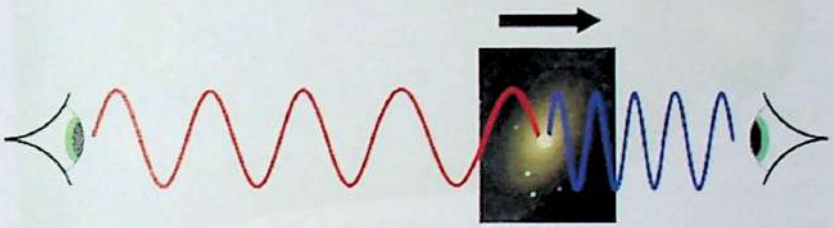

সহজ চিত্রে ডপলার শিফট। গ্যালক্সি যদি তোমার থেকে দূরে সরে যেতে থাকে তাহলে তার থেকে আসা আলো লাল হবে। গ্যালক্সি তোমার দিকে আসতে থাকলে আলো হবে নীল। লালের তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেশি, নীলের কম।

তো হাবল দেখলেন গ্যালাক্সির দূরত্ব যত বেশি তার বেগও তত বেশি। অর্থাৎ সব গ্যালাক্সি যেন একে অপর থেকে দ্রুত পালিয়ে যাচ্ছে! আইনস্টাইন মহাবিশ্বের প্রসারণের ব্যাপারটি মানতে পারেননি। নিজ সমীকরণে একটি উটকো ধ্রুবক ঢুকিয়ে দিয়ে ব্যাপারটি থেকে সরে আসতে চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রসারণের পর্যবেক্ষণমূলক প্রমাণ মিলার পর তিনি মাথায় হাত দিলেন, পরে বলেছিলেন—এটি ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে বড়ো ভুল সিদ্ধান্ত!

গ্যালাক্সিগুলোর একে-অপর থেকে দ্রুত দূরে সরে-যাওয়ার-বিষয়টি লেমেটারের সিদ্ধান্তের দিকে ইঙ্গিত দিতে থাকে—অতীতের কোনো ক্ষণে সবগুলো গ্যালাক্সি সম্ভবত এক জায়গায় ছিল! সেখান থেকে এই বিশ্বজগৎ প্রসারিত হতে শুরু করায় গ্যালাক্সিগুলো একে অন্য থেকে দূরে সরে যেতে শুরু করে; এবং এখনও সরে যাচ্ছে। অর্থাৎ বিশ্বজগতকে যে অসীম ও শুরু-শেষহীন ভাবা হতো তা ঠিক নয়। বোঝা যাচ্ছে এর শুরু আছে, এবং একসময় তাপমৃত্যুর মাধ্যমে এর শেষ হবে—এমনটাই গুঞ্জন উঠল।

কিন্তু অনেক বিজ্ঞানী মহাগর্জন তত্ত্ব মানতে চাইলেন না। কারণ এই তত্ত্ব মানলে তো পরম-স্রষ্টার দিকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। স্রষ্টায় অবিশ্বাসী পদার্থবিদেরা তাই এই তত্ত্বকে প্রবলভাবে আক্রমণ করার চেষ্টা করলেন। বিখ্যাত ফ্রেড হয়েল বিবিসি রেডিয়োর এক অনুষ্ঠানে তাচ্ছিল্য-করে এই তত্ত্বের নাম দিলেন 'বিগ ব্যাং'। ফ্রেড হয়েল আরও দুজন বিজ্ঞানীকে নিয়ে অন্য মডেল দাঁড় করালেন—'অটল মহাবিশ্ব মডেল' (Steady state

www.QuranerAlo.net

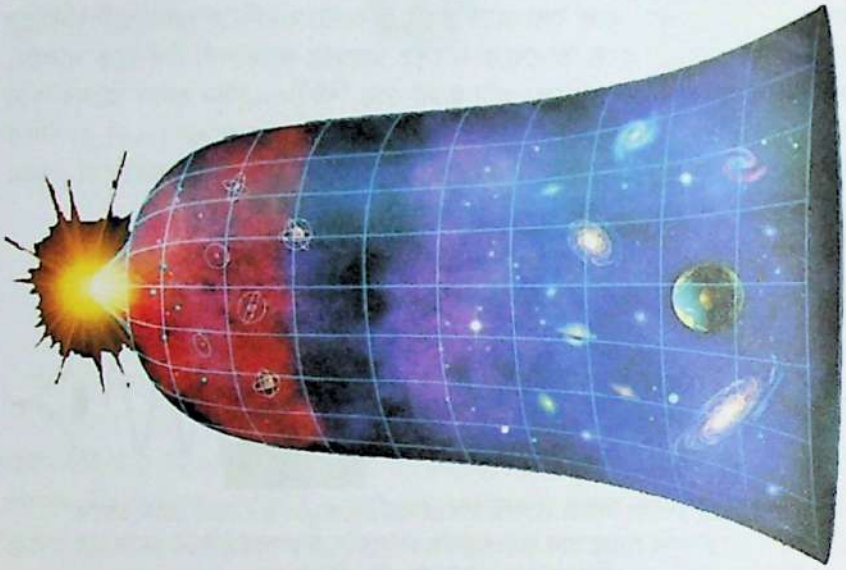

প্রচলিত ধারণায় ১৪০ কোটি বছর আগে এক মহাবিস্ফোরণের ফলে এক সিঙ্গুলারিটি থেকে মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয়। এই সিঙ্গুলারিটি আসলে কী, কোত্থেকেই-বা এলো—বিজ্ঞানীরা তা জানেন না। বিজ্ঞানীরা এই সিঙ্গুলারিটিকে 'নাথিংনেস' বলে থাকেন। কারণ তখন স্থান-কাল-পদার্থ-সূত্র কিছুই ছিলো না। একজন পদার্থবিদের ভাষায়, 'আমাদের মহাবিশ্ব শুরুতে আসলে এই নাথিং-ই ছিল, এই সিঙ্গুলারিটি নামক নাথিং, যার ঘনত্ব ও তাপমাত্রা ছিলো অসীম। কোত্থেকে এলো এটা, কেনই-বা এলো আমরা জানি না।' (আহমেদ মোস্তফা কামাল, ২০১৯) সাধারণ মানুষ জানে না, এই সিঙ্গুলারিটি নামক 'নাথিং' যে আসলে 'সামথিং'। তাদের সরলতার সুযোগ নিয়ে কিছু মানুষ তাদের প্রতারিত করার চেষ্টা করে। ঢাউস সাইযের বই লিখে মানুষকে ধোঁকা দেয়, আর বলে— দেখো! একেবারে শূন্যতা থেকে আপনা-আপনি মহাবিশ্ব তৈরি হতে পারে! খোদার দরকার কী? পদার্থবিদ্যার সূত্র আছে না? এরাই যথেষ্ট! কিন্তু সেই সূত্র কীভাবে এলো, সিঙ্গুলারিটি কোত্থেকে এলো—এই প্রশ্ন তারা এড়িয়ে যায়। তাদের এমন ধোঁকাবাজির সমালোচনা করেছেন তাদের লোকরাই। (রাফান আহমেদ, ২০১৯)

মহাবিস্ফোরণের পর মহাবিশ্ব কীভাবে বিবর্তিত (পরিবর্তিত) হলো এ নিয়ে সাধারণ মানুষের মাঝে প্রচলিত ধারণা হলো ইনফ্লেশন তত্ত্ব। অনেকেই অজ্ঞতার কারণে মহাবিশ্ব বিকাশের এই ধারণাকে নিশ্চিত সত্য ভেবে বসে। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। ইনফ্লেশন তত্ত্ব অনেকেই মানতে চাইছেন না। একই উপাত্তের উপর দাঁড়িয়ে বিজ্ঞানীরা ১৩-১৪টি ভিন্নভিন্ন তত্ত্ব প্রস্তাব করেছেন। উপাত্তের সীমাবদ্ধতা, বিকল্প তত্ত্ব সমস্যা ইত্যাদি কারণে বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্বই চূড়ান্ত নয়, বিজ্ঞানের কোনো ফ্যাক্টই নিশ্চয়তা দেয় না। সাধারণ মানুষকে এসব জানানো হয় না। ফলে তারা ভাবে বিজ্ঞান যা বলেছে তা মনে হয় চূড়ান্ত।

ছবি: নিউ অ্যাটলাস

www.QuranerAlo.net

theory)। যাতে করে বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব থেকে স্রষ্টার ইঙ্গিত পাওয়া না যায়। তাদের প্রস্তাবিত মহাবিশ্বের কোনো শুরু নেই, কোনো মহাবিস্ফোরণ নেই। ব্যস, স্রষ্টাকে মানার ঝামেলা থেকে মুক্তি! এই তত্ত্ব দ্রুতই হালে পানি পেল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিকতে পারলো না।

হাবলের পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি মহাজগতে হিলিয়ামের প্রাচুর্য ও আদিপটভূমির বিকিরণ (cosmic microwave background radiation) খুঁজে পাওয়া মহাগর্জন তত্ত্বকে শক্তিশালী করে তোলে। সব পর্যবেক্ষণ একাট্টা করে বিজ্ঞানীরা ছক সাজালেন—আজ থেকে আনুমানিক প্রায় ১৪০ কোটি (14 by) বছর আগে এক অত্যন্ত ঘনীভূত ও উচ্চ তাপমাত্রার বিন্দু থেকে মহাবিস্ফোরণের ফলে ক্রমশ প্রসারণের মাধ্যমে এই মহাবিশ্বের সূচনা হয়েছে। বিশ্বজগতের ঠিক সূচনামুহূর্ত বা ঠিক তার পরের মুহূর্তগুলো বিজ্ঞানীরা এখনও বুঝে উঠতে পারেননি। অনুমান করা হয় শিশু-বিশ্বজগৎ জন্মের পর মাত্র $১০^{-৩৩}$ সেকেন্ডের মাঝে সেই ক্ষুদ্র বিন্দু থেকে অকল্পনীয়ভাবে ফুলে-ফেঁপে ওঠে। যাকে মহাজাগতিক স্ফিতি বা কসমিক ইনফ্লেশন (cosmic inflation) নাম দেওয়া হলো। স্থানের এই অবিশ্বাস্য প্রসারণের গতি ছিল আলোর বেগের চেয়েও বেশি! এরপর আনুমানিক ১৪০ কোটি বছর কেটে গেল। অবিশ্বাস্য প্রসারণটি গতি কমিয়ে দিল অনেক। এর মাঝে তৈরি হতে থাকল নক্ষত্র-গ্রহ-উপগ্রহ।

ধারণা করা হয় এভাবেই আমাদের মহাবিশ্ব আজকের পর্যায়ে এসেছে। তোমরা অনেকেই এই গল্পের সাথে পরিচিত। তাই এই গল্প বেশি বাড়াতে চাই না। জনপ্রিয় বিজ্ঞান বইগুলোতে মহাবিশ্ব গঠনের এই গল্প তোমরা 'সত্য' বলে শুনে এসেছ। আমিও তা-ই ভাবতাম। কিন্তু বড়ো হওয়ার পর যখন পড়াশোনার দিগন্ত বিস্তৃত হলো তখন বেশ আশ্চর্য হয়ে পড়লাম। জানতে পারলাম একেবারে ফ্যাক্ট-ভেবে-বসে-থাকা মহাজাগতিক স্ফিতি তত্ত্ব নিয়ে বিজ্ঞানীরা বেশ সংশয়ে আছেন। এই ইনফ্লেশন তত্ত্ব সাজানোর পিছে যারা ছিলেন তাদের মাঝে একজন এই তত্ত্ব থেকে সরে এসেছেন। (পল স্টেইনহার্ড, ২০১১)

ইনফ্লেশন তত্ত্ব প্রদানের পর বেশ কিছু ঝামেলা দেখা দিতে লাগল। তত্ত্ব অনুযায়ী সময়ের সাথে গ্যালাক্সির গতি কমে আসার কথা ছিল। অথচ কমার নামগন্ধও দেখা গেল না, বরং দেখা গেল গ্যালাক্সিগুলো একে-অন্য থেকে দ্রুত পালিয়ে যাচ্ছে! অর্থাৎ নজরে-আসা পদার্থের তুলনায় প্রসারণগতি আরও শক্তিশালী প্রতীয়মান হলো। বিজ্ঞানীরা দেখলেন এই সমস্যা সমাধানে মহাকর্ষের ধারণা আবার বদলানো লাগছে দেখি! কিন্তু কিছুদিন পরপর মহাকর্ষের ব্যাখ্যা বদলানো লাগলে বিপদ না! মানুষ বলবে—কী বিজ্ঞান শেখাচ্ছ তোমরা?

> "সত্যি বলতে কী—মৌলিকভাবে মহাকর্ষ যে আসলে কী তা আমরা জানি না। আমরা খালি এর আচরণ বুঝতে পারি, এই যা।"
>
> - নাসা
> স্টারচাইল্ড প্রোজেক্ট

www.QuranerAlo.net

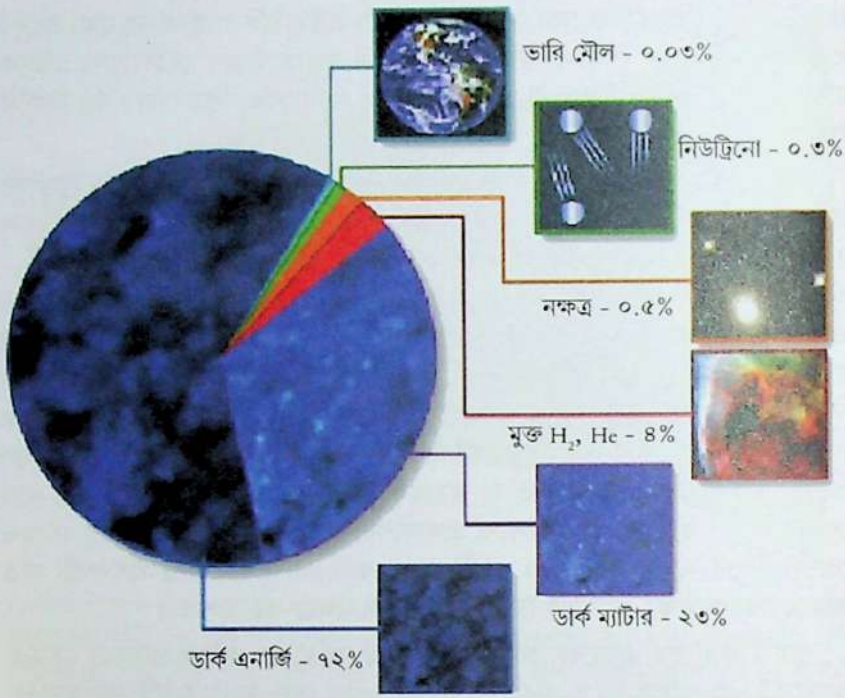

মহাবিশ্বের অনুমিত গঠন। প্রচলিত ব্যাখ্যা (Δ CDM) অনুযায়ী মহাবিশ্বের মাত্র ৪-৫% সম্পর্কে ধারণা পাওয়া গেছে। বাকি ৯৫% অজানা রহস্যে ভরা। মানে অজ্ঞতায় ভরা আরকি।

মূলছবি : নাসা

মহাকর্ষের স্বরূপটাই ধরতে পারছ না!

তাই তারা সেটা না করে অজ্ঞাত-পদার্থ (Dark matter) ও অজ্ঞাত-শক্তি (Dark energy) নামের দুটি রহস্য তৈরি করে (ad hoc hypothesis) বর্তমানে প্রচলিত মহাকর্ষের ধারণাকে বাঁচানোর চেষ্টা করলেন। (ডেভিড মেরিট, ২০১৭) বলা হলো, এই অজ্ঞাত-পদার্থ ও অজ্ঞাত-শক্তি হচ্ছে মহাকাশবিদ্যার মিসিং লিংক! অজ্ঞাত-পদার্থ দৃশ্যমান পদার্থকে ধরে রাখে, আর অজ্ঞাত-শক্তি তাদের দূরে ঠেলে দিতে চায়।

তা এই অনুমিত অজ্ঞাত জিনিস দিয়ে মহাবিশ্বের কত অংশ ভরপুর? প্রায় ৯৫% শতাংশই হলো অজ্ঞাত-পদার্থ ও অজ্ঞাত-শক্তি, যা সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। কিচ্ছু না! বাকি ৪-৫% দৃশ্যমান অংশের কিছুটা আমরা জানি। এক মহাকাশবিদ আক্ষেপ করে বলেছেন, *'এটা খুবই লজ্জার বাপার যে এই মহাবিশ্বের মাত্র ৫% আমরা জানি।'*

প্রচলিত বইপত্রে বলা হয় এই ডার্ক ম্যাটার ও ডার্ক এনার্জি-র 'অস্তিত্ব সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে'। (ড. জাফর ইকবাল, ২০১৮) অথচ বাস্তবতা হলো

www.QuranerAlo.net

এগুলো হলো স্রেফ সহযোগী অনুকল্প। একটা নতুন তত্ত্ব বানানোর চেয়ে আগের তত্ত্বে কোনো কিছুকে ঠেলে ঢোকানো সহজ। কেউই জানে না এগুলো আসলে কী!

> আমি জানতে চাই ডার্ক ম্যাটার ও ডার্ক এনার্জি কী দিয়ে তৈরি। এগুলো এখনও রহস্যই রয়ে গেল, পুরোপুরিই রহস্য। (এদের ধারণা) আবিষ্কারের পর থেকে এখন পর্যন্ত কেউ এই রহস্য সমাধানের ধারে-কাছেও ঘেঁষতে পারেনি।
>
> - নভোপদার্থবিদ নিল ডিগ্রাস টাইসন, ব্রেইনিকোটস

সাম্প্রতিক গবেষণা জানাচ্ছে এগুলোর অস্তিত্বের ধারণা আর যুক্তিসিদ্ধ মনে হচ্ছে না! (সাইন্সডেইলি, ২০১৭) কেউ-কেউ মহাকর্ষের ধারণাকে ঘষামাজা করে ডার্ক ধারণার বিপক্ষে বলছেন। (জুরি শিরমভ, ২০১৯) শেষমেশ উপায় না দেখে ডার্ক এনার্জির খোঁজে প্রজেক্ট হাতে নিয়েছেন কিছু বিজ্ঞানী। আগামী ৫ বছর ধরে জটিল যন্ত্রপাতি (Dark Energy Spectroscopic Instrument) দিয়ে তারা অজ্ঞাতশক্তির খোঁজে মহাকাশ চষে বেড়াবেন। (পল্লব ঘোষ, ২০১৯)

> "আমাদের গবেষণা জানাচ্ছে—সুপারনোভা দিয়ে হিসেব-নিকেশ করে যে ডার্ক অ্যানার্জির ধারণা প্রস্তাব করা হয়েছে, যা কিনা ২০১১-তে নোবেল পুরস্কারও জিতে নিয়েছে—তা একটি ভঙ্গুর ও ভুল অনুমানের-উপর-দাঁড়ানো।"
>
> - প্রফেসর ইয়াং-ওক লি
> মহাকাশবিদ

মহাকাশের অধিবাসীদের গতিবিধি ব্যাখ্যার জন্য যে জেনারেল রিলেটিভিটির ব্যবহার করা হয় তাও কিন্তু ঝামেলামুক্ত না। এই তত্ত্বের একটি বুনিয়াদি অনুমান হলো ভ্যাকিউমে আলোর গতি পুরোপুরি ধ্রুবক। কিন্তু এই ধারণার বিপরীতে প্রমাণ পাওয়া গেছে। (স্টুয়ার্ট ক্লার্ক, ২০১৭) তা ছাড়া মহাবিশ্বের সূচনা-মুহূর্তে, ব্ল্যাকহোলে জেনারেল রিলেটিভিটির ধারণা কাজ করে না। (জেরেমি ডেটন, ২০১৯) অতিআণবিক পর্যায়েও এটি ধারণা খাটে না; এক্ষেত্রে কোয়ান্টাম মেকানিক্স নিয়ে আলাপচারিতা চলে। কিন্তু ঝামেলা হলো, জেনারেল রিলেটিভি সাথে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের পুরো আড়াআড়ি ভাব। জগতের বর্ণনায় দুই তত্ত্ব দুই কথা বলে; একটি ডিটারমিনিস্টিক, আরেকটা প্রোব্যাবিলিস্টিক।

এই কোয়ান্টাম মেকানিক্স বোঝা কিন্তু বড্ড মুশকিল। জনপ্রিয় এক লেখকের কলমে জানা যায়, 'কোয়ান্টাম মেকানিক্স খুবই রহস্যময় একটা বিষয়—এটা দিয়ে ব্যাখ্যা করার পর সাধারণত বিষয়টি আরও ভালো করে বোঝার পরিবর্তে মানুষজন আরও বিভ্রান্ত হয়ে যায়।' (ড. জাফর ইকবাল, ২০১৫) সাধারণ মানুষ নয় শুধু, পদার্থবিদদেরও একই দশা! এক কোয়ান্টাম-মেকানিক্স বিশারদের ভাষ্যে, 'একজন আমজনতা

> "আমার মতে কেউই কোয়ান্টাম মেকানিক্স বোঝে না।"
>
> - রিচার্ড ফাইনম্যান
> তাত্ত্বিক পদার্থবিদ

www.QuranerAlo.net

হাতে-থাকা স্মার্টফোনের ভেতরে-চলা ক্রিয়াকলাপ যতটুকু বোঝে, পদার্থবিদদের কোয়ান্টাম মেকানিক্স বোঝার অবস্থাও তেমন।' (শন ক্যারল, ২০১৯) আইনস্টাইন কখনোই কোয়ান্টাম মেকানিক্সকে সুনজরে দেখেননি।

এত অনিশ্চয়তা ও সংশয়ের ব্যাপারে তোমরা জানো না, তোমাদের জানতে দেওয়া হয়নি। মহাবিশ্বের যে শুরু আছে এ নিয়ে মতানৈক্য তেমন নেই (লিসা গ্রসম্যান, ২০১২)। কিন্তু এর পরে কীভাবে মহাবিশ্বের বিকাশ হলো তা নিয়ে বিতর্ক চলছে এখনও। বর্তমানে মহাবিশ্বের বিকাশ নিয়ে প্রায় ১৩-১৪টি ভিন্ন-ভিন্ন তত্ত্ব রয়েছে বিজ্ঞানীদের মাঝে! (একরেম এডিনার, ২০১৮) কিন্তু তোমরা একটা ব্যাখ্যাকেই সত্য বলে জানো! কোনো সময়ে বিজ্ঞানের যে ব্যাখ্যা বহুল প্রচার পায় তার সাথে অনেক মানুষের ক্যারিয়ার জড়িয়ে থাকে। পুরোনো ধারণা বাদ দেওয়া এত সহজ না। তাই দেখা যায় যে-সকল উপাত্ত প্রচলিত ব্যাখ্যার সাথে মিলে না, সেগুলো বাদ দেওয়া হয় বা ব্যাখ্যার জালে ফাঁসিয়ে দেওয়া হয়। তা ছাড়া ভিন্ন ব্যাখ্যাগুলোকেও দমানোর চেষ্টা চলে প্রতিনিয়ত। (হেলঘ ক্রাগ, ২০১৯) সেক্যুলার সমাজ বিজ্ঞান-থেকে-আসা ধারণার উপর দাঁড়িয়ে থাকতে চায়। আর এই জ্ঞান যদি নিজেই টালমাটাল হয় তা হলে আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরা অবশ্যম্ভাবী। তাই বিজ্ঞানের উপর বিশ্বাস পাকাপোক্ত করতে হলে ভিন্ন বৈজ্ঞানিক মতকে অগ্রাহ্য করা বা দমিয়ে রাখা লাগবেই।

বিজ্ঞানের এত অগ্রগতি, এত-এত আবিষ্কার; অথচ দেখো আমাদের জ্ঞান কতটা সীমিত!

মহাবিশ্বের বিলিয়ন-বিলিয়ন গ্যালাক্সির মাঝে মাত্র একটি গালাক্সি হলো আমাদের শুভ্রপথ, সেই গ্যালাক্সির অজস্র নক্ষত্রের মাঝে মাত্র একটি হলো সূর্য; সেই সূর্যকে-ঘিরে-চলতে-থাকা ছোট্ট একটি নীল গ্রহের নাম পৃথিবী। সেই পৃথিবীর বাসিন্দার মাঝে আমরা মানুষ; দেড় কেজি মস্তিষ্কের, বুদ্ধি-বিবেক-চিন্তাশক্তি-সম্পন্ন প্রাণি। বিজ্ঞানের এত অগ্রগতি সত্ত্বেও, মানব-সভ্যতার এত কাল পার হওয়ার পরও এই মহাবিশ্বের ৪-৫% এর কিছু অংশ আমরা জানতে পেরেছি! যতটুকু জেনেছি সেটা নিয়েও আমরা নিশ্চিত না! কখনও নিশ্চিত হতে পারবও না! (জন বাওকার, ২০১৪)

> বিশ্ব পরিচালিত হয় যে-সমস্ত মৌলিক গাণিতিক সূত্রে, সেগুলো নিয়েই পদার্থবিদ্যার সূত্রসমূহের নকশা তৈরি হয়েছে। কিন্তু যে-সমস্ত পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেছে তা চূড়ান্ত নয়। এবং প্রকৃতপক্ষে মহাবিশ্বের স্বরূপ কী তা কোনো বিজ্ঞানীই চূড়ান্ত ও পূর্ণাঙ্গভাবে আমাদেরকে বলতে পারবেন না।

এরপরও আমরা বিজ্ঞানের অহংকার করি। কী আশ্চর্য!

www.QuranerAlo.net

বিনি সুতোর মালা

A Fortunate Universe

জগৎ সম্পর্কে জানতে গিয়ে নানা সীমাবদ্ধতায় আমরা আবদ্ধ ঠিকই। কিন্তু এই জানার পথে আমরা এমন কিছু খুঁজে পেয়েছি যা আমাদের চিন্তার সীমাকে নতুন দিগন্তে উন্মোচিত করে। আমাদের এই মহাবিশ্বের স্থিতি ও ঐশ্বর্য আমরা যতই অবলোকন করি, ততই পরিকল্পনার ছাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন গবেষণায় উপাত্ত পাওয়া যাচ্ছে যে—শিশুরা সহজাত বা প্রাকৃতিকভাবেই স্রষ্টার অস্তিত্বের জ্ঞান নিয়ে জন্মায় (intuitive theists)। (ডেবোরাহ কেলেমেন, ২০০৪) যদি একদল শিশুকে একটি জনমানবহীন বিচ্ছিন্ন দ্বীপে রেখে আসা হয় এবং সেখানে তারা বেড়ে উঠতে থাকে; তবে তারা স্বভাবতই এই বিশ্বাস নিয়ে বেড়ে উঠবে যে—তাদের চারপাশের এই অবাক-করা জগতের প্রকৃত অস্তিত্ব আছে। পায়ের নিচের মৃত্তিকা, সামনের প্রাণোচ্ছল জলধি, বয়ে-যাওয়া সমীরণ, নয়নাভিরাম সবুজ গাছপালা, উদাসী নীল আকাশ—এসবেরই প্রকৃত অস্তিত্ব রয়েছে। পাশাপাশি তারা সহজাত ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিশ্বাস গড়ে তুলবে যে, এই অস্তিত্বের পিছে এক স্রষ্টা অস্তিত্বশীল যিনি এ-সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন ও পরিচালনা করছেন। (মার্টিন বেকফোর্ড, ২০০৮)

তাদের সহজাত চিন্তাধারা হলো প্রকৃতির নানা ঘটনাবলীকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মনে করা। বিগত বছরগুলোতে পরিচালিত কিছু বৈজ্ঞানিক গবেষণা থেকে দেখা গেছে—কিছু সর্বজনীন ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়েই শিশুরা জন্মায়। যেমন : ঐশ্বরিক সত্তার অস্তিত্ব, মহাবিশ্বের ঐশ্বরিক সৃষ্টি, মনের অস্তিত্ব, পরকালে বিশ্বাস ইত্যাদি। এই বিশ্বাসগুলোই বীজ হিসেবে কাজ করে, যা থেকে পরবর্তীকালে ধর্মের বৃক্ষ তার ডালপালা মেলে ধরে। (পল ব্লুম, ২০০৭) প্রকৃতির সজ্জা দেখে একে কোনো উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে—এমনটা ভাবার সহজাত-প্রবণতা শুধু শিশুদের নয়, পরিণতদের মাঝেও দেখা যায়। (জাস্টিন ব্যারেট, ২০১২) এমনকি এ প্রবণতা স্রষ্টার অস্তিত্বে অবিশ্বাসীদের মাঝেও দেখা যায়! তাই বলা যায়, প্রকৃতিকে ডিজাইনড তথা পরিকল্পিতভাবে সৃষ্ট হিসেবে দেখার প্রবণতা সহজাত-অনুভূতি; মানব মননে এর শেকড় গ্রথিত। (ডেবোরাহ কেলেমেন এট এল., ২০১৫)

www.QuranerAlo.net

আমাদের এই সহজাত-চিন্তাধারার পক্ষে প্রকৃতিতে কোনো প্রমাণ আছে কি? বিজ্ঞানীরা দেখেছেন জগতের সূত্রবদ্ধ আচরণ, বিভিন্ন ধ্রুবক, মহাবিশ্বের সূচনা দশা, মৌলিক কণিকার ভর, মৌলিক বলগুলোর আপেক্ষিক শক্তি—ইত্যাদি এমন অভাবনীয় নিপুণতার সাথে সমন্বিত, যার ফলে মহাবিশ্বের অস্তিত্ব বজায় থাকা ও এতে প্রাণের বিকাশ সম্ভব হতে পারে। কেতাবি বইপুস্তকে এ বিষয়টা ফাইন-টিউনিং নামে পরিচিত। একটা প্র্যাক্টিকেল উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা বোঝানো যাক।

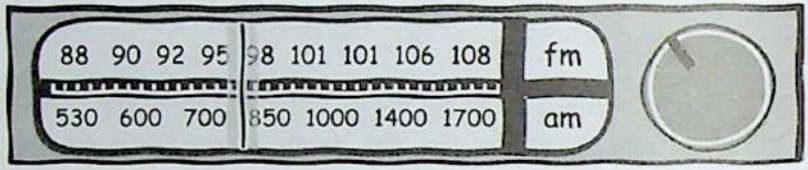

স্মৃতিজড়িত সেই রেডিয়োর একটা নমুনা। এফএম রেডিয়োতে ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ হলো ৮৮-১০৮ মেগাহার্জ। তুমি যদি শুক্রবারের রাতে ভূত এফএম শুনতে চাও তা হলে তোমাকে রাত ১২টায় ঠিক ৮৮.০ দাগে টিউন করতে হবে। অথচ ছবিতে দাগ আছে প্রায় ৯৭ এর ঘরে।

ছবি : আ ফরচুনেট ইউনিভার্স

একসময় দেশে FM Radio খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠতে শুরু করে। কয়েক বছরের মাঝে বেশ ক'টি রেডিয়ো স্টেশন চালু হয়। তখন আমার বেশ রেডিয়ো শোনা হতো। শুক্রবার রাতের অপেক্ষায় থাকতাম ভূত এফএম শোনার জন্য। FM Radio-তে দাগ কাটা থাকে ৮৮-১০৮ মেগাহার্জ পর্যন্ত। কিন্তু ভূত এফএম শুনতে হলে কেবল একটা ফ্রিকোয়েন্সির খোঁজেই নব ঘোরাতে হবে, আর সেটা হলো 88.0 FM। অর্থাৎ তোমাকে আগে থেকেই জানতে হবে নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সি কোনটা। তারপর ফ্রিকোয়েন্সির একটা বড়ো সম্ভাবনা থেকে সঠিক সময়ে সেই সুনির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সি মেলাতে পারলেই ভূত এফএম শোনা যাবে। তোমরা হয়তো এই সুযোগ পাওনি, আগেই হাতে স্মার্টফোন চলে এসেছে। তবে আশা করি ব্যাপারটা ধরতে পেরেছ।

জগতকে অনুধাবনের পথে বিজ্ঞানীরা এমন অনেক নমুনা খুঁজে পেয়েছেন যার ফলে এটা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় মহাবিশ্বের অস্তিত্ব, প্রাণের আবির্ভাব ও বিকাশের জন্য অত্যন্ত সুনিপুণ সমন্বয় বিদ্যমান। যেমন দেখা গেছে মহাগর্জনের শুরুতে শক্তির তারতম্যের পরিমাণ যদি $১/১০^{৬০}$ ভাগের এক ভাগও হতো—তবে মহাবিশ্ব হয় চুপসে যেত অথবা এত দ্রুতগতিতে প্রসারিত হতো যে, কোনো

"মহাবিশ্বের সূচনা এমন নিখুঁত মাপের কেন হলো—এই প্রশ্নের উত্তর হতে পারে, এটি এক স্রষ্টার কাজ যিনি আমাদের মতো সত্তাকে সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। এই ব্যাখ্যা ছাড়া অন্য কোনোভাবে এই নিপুণ সমন্বয়ের সুরাহা করা খুবই কঠিন।"

- স্টিফেন হকিং
তাত্ত্বিক পদার্থবিদ

www.QuranerAlo.net

নক্ষত্রই সৃষ্টি হতো না! (পল ডেভিস, ২০০৬) তোমরা জানো, পদার্থবিদ্যায় মৌলিক বল চারটি—মাধ্যাকর্ষণ বল, তড়িৎচৌম্বক বল, সবল নিউক্লিয় বল, দুর্বল নিউক্লিয় বল। হিসেব করে দেখা গেছে, তড়িৎচৌম্বক বল ও মাধ্যাকর্ষণ বলের অনুপাত ১০^{৩৯}: ১ না হয়ে যদি সামান্যতম কম বা বেশি হতো, তা হলে জীবন-বিকাশে-সহায়ক-নক্ষত্র যেমন সূর্যের অস্তিত্ব থাকত না। (পল ডেভিস, ২০০৮) তোমরা পরমাণুর গঠন পড়ার সময় দেখেছ—প্রতিটি পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে নিউক্লিয়াস আর বাইরে বিভিন্ন কক্ষপথে ইলেকট্রন ঘুরে বেড়ায়। নিউক্লিয়াসে প্রোটন আর নিউট্রন একত্রে থাকে। এদেরকে ধরে রাখে সবল নিউক্লিয় বল। জানা গেছে ইলেকট্রনের চার্জ যদি সামান্যতমও হেরফের হতো, তা হলে আজকের প্রাণ সম্ভব হতো না। (স্টিফেন হকিং, ১৯৯৬) নিউট্রনের ওজন প্রোটনের ওজনের মাত্র ০.১% বেশি না হলে এটি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যেত, ফলে প্রাণের অস্তিত্ব থাকত না। আর সবল নিউক্লিয় বলের মান মাত্র ৫% এদিক-সেদিক হলেই প্রাণের উৎপত্তি অসম্ভব হয়ে পড়ত। (জেরেন্ট লুইন ও লুক বার্নেস, ২০১৬)

এবার আমাদের পৃথিবীর দিকে তাকানো যাক। সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্বটা এমন যে, পৃথিবীর তাপমাত্রা খুব বেশি গরমও না, আবার ঠান্ডাও না। ফলে পানি তরল অবস্থায় থাকতে পারে—যা প্রাণের জন্য আবশ্যক। এই অবস্থান থেকে সামান্য নিকটে বা দূরে গেলেই গন্ডগোল হয়ে যেত। পৃথিবীর এই অনুকূল অবস্থানকে একটা গালভরা নাম দেওয়া হয়েছে—গোল্ডিলকস জোন (Goldilocks Zone)। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন এমন সংকীর্ণ এলাকায় অবস্থান-লাভ খুবই দুর্লভ একটি ব্যাপার! পৃথিবীর অবস্থান যে কেবল দুর্লভ শুধু তাই নয়, একই সাথে সৌভাগ্যময় বলতে হবে—সর্পিলাকার মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিতে অবস্থানের কারণে। কারণ উপবৃত্তাকার গ্যালাক্সিতে এমন পূর্ণ আকৃতির গ্রহ আদৌ গঠিত হয় কি না, সন্দেহ আছে! আরও অবাক করার মতো ব্যাপার হলো, শুধু পৃথিবীই নয়, বরং সূর্যও আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির অনুকূল এলাকায় অবস্থিত! (ওয়ার্ড ও ব্রাউনলি, ২০০৩) তা ছাড়া, আমাদের সূর্যটাও ব্যতিক্রমী তারকা। ৯০% তারকাই সূর্যের চেয়ে ছোটো। তারকা ছোটো হলে অনুকূল এলাকা এত কাছে হয় যে, সে এলাকায় থাকা গ্রহ তারকার মহাকর্ষের টানে আটকে যায়। একপাশ চিরকালের জন্য তারকার দিকে নির্দিষ্ট হয়, অন্যপাশ হয় আঁধার-শীতল! (হাওয়ার্ড স্মিথ, ২০১১)

> "নাস্তিক্যবাদ পুরোই নির্বুদ্ধিতার শামিল। সৌরজগতের দিকে তাকিয়ে আমি দেখতে পাই—আমাদের পৃথিবীটা সূর্য থেকে একদম যথার্থ দূরত্বে অবস্থিত। ফলে সঠিক পরিমাণে আলো ও তাপ আসে এই ধরায়। এমন সজ্জা হঠাৎ করে হয়ে যেতে পারে না।"
>
> - আইজ্যাক নিউটন
> তাত্ত্বিক পদার্থবিদ

সূর্যের কথা যখন হলো তখন আর চাঁদ বাকি থাকবে কেন! কাব্য ও সাহিত্যের অন্যতম অনুষঙ্গ হলো আকাশের ওই ঝলসানো রুটি। চাঁদকে নিয়ে লেখা হয়েছে অগণিত কবিতা, সাহিত্য। বিজ্ঞানীদেরও চাঁদ নিয়ে ভাবনার অন্ত নেই। সৌরজগতে

www.QuranerAlo.net

Contents

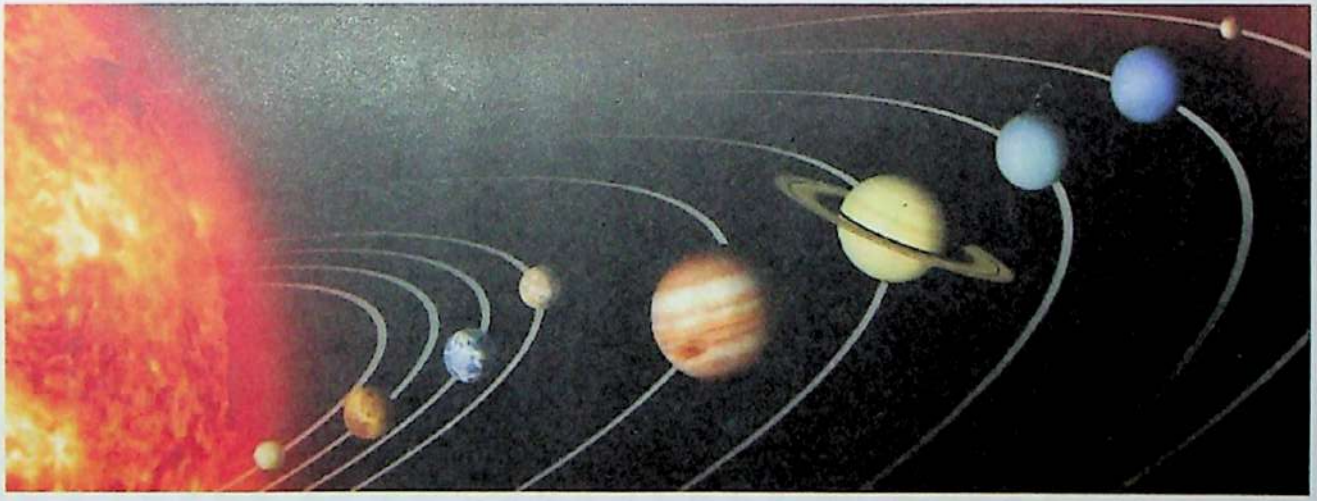

আমাদের সৌরজগতের প্রতীকী ছবি। সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্বটা এমন যথাযথ পরিমাণ যার ফলে এই নীল গ্রহে প্রাণের বিকাশ সম্ভব হয়েছে। এই অবস্থান থেকে সামান্য নিকটে বা দূরে গেলেই গন্ডগোল হয়ে যেত। পৃথিবীর এই অনুকূল অবস্থানকে বলা হয় গোল্ডিলকস জোন। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন, এমন সংকীর্ণ এলাকায় অবস্থান লাভ খুবই দুর্লভ একটি ব্যাপার! পৃথিবীর নিকট প্রতিবেশী চাঁদ প্রাণের বিকাশ ও টিকে থাকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। দূর প্রতিবেশী জুপিটার মহাজাগতিক ঢালের মতো কাজ করে, অসংখ্য ধূমকেতু, উল্কা শুষে নিয়ে পৃথিবীকে রক্ষা করে। আরও অবাক করার মতো ব্যাপার হলো, শুধু পৃথিবীই নয়, বরং সূর্যও আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির অনুকূল এলাকায় অবস্থিত!

ছবি : নাসা

www.QuranerAlo.net

আরও ডজনখানেক চাঁদ থাকা সত্ত্বেও, আমাদের রাতের আকাশে রুপালি-জোছনা-ছড়িয়ে-দেওয়া এমন চাঁদের হদিস মেলা দুষ্কর। দেখা গেছে—পৃথিবীর মতো গ্রহের এমন ঢাউস সাইজের চাঁদ থাকা সম্ভাবনা আসলেই কম। তা ছাড়া এর উপস্থিতিও প্রাণের বিকাশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাণের বিকাশ ও টিকে থাকার জন্য চাঁদের তিনটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হলো—জোয়ার-ভাটা, পৃথিবীর ঘূর্ণনের হার কমিয়ে দেওয়া এবং পৃথিবীকে নিজ অক্ষের ওপর ২৩° কোণে হেলে থাকতে সাহায্য করা। এগুলোর মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, পৃথিবীকে নিজ অক্ষের ওপর ঘূর্ণনের সময় ২৩° কোণে হেলে থাকতে সাহায্য করা। এটা না হলে পৃথিবীর তাপমাত্রা এমন সংকটময় হয়ে পড়ত যে প্রাণের বিকাশ সম্ভব হতো না। চাঁদ পৃথিবী থেকে যে দূরত্বে অবস্থিত তার থেকে নিকটে হলে ভূপৃষ্ঠে ঘর্ষণের কারণে এমন তাপ উৎপন্ন হতো যে, ভূপৃষ্ঠই গলে যেত। আমাদের আরেক প্রতিবেশীও কিন্তু কম যায় না। গ্যাস দৈত্য জুপিটার মহাজাগতিক ঢালের মতো কাজ করে, অসংখ্য ধূমকেতু, উল্কা শুষে নিয়ে পৃথিবীকে রক্ষা করে। (ওয়ার্ড ও ব্রাউনলি, ২০০৩)

আমাদের বায়ুমণ্ডলের কথা একটু ভেবে দেখো। ৬-৭ স্তরের বায়ুমণ্ডলটি স্বচ্ছ হওয়ায় তুমি চাইলেই আকাশ দেখে চোখে নীল মাখতে পারো। নাসার ভাষ্যমতে এই বায়ুমণ্ডল হলো পৃথিবীর জ্যাকেট! ভূপৃষ্ঠের তাপ নিয়ন্ত্রণ, অক্সিজেন সরবরাহ ও ক্ষতিকর বিকিরণ থেকে এটি আমাদের রক্ষা করে। বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তর ক্ষতিকর UV-B এর ৯৭-৯৯% শুষে নেয়। তা না হলে ধরণিতে প্রাণের দেখা মিলত না। (জেনি অ্যালেন, ২০০১) পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রের সাথে হাত মিলিয়ে ক্ষতিকর সৌরবিকিরণ সৌরঝড়, মহাজাগতিক বিকিরণ ইত্যাদি থেকে পৃথিবীকে আগলে রাখে বায়ুমণ্ডলের

ক্ষতিকর মহাজগাতিক বিকিরণের সাথে যুদ্ধ করে পৃথিবীকে আগলে রাখে পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্র। যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে আনন্দে আকাশ রাঙিয়ে তোলে বর্ণিল আলোয়। বিকিরণের সাথে বায়ুমণ্ডলের গ্যাসের সংঘর্ষ হলে শক্তি বিকিরিত হয়, আলোরূপে।
ছবি : ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক

www.QuranerAlo.net

থার্মোস্ফিয়ার স্তর। আকাশের বুকে বর্ণিল আঁকিবুঁকি করে বিজয়ের আনন্দে ভাসে। একে অরোরা বলে।

বায়ুমণ্ডলের গ্যাসমিশ্রণের মাঝে ২১% অক্সিজেন, ৭৮% নাইট্রোজেন, বাকিটুকুতে থাকে নিষ্ক্রিয় গ্যাস (০.৯৩%), কার্বন-ডাই-অক্সাইড (০.০৪%) ও জলীয় বাষ্প ইত্যাদি। বুধ বা মঙ্গলের মতো অত্যন্ত পাতলা বায়ুমণ্ডল হলে প্রাণের অস্তিত্ব সম্ভব হতো না। আবার শুক্রের মতো কার্বন-ডাই-অক্সাইডে ঠাসা, চুল্লীর মতো উত্তপ্ত (৪৬৭°C) ঘন বায়ুমণ্ডল থাকলেও প্রাণের অস্তিত্ব অসম্ভব। (টিম শার্প, ২০১৭)

এতক্ষণ অল্পকিছু নমুনা উপস্থাপন করা হল। বিশদভাবে লেখতে গেলে এ নিয়ে বইয়ের-পর-বই লেখা যাবে! এখন পর্যন্ত প্রায় ১৫০-২০০টি স্থিতিমাপের সন্ধান মিলেছে যেগুলোর নিপুণ কম্বিনেশনে সামান্য হেরফের হলেই মহাবিশ্ব বা প্রাণের অস্তিত্ব সম্ভব হবে না। এমন ফাইন টিউনিং স্রেফ দুর্ঘটনাক্রমে বা কপাল ফেরে হয়ে গেছে এমন ভাবা কি আদৌ যৌক্তিক?

একদমই না। এক হিসেবে জানা যায় এমন অভাবনীয় ফাইন টিউনিং এলোমেলো প্রক্রিয়ায় আপনা-আপনি (by chance) হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা $১/১০^{২২৯}$! (লি স্মোলিন, ১৯৯৭) শুধু পৃথিবীর ফাইন-টিউনিং হিসেব করলে, পৃথিবীর মতো একটি গ্রহ পাওয়ার সম্ভাবনা ৭০০ কুন্টিলিয়নের (700×10^{20}) মাঝে একটি! অর্থাৎ পরিসংখ্যানের হিসেব বিচারে—কপাল-ফেরে পৃথিবীর মতো একটি আবাসযোগ্য গ্রহ পেয়ে যাওয়ার কথা না! (ন্যাথানিয়েল শার্পিং, ২০১৬) পৃথিবী বা মহাবিশ্ব এমন নাও হতে পারত। বুধ বা শুক্রের মতো বিরান গ্রহও হতে পারত। কিন্তু তা হয়নি।

এখন একটা দৃশ্যপট কল্পনা করো। এক লোক তোমাকে এসে বলল—তোমাকে ১০ কোটি টাকা দেওয়া হবে! তবে একটা ছোট্ট পরীক্ষা আছে। সেটা হলো চোখ বেঁধে তোমাকে একটা টেবিলের সামনে বসিয়ে দেওয়া হবে। টেবিলের উপর থাকবে বিভিন্ন দেশের ৫০টি মুদ্রা। না দেখে একটার-পর-একটা মুদ্রা বুড়ো আঙুলের উপরে নিয়ে উড়িয়ে দিতে হবে। যদি <৫টা হেড-১০টা টেইল-৭টা হেড-৮টা টেইল-১৩টা হেড-৭টা টেইল> এই ধারাবাহিকতায় মুদ্রাগুলো কপাল-ফেরে সজ্জিত হয়, তবেই তুমি ১০ কোটি টাকা পাবে! তুমি আদৌ কি দশ কোটি টাকা পাওয়ার আশা করবে? আরে একটা মুদ্রা দশবার টস করে ১ম পাঁচবার হেড ও পরের পাঁচবার টেইল আসবে—এই আশাই তো কেউ করে না! (ব্রায়ান ও ডেবোরাহ চার্লসওর্থ, ২০১৭)

তাই কমন সেন্স দিয়ে বিচার করে হোক বা রাশভারী কেতাবি আলোচনাই হোক, (জেসন ওয়ালার, ২০২০) মহাবিশ্বের এই বিনি সুতোর মালার পিছনে যে এক মহাসত্তার অমোঘ অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী তা এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই।

কিন্তু বিশ শতক থেকে চর্চিত-বিজ্ঞান কি তা স্বীকার করতে পারবে?

www.QuranerAlo.net

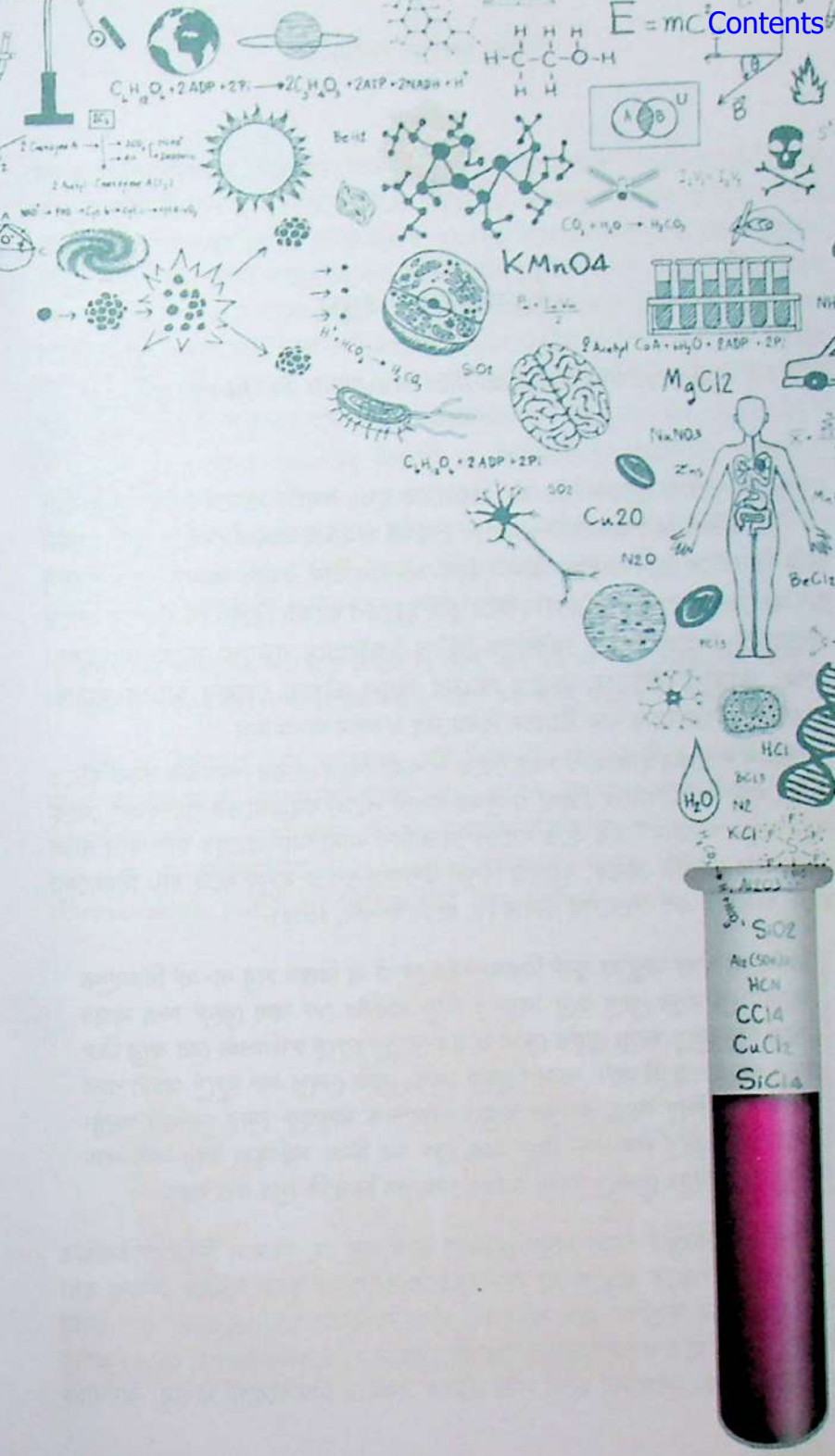

www.QuranerAlo.net

বিজ্ঞানের গান

Science : The Religion That Must Not Be Questioned
~ Henry Gee

আজকের যুগকে বলা হয় বিজ্ঞানের যুগ। কথাটা শুনতেও ভালো লাগে। বিজ্ঞানের অজস্র উপকারীতা চোখের সামনেই আমরা দেখতে পাই। যেমন আমি ল্যাপটপে বসে লিখছি, এসি-থেকে-আসা-বাতাস রুমকে আরামদায়ক শীতল রাখছে। তোমার হাতের মুঠোফোন দিয়ে তুমি মুহূর্তের মাঝেই বিশ্বের যে-কোনো প্রান্তে যোগাযোগ করতে পারছ, ফেইসবুক-টুইটার-ইন্সটাগ্রামে বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ রাখছ। গুগল-ইউটিউবের মাধ্যমে জ্ঞানের বিপুল ভাণ্ডার তোমার হাতের মুঠোয়। আমাদের জীবনযাত্রার মান-উন্নয়নে বিজ্ঞানের অবদান অসামান্য।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে পশ্চিমা-বিশ্বে একের-পর-এক চমক ঘটতে থাকে। পৃথিবীর জীবনকে ভোগ্য ও সুন্দর করার লক্ষ্যে বস্তুজগতের পর্যবেক্ষণ থেকে নতুন-নতুন সরঞ্জাম তৈরি হতে থাকে। বৈজ্ঞানিক নানা আবিষ্কারের হাত ধরে বদল আসে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে। বস্তুগত বিপুল উপকার পেয়ে মানুষ মজে যায় বিজ্ঞানের স্বাদে। জনপ্রিয় এক লেখকের ভাষায় (ড. জাফর ইকবাল, ২০১৫):

> বিজ্ঞানের ওপর মানুষের খুবই বিশ্বাস। আর কেনই বা বিশ্বাস হবে না-এই বিজ্ঞানের জন্যেই তো মানুষ প্লেনে করে আকাশে উড়ে পৃথিবীর এক মাথা থেকে অন্য মাথায় উড়ে চলে যেতে পারে। বুকের ভেতর ব্যথা হলে বুক কেটে হৃৎপিণ্ডটা বের করে ঠিক দিতে পারে। শুধু কী তাই? আকাশ থেকে একটা বোমা ফেলে এক মুহূর্তে একটা শহর ধ্বংস করে দিতে পারে, চোখের পলকে লক্ষ লক্ষ মানুষকে মেরে ফেলতে পারে। আবার যে রোগে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যেত তার টিকা আবিষ্কার করে লক্ষ লক্ষ মানুষকে বাঁচিয়েও ফেলতে পারে। এরকম উদাহরণ দিয়ে কি শেষ করা যাবে?

বিজ্ঞানের বস্তুগত লাভে মানুষ এতটাই মজে যায় যে, বিজ্ঞান নিয়ে অতিরঞ্জিত ধারণা ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। অজান্তেই একে ধর্মের স্থানে বসিয়ে দেওয়া হয়। ফলে সুস্থবিজ্ঞান কলুষিত হয়ে স্ববিরোধী বিজ্ঞানবাদীতায় (Scientism) রূপ নেয়! বিজ্ঞানকে বলা হতে থাকে 'অত্যন্ত পূতপবিত্র মহান'! (ড. জাফর ইকবাল, ২০১৯) প্রচার করা হতে থাকে—বিজ্ঞানই হলো সত্য জানার একমাত্র নির্ভরযোগ্য মাধ্যম। বাদবাকি

www.QuranerAlo.net

সব ছাইপাঁশ! বলা হয়, 'যা জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব, তা কেবল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতেই করতে হবে। বিজ্ঞান যা আবিষ্কার করতে পারবে না, তা মানুষ কখনও জানতে পারবে না।' (বার্ট্রান্ড রাসেলের বক্তব্য; সামির ওকাশা, ২০১৬) বাচ্চাদের শেখানো হয়, 'অনেক বইতে সত্যি কথা লেখা থাকে, আবার অনেক বইতে মিথ্যে কথা লেখা থাকে। যেসব বইতে সত্যি কথা লেখা থাকে সেগুলোর পণ্ডিতি নাম হলো বৈজ্ঞানিক বই।' (দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ২০১৮) বেস্ট সেলার থ্রিলারের ক্যারিশম্যাটিক বিজ্ঞানীকে বলতে শোনা যায়, 'বিজ্ঞান যখন কোনো প্রশ্নের জবাব দেয় সেটা হয় সর্বজনীন। মানুষ সেটা নিয়ে লড়াই করতে শুরু করে না। তারা এটাকে মেনে নেয়।' (ড্যান ব্রাউন, ২০১৮)

আমাদের শেখানো হয়—শুধু বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদরাই পারবেন, 'আমাদের সত্যিকার পৃথিবী উপহার দিতে।' (ড. জাফর ইকবাল, ২০১৯) আরও বলা হয়, এ জগতের বৈজ্ঞানিক অনুধাবনই মানবজাতির ভবিষ্যতের একমাত্র আশা! (ব্রায়ান ও ডেবোরাহ চার্লসওর্থ, ২০১৭) অবস্থা এতটাই চরমে পৌঁছেছে যে একজন বিখ্যাত লেখক তার কোমলমতি পাঠকদের শিখিয়েছেন (ড. জাফর ইকবাল, ২০১৫):

> মানুষ যদি বিজ্ঞানের ক্ষমতাকে বিশ্বাস না করে, যদি ভয় না পায় আবার যদি ভরসা না করে তা হলে কার ওপর বিশ্বাস করবে, কাকে ভয় পাবে, কার ওপর ভরসা করবে?

এই-যে বিজ্ঞানের এত জপমালা, এই বিজ্ঞানটা আসলে কী? অবাক-করার-মতো ব্যাপার হলো, বিজ্ঞানের সংজ্ঞা নিয়ে এখনও ঐকমত্যে আসা সম্ভব হয়নি! (জেমস লেডিম্যান, ২০০২) বিজ্ঞান থেকে জ্ঞানের অন্যান্য শাখা, ছদ্মবিজ্ঞান (Pseudo-science) বা অবিজ্ঞানকে (non-science) আলাদা করার ঠিকঠাক মানদণ্ডও (Demarcation problem) নিশ্চিতভাবে বলা মুশকিল। (সামির ওকাশা, ২০১৬)

"মানুষ যদি বিজ্ঞানের ক্ষমতাকে বিশ্বাস না করে, যদি ভয় না পায় আবার যদি ভরসা না করে তাহলে কার ওপর বিশ্বাস করবে, কাকে ভয় পাবে, কার ওপর ভরসা করবে?"

ছবি: Thinkr

www.QuranerAlo.net

তবে সচরাচর বিজ্ঞান বলতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে (Physical/natural science) বোঝানো হয়। প্রচলিত বইপত্রে আমাদের শেখানো হয়, বিজ্ঞান হলো কেবলই যুক্তি-প্রমাণসিদ্ধ সত্যের ঘনঘটা; অপরদিকে ধর্ম হলো কিছু অপ্রমাণিত বিশ্বাসের ডালা। বিশ্বাসের বালাই বিজ্ঞানের গণ্ডিতে নেই। কিন্তু বাস্তবতা হলো বিজ্ঞানের পরিমণ্ডলে চিন্তাভাবনা শুরু করার আগে কিছু পূর্বধারণা সঠিক বলে ধরে নেওয়া হয় (assumptions of science), যা প্রমাণ করা যায় না। (হিউ গাউচ, ২০০৩) একজন বিজ্ঞানীর স্বীকারোক্তিতে পাওয়া যায় (ক্রিস্টফ কক, ২০০৪):

"ধর্মের ভিত্তি হচ্ছে বিশ্বাস, কাজেই ধর্মগ্রন্থে যা লেখা থাকে সেটাকে কেউ কখনও প্রশ্ন করে না, গভীর বিশ্বাসে গ্রহণ করে নেয়। বিজ্ঞানে বিশ্বাসের কোনো স্থান নেই।"

- জাফর ইকবাল
জনপ্রিয় সাহিত্যিক, পদার্থবিদ

> ... আসলে আমাদের সমস্ত তত্ত্ব ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা কতগুলো দর্শনগত অনুমানের উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়। এই লুকানো সত্যটি অনেক গবেষকের কাছেই চরম লজ্জার ব্যাপার। তাই তারা প্রায়শ এই বিষয়গুলো স্বীকার করতে চান না।

অর্থাৎ প্রমাণ করা সম্ভব না—এমন কিছু পূর্বধারণা বা বিশ্বাস ছাড়া কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব দাঁড় করানো সম্ভব না। (জিম ব্যাগট, ২০১৯) যেমন ধরো, আমাদের ইন্দ্রিয় কাজে লাগিয়ে আমরা কখনোই প্রমাণ করতে পারব না—যে মহাবিশ্বের বাহ্যিক অস্তিত্ব আসলেই আছে! কারণ ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির সাথে কোনো কিছুর বাহ্যিক অস্তিত্বের বা অনস্তিত্বের নিশ্চিত কোনো সম্পর্ক নেই। আইনস্টাইন বুঝতে পেরেছিলেন, 'যে-কারও ব্যক্তিকেন্দ্রিক অনুভূতির বাইরে বহির্জগতের যে আসলেই অস্তিত্ব আছে, এহেন বিশ্বাস সকল প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি।' জগতের যে আসলেই অস্তিত্ব আছে—মানবজ্ঞান বিচারে এমন ধারণা কেবলই বিশ্বাস! (গ্রেন বর্চার্ড, ২০০৪) এমন অনেক অপ্রমাণিত বিষয়ের উপর দাঁড়িয়ে বিজ্ঞান কাজ করে, আজকের বিজ্ঞানের চিন্তাধারা মূলত উনিশ শতকের ভাবতত্ত্বের উপর দাঁড়িয়ে আছে।

যে-সমস্ত পূর্বধারণা নিয়ে বৈজ্ঞানিক কর্মপদ্ধতি চালনা করা হয় সেগুলোর মাঝে অন্যতম প্রধান হলো—প্রকৃতিবাদের (Methodological naturalism) প্রতি দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধতা! এর অর্থ হলো, আমাদের চারপাশে যা কিছু ঘটে সেসব ঘটনাবলির জাগতিক ব্যাখ্যা দেওয়াই যথেষ্ট। বস্তুজগতের বাইরের কিছু বা প্রাকৃতিক নিয়মের বাইরের কিছুকে কোনো প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যাস্বরূপ টেনে আনা যাবে

"দর্শন-মুক্ত বিজ্ঞান বলে কিছু নেই। বরং দেখা যায়, বিজ্ঞানযাত্রার সময় বিজ্ঞানের ভিত্তিমূলে-থাকা দর্শনের লটবহর যাচাই-বাছাই না করেই মেনে নেওয়া হয়।"

- ডেনিয়েল ডেনেট
বিবর্তনবাদী দার্শনিক

www.QuranerAlo.net

না। (পিটার হ্যারিসন, ২০১৯) ইউরোপীয় আলোকায়নের (enlightenment) সময় থেকে এই জগতকেন্দ্রিকতার ধ্যানধারণা প্রসার লাভ করে। ভিক্টোরিয়ান ইউরোপে বিজ্ঞানের বিকাশের সময় জগতকেন্দ্রিক চেতনাকেই বিজ্ঞান বলে অভিহিত করা শুরু হয়। (জোনাথন মার্কস, ২০০৯) ফলে তুমি-আমি মনখোলা রেখে যে সিদ্ধান্তে আসতে পারি, জগতকেন্দ্রিক মানসিকতার কারণে বিজ্ঞান তা পারে না। (আমেরিকান ন্যাশনাল একাডেমি অফ সাইন্স, ১৯৯৮)

"আমরা সবাই কিছু-না-কিছু বিশ্বাস করি। বিজ্ঞান নিজেও কিন্তু একগাদা বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে আছে। শুরুতেই বলা যায়—বিজ্ঞান এই বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে আছে যে, বিশ্বজগতকে আমরা বুঝতে পারি এবং আমাদের উদ্ভাবন-ক্ষমতা ও আরও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির ব্যবহারের দ্বারা আমরা শেষমেশ সব জেনে যাব।"

- মারগারেট ভার্থেইম
লেখিকা, সাইন্স জার্নালিস্ট

> বিজ্ঞান হলো প্রাকৃতিক জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের একটি উপায়। প্রাকৃতিক জগৎ সম্পর্কে জাগতিক ব্যাখ্যা-প্রদানেই এটি সীমাবদ্ধ। অতিপ্রাকৃত কিছু আছে কি না, সে বিষয়ে বিজ্ঞান কিছুই বলতে পারে না। স্রষ্টা আছেন নাকি নেই—এ প্রশ্নের ব্যাপারে বিজ্ঞান নীরব।

যেমন, কসমোলজিক্যাল ফাইন টিউনিং-এর আলোচনায় আমরা দেখেছি, মহাবিশ্বের এই সুনিপুণ সজ্জার সর্বোত্তম ও সঠিক ব্যাখ্যা হলো এক মহাস্রষ্টা—যিনি এই বিনি সুতোর মালা গেঁথেছেন। কিন্তু প্রকৃতিবাদের প্রতি আনুগত্য থাকার কারণে বিজ্ঞান তা স্বীকার করতে পারে না। কারণ স্রষ্টা হলেন বস্তুজগতের বাইরের সত্তা। কিন্তু তাই বলে বিজ্ঞান তো চুপ করে বসেও থাকতে পারে না, তাই না? ধর্মবিদেরা তাদের নিয়ে যদি আবার হাসাহাসি শুরু করে! তাই বিজ্ঞানীরা কল্পনা করলেন, মহাকাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে অসংখ্য অগণিত মহাবিশ্ব রয়েছে, যার মধ্যে আমরা একটিমাত্র। কপাল ভালো থাকায় আমাদের মহাবিশ্বে এমন সুনিপুণ সমন্বয় মিলে গেছে! এই ধারণার একটা গালভরা নামও দিয়ে দিলেন তারা—মাল্টিভার্স! গাদা-গাদা সাইন্স ফিকশন বই, চলচ্চিত্র বানানো হয়েছে মাল্টিভার্সের ধারণা বদ্ধমূল করানোর জন্য। স্ট্রিং থিওরি নামের অযাচাইযোগ্য তত্ত্বের ভিত্তিই এই মাল্টিভার্সের ধারণার উপর দাঁড়ানো। (জন হোরগান, ২০১৭)

"মাল্টিভার্সের ধারণা আমাদের অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে। কিন্তু অন্যান্য মহাবিশ্বগুলো পর্যবেক্ষণ করার কোনো উপায় আমাদের নেই এবং এদের অস্তিত্ব প্রমাণ করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তারপরও, জগতে আমরা যা দেখি তার ব্যাখ্যায় এবং চিন্তাভাবনার জগতে, আমাদের অবশ্যই এমন জিনিসে বিশ্বাস করতে হবে, যা আমরা প্রমাণ করতে পারি না।"

- এনাল লাইটম্যান
পদার্থবিদ

বাচ্চাদের-জন্য-লেখা বিজ্ঞান বইতে বলা হয়েছে, '... আমাদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ড

www.QuranerAlo.net

ছাড়াও অন্যদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আছে [কি]? [হ্যাঁ] ব্যাপারটা আসলে অনেকটা সেরকম।...' (ড. জাফর ইকবাল, ২০১৮) কিন্তু বাস্তবতা হলো, মাল্টিভার্সের পক্ষে কোনো বস্তুগত প্রমাণ নেই! এটি মূলত প্রকৃতিবাদের বিশ্বাসপ্রসূত ধারণা! মাল্টিভার্সের অস্তিত্বে বিশ্বাস চিরকাল প্রমাণহীন বিশ্বাসের মতোই রয়ে যাবে। (জর্জ এলিস এট এল., ২০০৪) এদের সম্পর্কে, 'আমরা কিছু জানি না, কিছু জানতেও পারব না।' (ড. জাফর ইকবাল, ২০১৮) কিন্তু এরপরও মাল্টিভার্সেই অনেক বিজ্ঞানীর আশা-ভরসা। স্রষ্টার অস্তিত্বের বস্তুগত প্রমাণ নেই—এই দাবিতে স্রষ্টাকে মানতে চান না তারা, অথচ মাল্টিভার্সকে ঠিকই বস্তুগত প্রমাণ ছাড়াই মেনে নেন! (লি স্মোলিন, ২০১৫)

> "শিশুর মস্তিষ্কের সাধারণ ও প্রাকৃতিক বিকাশ তাদের ঐশ্বরিক সৃষ্টি ও ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনে বিশ্বাসের দিকে ঠেলে দেয়। অন্যদিকে, বিবর্তন তত্ত্ব মানব মস্তিষ্কের জন্য প্রকৃতিবিরুদ্ধ : যা তাদের জন্য বিশ্বাস করা কষ্টকর।"
>
> – ড. জাস্টিন এল. ব্যারেট
> ডেভলোপমেন্টাল সাইকোলজিস্ট

একই কারণে প্রাণ যে ঐশ্বরিক সৃষ্টি হতে পারে—এটাও বিজ্ঞানীরা স্বীকার করতে পারবেন না। তাই প্রাণের বিকাশ বিবর্তনের ফল এমন বলা ছাড়া তাদের বিকল্প কোনো পথ নেই। কিন্তু চমকপ্রদ ব্যাপার হলো, মনোবিজ্ঞানের গবেষণায় পর্যবেক্ষণ পাওয়া গেছে—স্রষ্টার অস্তিত্বের পূর্বজ্ঞান মানব মনে এতই প্রভাবশালী যে, বিবর্তন তত্ত্ব হজম করা শিশু-পরিণত সবার জন্যই কঠিন। শিশুরা মানুষ ও পশুপাখির উৎপত্তির কারণ হিসেবে বিবর্তন নয়, বরং একচেটিয়াভাবে স্রষ্টা-কর্তৃক সৃষ্ট হওয়াকে প্রাধান্য দেয়। তাদের মনস্তত্ত্বের সহজাত সেটিংস তাদের লক্ষ্যহীন-এলোমেলো বিবর্তনে বিশ্বাস করতে বাধা দেয়। (ইউজিন নাগাসাওয়া, ২০১১)

আরও জানা গেছে, প্রাপ্তবয়স্ক যারা বিবর্তনবাদে বিশ্বাস করে, তারা নিজেরাও আসলে একে বুঝতে পারে না। বাস্তবতা হলো, বিবর্তন তত্ত্ব একটি কাউন্টার-ইনটুইটিভ ধারণা; আমাদের সহজাত চিন্তা প্রক্রিয়ার ছাঁচের সাথে বিবর্তন বেমানান। বিবর্তনভক্ত দার্শনিক-বিজ্ঞানীরাও এই বাস্তবতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। (এলিসন গোপনিক, ২০১৪)

> [বিজ্ঞানীরা] মনোবিজ্ঞানের নতুন গবেষণা থেকে বোঝার চেষ্টা করছেন—বিবর্তন তত্ত্ব কেন হজম করা কঠিন। ... প্রাথমিক স্কুলে ওঠার আগে থেকেই শিশুরা মনে করে, তাদের চারপাশের এই জটিল জগৎ পরমস্রষ্টা-স্বরূপ কোনো ডিজাইনার সৃষ্টি করেছেন। এমনকি যারা নাস্তিক পরিবারে বড়ো হয় তারাও এমনটি ভাবে। ...

কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। বিজ্ঞানকে প্রকৃতিবাদের হাত ধরে পথ পাড়ি দিতে হবে। তাই বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলো যতই কমনসেন্স-বিরোধী হোক না কেন, বিজ্ঞানীরা সেটাই আঁকড়ে ধরবেন। সেটাই প্রচার করবেন। একজন বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানী বেশ খোলাখুলিভাবে বিষয়টি স্বীকার করেছেন। (রিচার্ড লেউনটিন, ১৯৯৭)

www.QuranerAlo.net

> বিজ্ঞান ও অতিপ্রাকৃত কিছুর (যেমন স্রষ্টা) মাঝে আসল দ্বন্দ্বকে যদি বুঝতে চান, তা হলে আমাদেরকে দেখুন। কমনসেন্স-বিরোধী বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা মেনে নিতে আমাদের কতই-না আগ্রহ। ... বিজ্ঞানের পক্ষ নিয়ে 'শিশুতোষ গল্প'-এর মতো অপ্রমাণযোগ্য ধারণা মেনে নিতেও আমাদের আপত্তি নেই। কারণ আমরা আগে থেকেই প্রকৃতিবাদের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ব্যাপারটা এমন নয় যে—এই বিস্ময়কর জগৎ সম্পর্কে একটি জাগতিক ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠানগুলো আমাদের বাধ্য করে। বরং, শুরু থেকেই প্রকৃতিবাদের প্রতি আনুগত্যের কারণে আমরা বাধ্য হই, জগৎ অনুসন্ধানের এমন কিছু উপকরণ ও ধারণা তৈরি করতে—যা কেবল জাগতিক ব্যাখ্যারই জন্ম দেবে। সে ব্যাখ্যা যতই কাণ্ডজ্ঞানহীন হোক, আমজনতার কাছে যতই দুর্বোধ্য ঠেকুক। আসল কথা হলো, আমরা ঈশ্বর নিয়ে কথাবার্তা সহ্য করব না। তাই আমাদের নিকট প্রকৃতিবাদ ছাড়া কোনো বিকল্প নেই।

তাই দেখা যায়, বিজ্ঞানের ময়দানে কেউ চিন্তাকে মুক্ত করতে চাইলে তার উপর দূর্যোগ নেমে আসে! তার গবেষণাপত্র বাতিল করা হয়, উচ্চ-শিক্ষার পথে বাধার সৃষ্টি করা হয়, ক্যারিয়ার হুমকির মুখে পড়ে যায়, অনেককে চাকরিচ্যুতও করা হয়। এমন ঘটনার শত-শত নজির রয়েছে! (ড. জেরি বার্গম্যান, ২০১১) সুতরাং তোমরা বুঝতে পারছ বিজ্ঞান শুধু তথ্য জড়ো করার বিষয় নয়। তার নিজস্ব কিছু বিশ্বাস ও দায়বদ্ধতা আছে। এর বাইরে সে চিন্তা করে না, চিন্তার অনুমতিও দেয় না। আর যারা চিন্তা করতে চায় তাদের অনেক সময়েই খাটো করা হয়, দমিয়ে রাখার চেষ্টা চলে।

আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা হলো, যে সমাজ ও সংস্কৃতির মাঝে বিজ্ঞানীরা কাজ করেন, তা দিয়েও তারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হন। যেমন চার্লস ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বের কথাই ধরো। শিল্পনির্ভর ও প্রতিযোগিতামূলক ভিক্টোরিয়ান ইউরোপের সমাজ থেকেই ডারউইন প্রাকৃতিক নির্বাচনের ধারণা পেয়েছিলেন। (জোনাথন মার্কস, ২০০৯) তা ছাড়া ইতিহাস ঘেঁটে জানা গেছে, প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বের প্রসার যতটা-না বৈজ্ঞানিক কারণে হয়েছিল, তারচেয়েও বেশি হয়েছিল আদর্শিক ও সামাজিক কারণে। তাই বিজ্ঞানের উপর সমাজের প্রভাব অনুসন্ধানে বিবর্তনের মতো বহুল বিতর্কিত একটি তত্ত্বের ফুলে-ফেঁপে ওঠাকে আদর্শ নমুনা হিসেবে বেছে নিয়েছেন ঐতিহাসিকেরা। কিন্তু চিন্তার ব্যাপার হলো, অধিকাংশ বিজ্ঞানীই এসব ব্যাপারে সচেতন না। তারা শুধু বিজ্ঞানের প্রচলিত কর্মধারার মাঝে কাজ করতে জানেন। কিন্তু বিজ্ঞান আসলে কী, এর প্রকৃতি কী—এসব নিয়ে ভাবার জন্য তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় না। (জোনাথন মার্কস, ২০০২)

তোমরা বোধ হয় মন খারাপ করছ! এইসব বিষয় তোমাদের জানানো হয়নি। আমিও জানতাম না। শুধু লোকের কথা শুনে বসে না থেকে নিজে পড়াশোনা করতে গিয়ে পেয়েছি। পাশাপাশি চিকিৎসাবিদ্যায় প্রশিক্ষণও আমাকে বিজ্ঞান নিয়ে অতিরঞ্জন বিষয়ে সচেতন করেছে। আমিও অবাক হয়েছি, যেমন তোমরা হচ্ছ! বিজ্ঞানভক্ত কেউ

www.QuranerAlo.net

কেউ হয়তো আমাকে বিজ্ঞানবিরোধী বা পোস্টমডার্নিস্ট ভেবে বসতে পারে। কিন্তু আসল ব্যাপার হলো, আমি বিজ্ঞানের মানুষ হওয়ায় বিজ্ঞানের নামে অপপ্রচার বা অতিপ্রচার দেখতে ভালো লাগে না।

আমাদের জীবনযাত্রার মান-উন্নয়নে বিজ্ঞানের অবদান অনেক। কিন্তু তাই বলে বিজ্ঞানকে নিজ জায়গা থেকে সরিয়ে নতুন ধর্ম বানানোর অপচেষ্টা কখনোই কাম্য নয়। এই ভ্রান্তির জন্য দায়ী প্রচলিত বিজ্ঞানপ্রচারকগণ ও ভোগবাদী মিডিয়া। বিজ্ঞানীদের আজ অনেকটা পাদ্রিতে পরিণত করা হয়েছে। পাদ্রিদের গায়ে থাকে সাদা আলখাল্লা, বিজ্ঞানীদের গায়ে সাদা ল্যাবকোট! বিজ্ঞান যেন হয়ে পড়েছে এক নতুন ধর্ম। বিজ্ঞানবাদীরা বিজ্ঞানের এই ধারণা বিকোতে চান। কিন্তু বাস্তবতা হলো, বিজ্ঞান জ্ঞান অর্জনের একটি চমৎকার পদ্ধতি; তবে একমাত্র পদ্ধতি নয়। এর নিজস্ব কিছু বিশ্বাস, দর্শন ও পদ্ধতিগত সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সেজন্য সত্যটা জানাতেই বিজ্ঞানের বিশ্বাস নিয়ে অল্পকিছু তোমাদের বললাম। আর সেই বিশ্বাসের প্রভাব তোমরা নিজেরাই দেখলে। এ নিয়ে বেশি বলতে গেলে তোমরা আমার উপর রাগ করে বসতে পারো। তাই অল্পই বললাম আপাতত।

> "একথা আসলেই সত্য যে একসময় যেখানে ধর্মের স্থান ছিল, আজ সেখানে বিজ্ঞান গিয়ে বসেছে... আগে যেসব বিষয়ের উত্তর ধর্ম দিত, এখন বিজ্ঞান দিয়ে সেগুলোর উত্তর দেওয়া হচ্ছে।"
>
> - রিচার্ড ডকিন্স
> বিবর্তনবাদী জীববিদ

এবার চলো বিজ্ঞানের কর্মপদ্ধতি নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক।

www.QuranerAlo.net

ল্যাবরেটরির অন্তঃপুর

Science is not so much about knowledge as doubt

~ Henry Gee

মনে করো, তুমি একটি বিষয় জানতে চাচ্ছ বা কোনো প্রশ্ন তোমার মাথায় এসে কুটকুট করে কামড় দিচ্ছে। সেই প্রশ্নের সমাধা করতে তুমি বস্তুজগৎ থেকে তথ্য-উপাত্ত (Data) সংগ্রহে নেমে পড়লে। বেশ কিছু উপাত্ত পেয়েও গেলে। এরপর কিছু অনুমানের উপর ভিত্তি করে তুমি একটি সাধারণ সিদ্ধান্ত দাঁড় করালে। এই প্রাথমিক সিদ্ধান্তের নাম দেওয়া যাক—অনুকল্প (Hypothesis)। এবার এই অনুকল্পের উপর ভিত্তি করে পূর্বাভাস (Prediction) দিলে যে—কিছু ঘটনা এমন-এমন হবে। তোমার কথা আসলেই মিলে কি না, তা যাচাইয়ের জন্য আবারও নেমে পড়লে বস্তুজগতের উপাত্ত সংগ্রহের মিশনে। অনেকগুলো ডাটা নিয়ে মিলিয়ে দেখার পর যখন দেখলে যে তোমার অনুকল্পের সাথে ডাটাগুলো মিলে গেছে, তখন আদর করে তোমার অনুকল্পকে থিওরি (Theory) নামে ডাকতে পারো। এই যাচাই কাজে অনেকক্ষেত্রেই তোমাকে পরিসংখ্যান-পদ্ধতির সাহায্য নিতে হবে। তোমার অনুকল্পের সাথে উপাত্তগুলো কতটুকু মিলে তা হিসেব করতে হবে। বারবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর অনুকল্পের পরিসংখ্যানগত-তাৎপর্য একটি নির্দিষ্ট মানে আসলে (P Value) সেটাই গৃহীত হবে।

সোজা কথায়, এটা হলো হাল আমলের বিজ্ঞানচিন্তার পথ ও প্রক্রিয়া। একটা সহজ উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার করা যাক। ধরো, তুমি ও তোমার দুই বন্ধুর খুব পছন্দের পাখি হলো প্যাঁক-প্যাঁক হাঁস। (কানে-কানে বলে রাখি, আমারও কিন্তু হাঁস খুব ভালো লাগে। কেমন টলোমলো পায়ে হাঁটে!) তোমরা একদিন ভাবলে—হাঁস নিয়ে একটা বৈজ্ঞানিক গবেষণা করলে কেমন হয়? যেই ভাবা, সেই কাজ। তোমার দুই বন্ধু দেশের দুইদিকে চলে গেল হাঁস নিয়ে ডাটা সংগ্রহ করতে। দুইজনই দেশের কিছু অংশ থেকে হাঁস পর্যবেক্ষণ করে ফিরল। প্রথমজন বলল আমি ৩০০ হাঁস দেখেছি; দ্বিতীয়জন বলল আমি ৫৫০ হাঁস দেখেছি—মোট ৮৫০টি হাঁস তোমার উপাত্ত। যতগুলো হাঁস চোখে পড়েছে সবগুলোই খাকি-রঙা। এই অল্প তথ্য কাজে লাগিয়ে তুমি একটি সাধারণ সিদ্ধান্তে এলে যে, সকল হাঁস খাকি-রঙা হয়। এই-এই জায়গায় খাকি-রঙা হাঁস পাওয়া যাবে—এই পূর্বাভাস বলে দুই বন্ধুকে আবারও পাঠিয়ে দিলে হাঁসের খোঁজে। তারা

www.QuranerAlo.net

গিয়ে দেখল তাই তো! এরাও তো খাকি-রঙা! তুমি খুব খুশি, একটা তত্ত্ব দাঁড় করিয়ে ফেলেছ।

পরের দিন সকালে মায়ের ডাক শুনে রান্নাঘরে গিয়ে শুনলে—এই দেখ, তোর বাবা হাঁস নিয়ে এসেছে, কী চিকচিকে কালো রঙ! আজকে হংসভোজ হবে! অ্যাই, হা করে তাকিয়ে আছিস কেন? বাজার থেকে পেঁয়াজ নিয়ে আয়, যাহ! দাম কমেছে।

কী, হাসি পেলো নাকি? আগেই বললাম না সহজ উদাহরণ দেব। তবে এখন যে-আলোচনা করব তা কিন্তু একটু কঠিন। মন দিয়ে পড়তে হবে।

কিছু বিষয় ভালো করে খেয়াল করো। বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য যে-ডাটা সংগ্রহ করা হয় সেটা প্রায়ই খুব সীমিত পর্যায়ের হয়ে থাকে। কারও পক্ষেই সমগ্র উপাত্ত জোগাড় করা সম্ভব না। কিন্তু একটা কথা আছে না—মানুষ তার স্বপ্নের সমান বড়ো! মানুষ স্বপ্ন দেখে সব ডাটা সংগ্রহ করে ফলাফল জানাবে। তবে বাস্তবে সেটা পারা যায় না। তাই, দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর চেষ্টা চলে আরকি। অল্প ডাটা নিয়েই এমনভাবে একটা সাধারণ সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়—যেন মনে হয় আমরা সব ডাটা পেয়ে গেছি। এই চিন্তা-প্রক্রিয়াকে বলা হয় ইনডাকশন। ইনডাকশন ব্যাপারটা যদি বোঝে থাকো, তা হলে আশা করি তোমরা এর সীমাবদ্ধতাটাও ধরে ফেলেছ। যেহেতু সীমিত তথ্য-উপাত্ত দিয়ে বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলো দাঁড় করানো হয়, তাই ভবিষ্যতে এমন উপাত্ত এসে টক্কর দিতে পারে যার খোঁজ আগে মেলেনি। ফলে নতুন উপাত্ত তোমার আগের সিদ্ধান্তকে ভুল প্রমাণ করে দিতে পারে। এই সমস্যাটাকে বলা যেতে পারে ইনডাকশনের ঝঞ্ঝাট (Problem of Induction)। স্টিফেন হকিং এই বাস্তবতা অনুধাবন করে বলেছিলেন (স্টিফেন হকিং, ১৯৯৮):

> বিজ্ঞানের যে-কোনো ভৌতত্ত্ব সব সময়ই সাময়িক। এক অর্থে—একটি অনুকল্প মাত্র। আপনি কখনোই একে প্রমাণ করতে পারবেন না। পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল যতবারই কোনো তত্ত্বের পক্ষে যাক-না কেন, পরের বার ফল যে বিরুদ্ধে যাবে না—এর কোনো নিশ্চয়তা নেই। অপর দিকে, তত্ত্বের পূর্বাভাস-বিরোধী একটিমাত্র পর্যবেক্ষণও তত্ত্বটিকে ভুল প্রমাণ করতে পারে। ... নতুন পর্যবেক্ষণ তত্ত্বের বিপরীতে গেলে তত্ত্বটিকে হয় বাদ দিতে হবে অথবা বদলে দিতে হবে।

তবে বিজ্ঞানীরা এত সহজে একটা তত্ত্বের বা ধারণার বদল (Paradigm shift) মেনে নিতে পারেন না। প্রচলিত তত্ত্বের সাথে অনেকের ক্যারিয়ার, মান-সম্মান জড়িয়ে থাকে। তাদের চেষ্টা থাকে—প্রচলিত তত্ত্বের মধ্যেই নতুন-নতুন পর্যবেক্ষণ সেঁটে দেওয়ার। কোনো নবপর্যবেক্ষণ যদি প্রচলিত তত্ত্বের বিপরীতেও যায়, তাও চেষ্টা করা হয় কোনোভাবে ব্যাখ্যা করে টেনেটুনে তাকে তত্ত্বের মধ্যে আনা যায় কি না। এটা করতে না পারলে অনেক সময় দেখা যায় নবপর্যবেক্ষণকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়! এই মানসিকতার বাংলা করেছি তত্ত্ব-দূষণ (Theory Ladenness)।

www.QuranerAlo.net

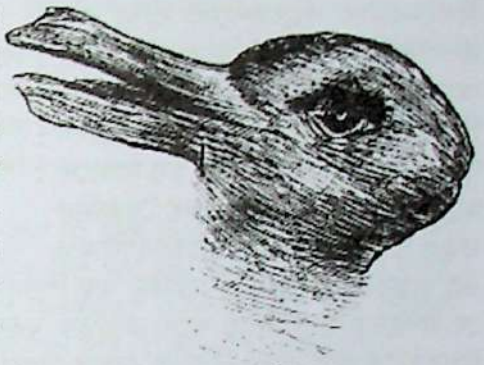

মনোবিজ্ঞানের বহুল পরিচিত ছবি জেস্টাল্ট সুইচ। ছবি দেখে বলতো - এখানে হাঁস আকা, নাকি খরগোশ আঁকা? ছবিতে থাকা কালির আঁচড় দেখে একেকজন একেক সিদ্ধান্ত আসবে। তেমনিভাবে একই উপাত্তকে ভিন্নচোখে দেখে ভিন্নভিন্ন তত্ত্ব দাঁড় করানো যায়।

ছবি: দ্য ইনডিপেন্ডেন্ট

আরেকটা ব্যাপার হলো, একই ডাটাকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করে বিকল্প তত্ত্ব দাঁড় করানো যায়। এই সমস্যাটাকে বলা যেতে পারে বিকল্প-তত্ত্ব-সমস্যা (Problem of underdetermination of theory by evidence)। ফলে অমুক-অমুক উপাত্ত দ্বারা একটি তত্ত্ব নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত—এটা বলার কোনো সুযোগ বিজ্ঞানের ময়দানে নেই। (জেমস লেডিম্যান, ২০০২) সুতরাং তোমরা বুঝতে পারছ, ইনডাকশনের ঝঞ্ঝাট, বিকল্প-তত্ত্ব-সমস্যা ইত্যাদি কারণে বিজ্ঞানের সকল তত্ত্ব সাময়িক ও বদলপ্রবণ। অধিকাংশ মানুষ যে ভুলটা করে বসে তা হলো পর্যবেক্ষণ বা তথ্য-উপাত্তকেই বিজ্ঞান মনে করে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত (তত্ত্ব/ফ্যাক্ট) দিতে পর্যবেক্ষণ দরকার হয়; একই সাথে লাগে আরও কিছু পূর্বধারণা, বিশ্বাস, পদ্ধতি ইত্যাদি। সময়ের সাথে নতুন-নতুন পর্যবেক্ষণ আসে, আর বিজ্ঞান তার নিজস্ব চিন্তাধারা দিয়ে সেই পর্যবেক্ষণকে সাজায়। তা ছাড়া আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো—পরিসংখ্যান-পদ্ধতি ব্যবহারের কারণে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগুলোর ফলাফল সম্ভাবনার সূচকে আসে। অর্থাৎ ফলাফল সরাসরি 'হ্যাঁ' বা 'না' হিসেবে আসবে না। যদি আকস্মিকভাবে কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়ার সম্ভাবনা ২০বারের মাঝে ১বার হয় (P Value < 0.05) তা হলে একে পরিসংখ্যানের নিরিখে তাৎপর্যময় ধরা হয়। এর মানে এই না যে, এটি সঠিক। (হেনরি গী, ২০১৩)

এই ব্যাপারগুলো মাথায় রেখে বিবর্তন তত্ত্বকে যাচাই করা যাক। সাম্প্রতিক গবেষণা মতে, পৃথিবীতে অন্তত ১ লক্ষ কোটি মাইক্রোবিয়াল প্রজাতি থাকতে পারে; যার ৯৯.৯৯৯ শতাংশই এখনও অজানা। (কেনেথ লোসে ও জেই টেনন, ২০১৬) এর আগের এক গবেষণায় অনুমান করা হয়েছে যে, পৃথিবীতে সুকেন্দ্রিক প্রজাতির সংখ্যা প্রায় ৮৭ লক্ষের মতো; যার ৮০ শতাংশই অজানা। (লি সুইটলাভ, ২০১১) সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে বিবর্তন তত্ত্ব কতটা অল্প-উপাত্তের-উপর-দাঁড়ানো! ১ম গবেষণা আমলে নিলে প্রাণের মাত্র ০.০০১%, ২য় গবেষণা আমলে নিলে সুকেন্দ্রিক প্রাণের মাত্র ২০%—এর কিছু অংশকে উপাত্ত হিসেবে নিয়ে এই তত্ত্ব সাজানো হয়েছে।

কালের আবর্তে অনেক নবপর্যবেক্ষণ এসে বিবর্তনের প্রচলিত ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করেছে। কিন্তু সেই পর্যবেক্ষণের তোড়ে বিবর্তন তত্ত্বকে বদলানো যায়নি, বরং

www.QuranerAlo.net

বিবর্তনবাদীরা পর্যবেক্ষণকেই ব্যাখ্যা করে বা বাতিল করে তত্ত্ব বাঁচানোর চেষ্টা চালিয়ে আসছে। অনেক বিজ্ঞানী এই গোঁড়ামিতে না গিয়ে বিকল্প তত্ত্ব সাজিয়েছেন। কারণ, যেসব উপাত্ত দিয়ে প্রচলিত বিবর্তন তত্ত্ব সাজানো হয়েছে, একই তত্ত্ব দিয়ে বিকল্প বৈজ্ঞানিক তত্ত্বও দাঁড় করানো যায়। ডারউইন নিজেও এই বাস্তবতা বুঝেছিলেন। অরিজিন অফ স্পিসিস বইয়ের ভূমিকায় বলেছিলেন, তিনি যে-উপাত্তের উপর ভিত্তি করে জাগতিক মতবাদ দিয়েছেন, সেই একই উপাত্তের উপর ভিত্তি করে সম্পূর্ণ বিপরীত মতবাদ দেওয়া সম্ভব। (ডারউইন, ১৯০৯) ফলে দেখা যায়, ওয়ালেস প্রায় একইরকম প্রমাণের উপর ভিত্তি করেও প্রকৃতিবাদী ব্যাখ্যা বেছে নেননি। তিনি মনে করতেন কোনো বুদ্ধিমত্তা বিবর্তনকে নিয়ন্ত্রণ করছে। তা ছাড়া, সে সময়ের অধিকাংশ বিজ্ঞানী ডারউইনের মত আমলে না নিয়ে অন্যান্য বৈজ্ঞানিক মতকে প্রাধান্য দিতেন। (নিকোলাস রাসমুজেন, ১৯৯৩) সুতরাং ইনডাকশনের ঝঞ্ঝাট, বিকল্প-তত্ত্ব-সমস্যা ইত্যাদির ফলে এটাও অবশ্যম্ভাবী যে ভবিষ্যৎ প্রমাণের আলোকে বিবর্তন তত্ত্ব বাতিল হবে বা বদলে যাবে। (রিচার্ড ডকিন্স, ২০০৪)

> "বিজ্ঞান সময়ের সাথে বদলে যায়। তাই যারা কথায় কথায় 'বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দাও' বলে, তাদের এহেন মানসিকতা খুবই ক্ষতিকর। কারণ এরা ভাবে বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত বোধহয় ছড়ান্ত।"
>
> – গিলিয়ান বার্কার ও ফিলিপ কিচার
> বিজ্ঞান দার্শনিক

> ডারউইন হয়তো বিশ শতকের শেষভাগে সফলতা পেয়েছিলেন। তবে ভবিষ্যতে নতুন উপাত্তের কারণে, আমাদের উত্তরসূরিরা ডারউইনের তত্ত্ব বাদ দিতে বা পুরোপুরি বদলে দিতে বাধ্য হতে পারে। এই সম্ভাবনা আমাদের স্বীকার করতেই হবে।

হাল আমলে অবস্থা তাই দাঁড়িয়েছে। বহুল প্রচলিত নব্য-ডারউইনবাদ ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় বিভিন্ন বিবর্তনবাদী গবেষক ৫-৬টি ভিন্নভিন্ন তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছেন! (ফিলেপ্পি হিউনম্যান ও ডেনিস ওয়ালস, ২০১৭)

বিজ্ঞানে এমনই হয়।

সুতরাং কেউ যদি তোমাকে বলে—ফসিল, ডিএনএ, বংশগতির জিনগত সঞ্চার ইত্যাদি বিবর্তন তত্ত্বকে নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত করে; তা হলে এমন দাবি বিজ্ঞান-দর্শনের দৃষ্টিতে, 'ডাহা মিথ্যে। কারণ, এইসব উপাত্ত [বিবর্তন] তত্ত্বের পক্ষে জোরালো দলিল হিসেবে টেনে আনা যেতে পারে ঠিকই; তবে এগুলোর দ্বারা তত্ত্বটি প্রমাণিত হয়ে গেছে এমন বলা যায় না। আসল কথা হলো, বিজ্ঞানের গণ্ডিতে কোনো কিছুকেই প্রমাণিত বলার সুযোগ নেই।' (ইথান শিজেল, ২০১৭)

এতসব পড়ে তোমার হয়তো খটকা লাগতে পারে। মনে প্রশ্ন আসতে পারে—থিওরি তো কাজ করে। এই থিওরি কাজে খাটিয়ে আমরা প্রযুক্তিও বানাতে পারি। এই বাস্তবতাই কি থিওরি প্রমাণিত বা সত্য হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়? উত্তর হচ্ছে—না! বিজ্ঞানের ইতিহাস ঘেঁটে দেখলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এমন অনেক তত্ত্ব খুঁজে

www.QuranerAlo.net

পাওয়া যায় যেগুলো তৎকালীন সময়ে প্রায়োগিক দিক দিয়ে সফল ছিল, কিন্তু কালের আবর্তে ভুল প্রমাণিত হয়েছে। মজার ব্যাপার হলো, মাঝে-মাঝে এমনও দেখা যায় যে, সঠিক তত্ত্বের চেয়ে ভুলতত্ত্বের ভবিষ্যদ্‌বাণীই অধিক যথার্থ হয়! (এলিয়ট সোবার, ২০০৮) তাই কোনো তত্ত্ব প্রায়োগিক দিক দিয়ে সফল হলেও এটিই যে সঠিক, তা ভাবারও কোনো অবকাশ নেই। (সামির ওকাশা, ২০১৬)

> ইতিহাস ঘাঁটলে এমন অনেক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব খুঁজে পাওয়া যায়—যেগুলো তৎকালীন সময়ে প্রায়োগিক দিক দিয়ে সফল ছিল, কিন্তু পরে ভুল প্রমাণিত হয়। আশির দশকে প্রকাশিত এক সুপরিচিত আর্টিকেলে, আমেরিকার বিজ্ঞান-দার্শনিক লেরি লোডেন এমন চল্লিশটিরও বেশি তত্ত্বের তালিকা পেশ করে এই ব্যাপারটা দেখিয়েছেন।

জীবন ও জগৎ সম্পর্কে এমন কিছু মেটাফিজিক্যাল ধারণা নিয়ে বিজ্ঞান যাত্রা শুরু করে সেগুলোর কোনোটাই বিজ্ঞান প্রমাণ করতে পারে না। অর্থাৎ এই ধারণা বা বিশ্বাসগুলো বিজ্ঞানপ্রসূত নয়। (পিটার ক্রুয়ান, ২০১৬) তাই যারা বলে বিজ্ঞান সত্য জানার একমাত্র নির্ভরযোগ্য মাধ্যম, তারা তো নিজের পায়েই কুড়াল মারছে! কারণ, তাদের দাবি সত্য হলে বিজ্ঞান নিজেই মিথ্যে ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে! তা ছাড়া, বিজ্ঞান তার কার্যাবলি পরিচালনার জন্য যুক্তি ও গণিত ব্যবহার করে—যা সে নিজেই বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করতে পারে না, কেবল অনুমান করে নেয়। নৈতিকতার কোনো প্রশ্নে বিজ্ঞান নীরব। ভিঞ্চি ছবি আঁকলে মোনালিসা হয়, আর আমি ছবি আঁকলে একটা টিকটিকিও হয় না কেন—তাও বিজ্ঞান বলতে পারে না। অর্থাৎ সৌন্দর্যবোধ-সংক্রান্ত ব্যাপারেও বিজ্ঞান চুপটি মেরে বসে থাকে। বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতিতে-প্রাপ্ত জ্ঞান কীভাবে ব্যবহার করব তাও বিজ্ঞান বলতে পারে না। (আন্ডারস্ট্যান্ডিং সাইন্স, বার্ক্লে) ইনডাকশনের ঝঞ্ঝাট , বিকল্প-তত্ত্ব-সমস্যা, পরিসংখ্যান নির্ভরতা ইত্যাদি নানা কারণে বিজ্ঞান আজ যা বলে, কাল তা বদলে যায়।

> "... বৈজ্ঞানিক সত্য কখনোই ছড়ান্ত নয়। আজ যা সাইন্টিফিক ফ্যাক্ট হিসেবে বিবেচিত, কাল তা পরিবর্তিত এমনকি বাতিল ঘোষিত হতে পারে।"
>
> - NCSE
> বিবর্তনবাদী লবিং গ্রুপ

তাই যারা—বিজ্ঞান সত্য জানার একমাত্র মাধ্যম—বলে প্রচার করতে চায়, তারা বিজ্ঞানের বন্ধু নয়; বরং বিজ্ঞানের ক্ষতি করছে। দুঃখজনক হলেও সত্য, দেশ-বিদেশের বিজ্ঞান-প্রচারকদের অধিকাংশই বিজ্ঞানের নাম করে বিজ্ঞানবাদীতার ব্যাধি ছড়াতে ব্যস্ত। (মাসিমো পিগলিউশি, ২০১৮) মানুষ স্বভাবতই নিশ্চয়তা চায়, সন্দেহের দোলাচলে থাকতে চায় না। মানুষের এই সহজাত বাসনাকে প্রতারিত করা হচ্ছে বিজ্ঞানবাদীতা দিয়ে। স্ব-বিরোধীতা ও অপযুক্তিপ্রসূত এই বিজ্ঞানবাদীতার খপ্পরে পড়ে আমাদের বিজ্ঞানচিন্তা ও বিজ্ঞানযাত্রা হয়ে পড়ছে কলুষিত! (গ্রেগরি পিটারসন, ২০০৩) বিজ্ঞান নিয়ে অতিরঞ্জিত ধারণা প্রসারের ফলে বিজ্ঞানের উপর মানুষের প্রত্যাশা বেড়ে গেছে।

www.QuranerAlo.net

যেহেতু বিজ্ঞানীরাও আমাদের মতোই মানুষ, তাই এই প্রত্যাশার চাপে পড়ে তাদের পদস্খলন হচ্ছে ক্রমাগত। (জন আইয়োনাইডিস, ২০১১) কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক।

যে-কোনো গবেষণা শেষ হলে গবেষণাপত্রটি ছাপানোর জন্য জার্নালে পাঠাতে হয়। জার্নাল কর্তৃপক্ষ তারপর যাচাই-বাছাইয়ের জন্য অন্য গবেষকের নিকট পাঠান। এই প্রক্রিয়াকে পিয়ার রিভিউ বলে। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা গবেষণার অনুদান মেলে, গবেষণাপত্র ছাপা হয়, ক্যারিয়ারে উন্নতি হয়; কপাল ভালো থাকলে নোবেল পুরস্কারও জুটতে পারে। আমি একসময় মনে করতাম পিয়ার রিভিউ একটি নির্মোহ, নির্ভরযোগ্য ও বস্তুনিষ্ঠ প্রক্রিয়া। কিন্তু বাস্তবতা জানতে পেরে হতবাক হয়ে গেছি। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে বড়ো রকমের ভুল রিভিউয়ারদের চোখ এড়িয়ে যায়। (রিচার্ড স্মিথ, ২০০৬)

> "পিয়ার রিভিউ একটি ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতিতে পরিণত হয়েছে। রিভিউ করার পরও, সহজেই চোখে পড়ে—এমন ভুল দিয়ে পেপারগুলো ভর্তি থাকছে। রিভিউয়ের কার্যকারিতার পক্ষে প্রামাণিক সমর্থনও অল্প আসছে... এরপরও পিয়ার রিভিউয়ের উপর বিজ্ঞানী ও জার্নাল সম্পাদকদের বিশ্বাসে কমতি আসে না। এমন বিশ্বাসের উপর বিজ্ঞান দাঁড়িয়ে আছে ভাবলেই তো অবাক লাগে।"
>
> – রিচার্ড স্মিথ
> ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নালের সাবেক এডিটর

কিছুদিন আগে নোবেলজয়ী এক বিজ্ঞানীর পেপার বিখ্যাত *Science* জার্নাল প্রকাশ করে। পরে জানা যায় গবেষণা ভুল ছিল! নোবেলজয়ী টুইটার বার্তায় জানান, উনি নাকি 'ব্যস্ত ছিলেন, তাই হিসেব-নিকেশ ঠিকমতো' করেননি! তড়িঘড়ি করে জার্নাল কর্তৃপক্ষ গবেষণাপত্র প্রত্যাহার করে। এমন বিখ্যাত জার্নালও যদি পিয়ার রিভিউতে গাফিলতি করে তা হলে আর কী-ই বলার থাকে! (বিবিসি, ২০২০) গবেষণার জালিয়াতি ধরতেও রিভিউ প্রক্রিয়া কার্যকর হচ্ছে না। তা ছাড়া এই মন্থর গতির, ব্যয়বহুল ও সাবজেক্টিভ রিভিউ প্রক্রিয়া পক্ষপাত (Bias) ও অপব্যবহারের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে গেছে। (রিচার্ড স্মিথ, ২০০৬) প্রবীণ ও ক্ষমতাশীল বিজ্ঞানীরা তরুণদের উপর প্রভাব খাটাতে রিভিউয়ের ক্ষমতাকে অন্যায়ভাবে ব্যবহার করতে পারে। ফলে এমন আচরণ বিজ্ঞানের ময়দানে নতুন ধারণা আসার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। (লী স্মোলিন, ২০০৭)

তা ছাড়া, হাল আমলের বৈজ্ঞানিক গবেষণা আর সত্য খোঁজার মানসে করা হচ্ছে না। বরং ক্যারিয়ার, পদের লোভ, অনুদান জোগাড়, পাবলিকেশন, নাম-যশ, অর্থলাভ—ইত্যাদি নানা ঘুণপোকা ঢুকে হাল আমলের বিজ্ঞান নাজেহাল হয়ে পড়েছে। (জন হোরগান, ২০১৯) প্রতারণা, রচনাচুরি (Plagiarism), ভুল হিসেব

> "প্রকাশিত কোনো গবেষণাপত্রে ভুল হলেও জার্নাল কর্তৃপক্ষ তা খতিয়ে দেখা পছন্দ করে না। তারা অজুহাত দেখায়—এটি শ্রমসাধ্য ও কঠিন কাজ; যা করতে অনেক সময় চলে যায়।"
>
> – অ্যান্ড্রু গ্রে
> ইউনিভার্সিটি অফ অকল্যান্ড

www.QuranerAlo.net

Contents

ইত্যাদি কারণে আগের তুলনায় অনেক বেশি প্রকাশিত গবেষণাপত্র প্রত্যাহার করা লাগছে। দুশ্চিন্তার ব্যাপার হলো, অনেক সময় ভুল জানার পরও গবেষণাপত্র সরানো হয় না, ভুল স্বীকার করার সৎসাহসের অভাবে। (এম. ক্যাসটিলো, ২০১৪)

পাশাপাশি গবেষণার অনুদান নিয়েও বহুবিধ সমস্যা প্রকট। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, অনুদান প্রদানকারী ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মর্জি অনুযায়ী বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফল প্রকাশ করা হচ্ছে! যেমন, মদ উৎপাদনকারী কোম্পানি থেকে অনুদান খেয়ে এক গবেষণাতে শুধু মদের গুণগানই বর্ণনা করা হয়েছে। একইভাবে টোব্যাকো, ফার্মাসিউটিক্যাল, কেমিক্যাল, পেস্টিসাইড ইত্যাদি কোম্পানিও এমন প্রভাব খাটাচ্ছে। (পল থ্যাকার, ২০১৮) বিখ্যাত কোকা-কোলা কোম্পানিও পিছিয়ে নেই—মিলিয়ন মিলিয়ন পাউন্ড ঢেলে তারা বিজ্ঞানী ভাড়া করেছে যাতে মিষ্টি পানীয়, সোডা ইত্যাদি পানের সাথে স্থূলতার (Obesity) সম্পর্ক ঢেকে দেওয়া যায়। এইসব বিজ্ঞানীদের কাজ হলো মানুষকে বোঝানো—আরে ধুর! কোক খেলে সমস্যা নেই; আসল সমস্যা হলো ব্যায়াম-টেয়াম না করা! (কিম কিয়াং হুন, ২০১৫)

সাম্প্রতিক সময়ে আরও একটি দুঃখজনক বাস্তবতা উঠে এসেছে। গবেষণার অনুদান প্রদানে বর্ণবাদী আচরণ করা হচ্ছে। যুক্তরাজ্যে সাদা চামড়াওয়ালাদের চেয়ে সংখ্যালঘুরা কম অনুদান পাচ্ছে। (ফিবি ওয়েস্টন, ২০১৯) তুমি হয়তো ভাবছ বৈজ্ঞানিক-মহলে বর্ণবাদের মতো অবৈজ্ঞানিক চেতনা এখন আর থাকার কথা না।

ভুল ভাবছ!

পশ্চিমের অনেক বিজ্ঞানী গোপনে-গোপনে এখনও বর্ণবাদে (Racism) বিশ্বাস করে! ডিএনএ-র ডাবল হেলিক্স মডেলের সহপ্রণেতা বিজ্ঞানী জেমস ওয়াটসন নিজেই বর্ণবাদী; তার মতে সাদাদের চেয়ে কালোরা কম বুদ্ধিমান! চার্লস ডারউইনও বর্ণবাদী মানসিকতা থেকে বের হতে পারেননি। ইউরোপের আলোকায়নের-সময়-জন্ম-নেওয়া এই অসুস্থ আদর্শ পশ্চিমের আকাশে-বাতাসে এখনও গরমশ্বাস ফেলে ভেসে বেড়ায়। (জন হোরগান, ২০১৯) জনজীবন থেকে নিয়ে একাডেমিয়া—সব জায়গাতেই এর বিষাক্ত ছোবলের ছাপ স্পষ্ট! (এঞ্জেলা শাইনি, ২০১৯)

এতক্ষণের অল্প আলোচনায় আমি তোমাদের দেখাতে চেয়েছি বিজ্ঞানের আসল রূপের কিছু অংশ। বিজ্ঞান নিয়ে খোলামনে পড়াশোনা করলে এগুলো সহজেই চোখে পড়ে। বিজ্ঞান নিয়ে ফ্যান্টাসিতে ভুগলে এগুলো কেউ জানার চেষ্টাও করবে না, জানাতে গেলে শুনবেও না। আমি চাই না তুমি তাদের ভুল পথে পা পাড়াও।

আমরা সবাই মিলে সচেতন হয়ে আওয়াজ তুললে, বিজ্ঞানকে আরও সামনে এগিয়ে নিতে পারব। এর ভেতরে জায়গা করে নেওয়া ঘুণপোকাগুলোকে সরিয়ে দিতে পারব। এর জন্য, বিজ্ঞান নিয়ে যে আমাদের মাঝে যে ফ্যান্টাসি প্রচলিত তা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। সবকিছুকেই বিজ্ঞান দিয়ে বিচার করার ভুল মানসিকতা পরিহার করতে হবে। কেউ কেউ ধর্মগ্রন্থকেও বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত দিয়ে যাচাই করতে যায়—এই

www.QuranerAlo.net

কাজ পরিহার করতে হবে। পর্যবেক্ষণের সাথে তত্ত্বকে গুলিয়ে ফেলা যাবে না।

বিজ্ঞানকে ধর্ম নয়, বরং মানবকল্যাণে কাজে লাগানোর সীমিত উপকরণ হিসেবে দেখতে হবে। অধিকাংশ বিজ্ঞানীই মনে করেন না যে ধর্ম ও বিজ্ঞান সংঘাতে লিপ্ত। (ইলেইন একল্যান্ড এট এল., ২০১৬) ধর্ম ও বিজ্ঞানের মাঝে যুদ্ধ তারাই বাধাতে চায় যারা বিজ্ঞানকে নবধর্মে পরিণত করেছে। তাদের ছলচাতুরীর জালে আটকা পড়া যাবে না; বরং যুক্তির জাল তাদের দিকেই ছুড়ে দিতে হবে। আমাদের ভালোমতো বুঝতে হবে যে—বিজ্ঞানের ময়দানে সত্য বা নিশ্চয়তার কারবার নেই। *'বিজ্ঞান কেবল সম্ভাবনার বিচারে কথা বলে, সত্য নির্ধারণ তার পক্ষে সম্ভব না।'* (হেনরি গী, ২০১৩) *'বিজ্ঞানীরা যতই জানতে সক্ষম হোক না কেন, তা কেবলই সীমিত। জীববিজ্ঞানীরা কখনোই জানতে পারবে না কীভাবে জড় পদার্থ থেকে প্রথম প্রাণ এল। একইভাবে মহাকাশবিদেরাও কখনোই জানতে পারবে না কীভাবে এই বিশ্বজগতের সূচনা হলো। আমরা কে—এই প্রশ্নের চূড়ান্ত সমাধান বিজ্ঞান কখনোই আমাদের দিতে পারবে না।'* (জন হোরগান. ২০১৯)

বিজ্ঞান নিয়ে অনেক উচ্চধারণা ছড়ানোর পরও এক জনপ্রিয় লেখক বুঝতে পেরেছেন (ড. জাফর ইকবাল, ২০১৯):

> ... আমরা কিন্তু সব সময়েই সবাইকে সৎভাবে বেঁচে থাকার একটি "অবৈজ্ঞানিক" উপদেশ দিই এবং নিজেরাও অবৈজ্ঞানিকভাবে সৎ থাকার চেষ্টা করি। পৃথিবীতে বিজ্ঞান একমাত্র জ্ঞান নয়, যুক্তিতর্ক, পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রমাণ করা যায় না এ-রকম অনেক বিষয় আছে, আমরা কিন্তু সেগুলোর চর্চাও করি। বিজ্ঞানের পাশাপাশি শিল্প-সাহিত্য-দর্শন এ-রকম অনেক বিষয় আছে এবং সব মিলিয়েই সৃষ্টি হয়েছে পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডার এবং পৃথিবীর সভ্যতা। কাজেই সবকিছুকে বিজ্ঞানের ভাষায় ব্যাখ্যা করতে হবে সেটিও সত্যি নয়।

জ্ঞানের যাত্রায় আমার অনুভব হলো, নিশ্চিত সত্য জানতে প্রকৃত ওহির শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া উপায় নেই। এই গল্প আজকে না, আরেকদিনের জন্য তোলা থাক। (হামযা আন্দ্রেস জর্জিস, ২০১৯)

এতক্ষণের আলোচনায় আমরা বিজ্ঞানের প্রকৃতি বুঝলাম, জানলাম মহাকাশ নিয়ে তার বক্তব্যের নানারূপ, নানা সীমাবদ্ধতা। স্যাপিয়েনস যে-মহাবিশ্বে থাকে তা নিয়ে হালকা আলাপচারিতা তো হলো। এবার স্যাপিয়েনসকে নিয়ে আলাপে শুরু হোক!

www.QuranerAlo.net

www.QuranerAlo.net

বিবর্তনের ইতিবৃত্ত

Ideas shape the course of history
~ J. M. Keynes

সময়টা তখন ভিক্টোরিয়ান ইউরোপ। শিল্পবিপ্লবের প্রস্ফুটনকাল। ইউরোপীয় আলোকায়নের প্রভাবে মানুষের মেজাজ জগতমুখী। ফ্রান্স-থেকে-ধেয়ে-আসা আলোকায়নের হাওয়ায় ইংল্যান্ডের প্রকৃতি আলোড়িত। চার্চ থেকে রাষ্ট্রকে আলাদা করার আমেজ আকাশে-বাতাসে। বাইবেলের ব্যাখ্যা থেকে বেরিয়ে, জ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে বস্তুগত ব্যাখ্যা প্রসারের চেষ্টা চলে আসছিল বেশ আগে থেকেই। উনবিংশ শতকের একদম শুরুতে ফরাসি প্রকৃতিবিদ ল্যামার্ক প্রাণের বিকাশের ব্যাখ্যায় একটি জাগতিক ব্যাখ্যা পেশ করেন। এই পালে হাওয়া লাগিয়ে, ভূতত্ত্ববিদ চার্লস লায়েল কিছু ধারণা পেশ করে আলোচনায় উঠে এলেন। তিনি বাইবেলে বর্ণিত নূহ ﷺ-এর মহাপ্লাবন-জাতীয় ব্যাখ্যাকে তেমন একটা আমলে না নিয়ে সমুদ্রতরঙ্গ, ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির সক্রিয়তা ইত্যাদি প্রাকৃতিক ঘটনাবলিকে বেশি গুরুত্ব দিলেন। তিনি মত

ডারউইনের বিগল-যাত্রা। ছবি : কনরাড মার্টিনস

www.QuranerAlo.net

Contents

দিলেন এইসব জাগতিক নিয়ামকের প্রভাবে আদি অবস্থা থেকে বিবর্তিত (পরিবর্তিত) হয়ে ভূপৃষ্ঠ বর্তমান অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে।

আমরা স্বাভাবিকভাবেই দেখি জগতের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে চলতে গিয়ে উদ্ভিদ ও প্রাণিতে পরিবর্তন হয়। একেক অঞ্চলে একেক রকম প্রাণের দেখা মিলে। বিগল জাহাজে শিক্ষানবিস হিসেবে ভ্রমণকালে (১৮৩১-১৮৩৬) চিকিৎসকপুত্র চার্লস ডারউইন সেটাই পর্যবেক্ষণ করেন। এই পরিবর্তনকে ভ্যারিয়েশন বা পরিবৃত্তি বলা হতো। পাশাপাশি দেখতে পান টিকে থাকার জন্য প্রাণ ক্রমাগত সংগ্রামে লিপ্ত। এগুলো যদিও নতুন কিছু নয়, বহু আগে থেকেই মানুষ এসব বিষয়ে জ্ঞাত। যাই হোক, এই ভ্রমণের সময়ই তিনি ভূতত্ত্ববিদ লায়েলের বই পড়ার সুযোগ পান। লায়েলের প্রাকৃতিক ব্যাখ্যার ধারণা দ্বারা ব্যাপক প্রভাবিত হন তিনি। এমনকি ডারউইন এও বলেছিলেন—নিজের লেখা বইপত্রের অর্ধেকটা অংশের ধারণা তিনি লায়েলের মাথা থেকেই পেয়েছেন। ল্যামার্কের কাজের সাথেও পরিচিত ছিলেন ডারউইন। পাশাপাশি ডারউইনের দাদা ইরেসমাস ডারউইন প্রাণ-বিকাশের জাগতিক ধারণা নিয়ে যে কবিতাগুলো লিখেছিলেন, সেগুলোও ডারইনের পড়া ছিল।

ইংরেজ নিসর্গী চার্লস রবার্ট ডারউইন, ১৮০৯ সালে শ্রুসবেরিতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৫৯ সালে অরিজিন অফ স্পিসিজ বইয়ের দ্বারা তিনি প্রাণবৈচিত্র্য বিকাশের বস্তুগত ব্যাখ্যা পেশ করে আলোচনায় আসেন। বিজ্ঞান বইপত্রে বলা হয় তিনি বৈজ্ঞানিক প্রমাণের দ্বারা নিজের তত্ত্ব সাজিয়ে এক বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন। কিন্তু ঐতিহাসিকগণের মতে, বস্তুবাদে বিশ্বাসের অনুগত বিধায় উনার তত্ত্ব বহুল প্রসার ঘটানো হয়েছিল।

ছবি : লরা ক্রথার্স

বিগল-যাত্রা থেকে ফিরে ধীরে ধীরে ডারউইন খ্রিস্টধর্মের প্রতি বিশ্বাস হারাতে থাকেন। বাইবেলকে খোদার বাণী হিসেবে মেনে নিতে পারছিলেন না তিনি, একই সাথে অলৌকিক ঘটনা ঘটার সম্ভাবনার উপরও আস্থা হারিয়ে ফেলেন। এর বদলে প্রকৃতির উপর তার অগাধ আস্থা বেড়েই চলে। বাবার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে উইলিয়াম ডারউইন রোমন্থন করেন—বাবার কাছে প্রাকৃতিক নিয়ম অনেকটা পূজনীয় স্থানে পৌঁছে গিয়েছিল! (ডুরান্ট, ১৯৮৫) ডারউইনের নিজের জবানে দৃঢ়তা ফুটে ওঠে—প্রকৃতির সবকিছুই নির্দিষ্ট নিয়মের ফসল। কিন্তু নিয়ম কোথা থেকে আসলো সেই প্রশ্ন তিনি চিন্তা করেননি! নিয়ম তো আপনা-আপনি তৈরি হয় না। যাই হোক, ১৮৩৮ সালের অর্থনীতিবিদ রেভারেন্ড টমাস ম্যালথাস রচিত একটি পুস্তিকার সন্ধান পান ডারউইন। নেহাত কৌতূহলবশে পুস্তিকাটি কিনে এনে পড়তে থাকেন তিনি। আর সেখান থেকেই তিনি প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বের একটি বড়ো সূত্র খুঁজে পান।

www.QuranerAlo.net

Contents

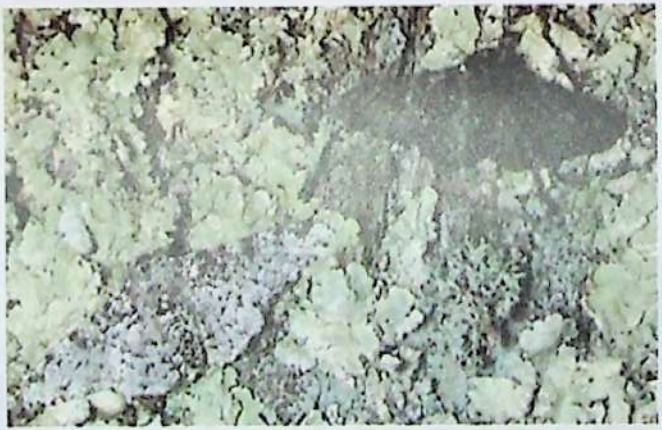

ডারউইন প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রস্তাব করলেও, এর পক্ষে কোনো পরীক্ষামূলক প্রমাণ দেখাতে পারেননি। ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লবের সময় বায়ুদূষণ বেড়ে যায়। দেখা গেল, সেসব এলাকায় সাদা মথপোকার চেয়ে কালো মথপোকার প্রাদুর্ভাব বেড়ে গেছে। জীববিদ জেমস টাট প্রস্তাব করেন, দূষণের কারণে গাছের কাণ্ড কালো হয়ে যাওয়ায়—কালো মথপোকাগুলো শিকারি পাখির চোখ এড়িয়ে গেছে, সাদাগুলো বেশি মারা পড়েছে। এভাবে বেঁচে থাকার সংগ্রামে কালোরা প্রাকৃতিকভাবে নির্বাচিত হয়েছে। এই অনুকল্পকে পরীক্ষায় রূপ দেন বার্নার্ড ক্যাটেলওয়েল, তিনি দূষণযুক্ত ও দূষণমুক্ত গাছের কাণ্ডে সাদা ও কালো মথপোকা ছেড়ে দেন। পরে কিছু পোকা সংগ্রহ করে দেখেন, দূষণযুক্ত এলাকায় কালো মথপোকার প্রাদুর্ভাব বেশি মনে যাচ্ছে। তার এই পরীক্ষাকে 'ডারউইনের হারানো প্রমাণ' বলে প্রচার করা হতে থাকে। কিন্তু পরে জানা যায়, মথপোকা মূলত গাছের কাণ্ডে অবস্থানই করে না! তারা সাধারণত গাছের উপরের দিকের শাখায় লুকিয়ে থাকে এবং দিনের বেলা খুব কমই উড়ে। অর্থাৎ, **ক্যাটেলওয়েলের পরীক্ষাটাই ভুল ছিল!** এই খবর জানার পর বিবর্তনের প্রবল সমর্থক জেরি কোয়েন একরাশ দুঃখ নিয়ে বলেছেন : *'বিবর্তনবাদীরা সময়ে-সময়ে বিবর্তনের পক্ষে প্রচার করা কোনো ক্লাসিক্যাল গবেষণা যাচাই করতে যান, এবং ভয়ের সাথে আবিষ্কার করেন যে সেটা হয় ত্রুটিযুক্ত বা একেবারেই গলদ।... আমি এতদিন ধরে ছাত্রদের ভুল পড়াচ্ছি জানতে পেরে লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে।'* (জেরি কোয়েন, ১৯৯৮) আমি যখন ছাত্র পড়াতাম, তখন এই উদাহরণ দিয়েই প্রাকৃতিক নির্বাচন বোঝাতাম। আমারও তখন জানা ছিল না যে, এই উদাহরণ গলদ। আরেকটা ব্যাপার হলো, ক্যাটেলওয়েলের পরীক্ষা সঠিক হলেও তা ডারউইনের মূল দাবিকে প্রমাণ করত না। ডারউইনের মূল দাবি ছিল প্রজাতির উদ্ভব, কিন্তু এই পরীক্ষায় নতুন কোনো প্রজাতি উদ্ভব হয়নি। স্রেফ বিরাজমান প্রজাতির মাঝে একজন সুবিধা পেয়েছে, যারা আগে থেকেই ওই এলাকায় ছিল।

www.QuranerAlo.net

ডারউইন প্রাণিজগতে ঘটে-চলা পরিবর্তনকে পর্যবেক্ষণ করে ভাবলেন—বংশ-পরম্পরায় হাজার হাজার বছরে এইসব ভ্যারিয়েশন সঞ্চয়ের মধ্যে দিয়েই হয়তো পুরোনো প্রজাতি থেকে নতুন প্রজাতি জন্ম নেয়। কিন্তু কোন প্রক্রিয়ার ফলে এমনটা হতে পারে তা তিনি খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। ম্যালথাসের বইয়ে-থাকা মানব জনসংখ্যার বৃদ্ধি সম্পর্কিত ধারণা তাকে সেই প্রক্রিয়ার খোঁজ দেয়। ডারউইন ভেবে চলেন—জীবমাত্রই জ্যামিতিক হারে বংশবৃদ্ধি করে। কিন্তু বেঁচে থাকার অবলম্বনগুলো সে হারে বাড়ে না। ফলে বেঁচে থাকার সরঞ্জাম জোগাতে ক্রমাগত লড়াই চলে জীবজগতে। এই লড়াইতে কোনো প্রজাতি অথবা প্রকরণ সুবিধে করতে পারলে তাদের বংশবৃদ্ধি অন্যদের চেয়ে বেশি হবে। ফলে তারা খাদ্য, বাসস্থান ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য বস্তুর উপর বেশি দখল নিতে পারবে। এর কারণে তাদের সংখ্যা আরও বাড়তে থাকবে; অপরদিকে যারা উপকরণ জোগাড় করতে পিছিয়ে পড়বে তাদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে কমতে থাকবে। ফলে অস্তিত্বের লড়াইয়ে একদল টিকে যাবে, আরেকদল বিলীন হয়ে যাবে। তিনি কল্পনা করেছিলেন জেমিউল (gemmules) নামে কণার দ্বারা এইসব সুবিধাজনক বৈশিষ্ট্য বংশধরদের মাঝে আসে। এই ধারণাকে প্যানজেনেসিস বলা হতো।

ডারউইন ভাবেন, নিরন্তর এই সংগ্রামের ফলেই হয়তো পৃথিবীর বিপুল প্রাণবৈচিত্র্যের উদ্ভব হয়েছে; ডারউইন এর নাম দেন 'পরিবর্তন-সহ উদ্ভব' (Descent with modification)! বেঁচে-থাকা ও বংশবৃদ্ধির জন্য যারা চলনসই প্রকৃতি তাদের বেছে নেয়; অযোগ্যরা হারিয়ে যায় কালের ক্যানভাস থেকে। সেখানে পড়ে থাকে কিছু শুকনো কালি আর অনর্থক স্বপ্নের দাগ!

ডারউইন 'প্রাকৃতিক নির্বাচন'-কে তুলনা করেছেন এলোমেলোভাবে-বয়ে-চলা বাতাসের সাথে। লক্ষ্যহীন, উদ্দেশ্যহীন যাযাবরের মতো ভবঘুরে-হয়ে-বয়ে-চলা মাতাল হাওয়া যেমন শুকনো পাতাকে গাছ থেকে উড়িয়ে বিরান জমিনে ফেলে দেয়, প্রাকৃতিক নির্বাচনও লক্ষ্যহীনভাবে (বরং বলা যায় অনেকটা নির্মমভাবে) দুর্বলকে মুছে ফেলে জীবনবৃক্ষ থেকে। এর পিছে নেই কোনো কারণ। নেই কোনো ছন্দ, আছে কেবল নির্দয় নির্লিপ্ততা!

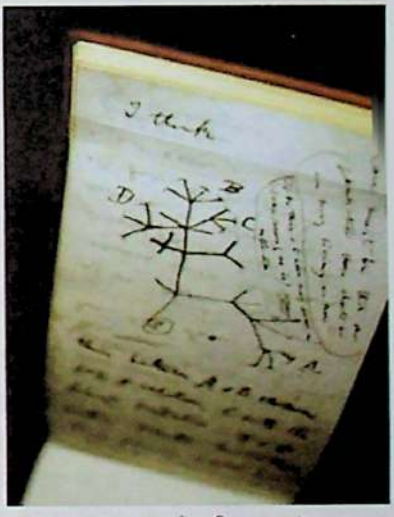

ডারউইনের হাতে আঁকা ট্রি অফ লাইফ - এর খসড়া। তিনি ভেবেছিলেন এলোপাথাড়ি, অন্ধ, জাগতিক প্রক্রিয়ায় ভাবেই হয়তো প্রাণের বিকাশ হয়েছে। যদিও এই ট্রি অফ লাইফ-এর ধারণা বর্তমান বৈজ্ঞানিক মহলে পরিত্যাক্ত। (দ্য গার্ডিয়ান, ২০০৯)

ছবি: নিউসাইন্টিস্ট

www.QuranerAlo.net

১৮৫৮ সালে ডারউইনের হাতে একটি চিঠি এসে পৌঁছায়। চিঠিটি এসেছিল মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়সী অখ্যাত এক ইংরেজ নিসর্গী রাসেল ওয়ালেস হতে; পত্রমাধ্যমে ডারউইনের সঙ্গে পরিচয় ছিল তার। পত্রপাঠে ডারউইন স্তম্ভিত ও হতবাক হয়ে পড়েন : এ-যে তারই প্রজাতি-চিন্তার সারসংক্ষেপ! দ্রুত এই ঘটনা পত্র মারফত লায়েলকে জানিয়ে দেন তিনি। হতবিহ্বল ডারউইন সব কাজ ফেলে উন্মত্ত হয়ে বই লিখতে লাগলেন। তার দীর্ঘ তেইশ বছরের সাধনার ফসল, 'বিজ্ঞানী' তকমার সম্মান অন্য কেউ ঘরে তুলবে এটা কোনোভাবেই তিনি মানতে পারেননি। (জোনাথন হোয়ার্ড, ২০০১) লন্ডনের লিনিয়ান সোসাইটির সমাবেশে ডারউইন ও ওয়ালেস দুজনেরই গবেষণাপত্র পাঠ করা হয়; তবে আগে পড়া হয় ডারউইনেরটা। শ্রোতাগণ দুটোর মাঝে তেমন পার্থক্য খুঁজে পাননি; প্রায় একই জিনিস পুনরায় শোনার জন্য মনোযোগও দেননি। ফলস্বরূপ নাম জুটে যায় ডারউইনের কপালে, ওয়ালেস হয়ে পড়েন প্রায় বিস্মৃত। মাধ্যমিক শ্রেণির পাঠ্যবইয়ে বলা হয়েছে, 'বিভিন্ন ঐতিহাসিক কারণে তাঁর চেয়ে ডারউইনের নামেই তত্ত্বটি অধিক প্রচলিত।' (জীববিজ্ঞান। নবম-দশম শ্রেণি, ২০১৯) কিন্তু কারণগুলো আর বলা হয়নি।

ভিক্টোরিয়ান ইউরোপে বিজ্ঞানচর্চা তখন নতুন দিকে মোড় নিচ্ছিল। প্রাকৃতিক ধর্মতত্ত্ব বা ন্যাচারাল থিওলজির চর্চা থেকে বেরিয়ে ন্যাচারালিস্টিক সাইন্স-এর দিকে বিজ্ঞানচর্চার জাহাজ ঘুরে যায়। প্রাকৃতিক ঘটনাবলির পিছে কেবল জাগতিক বা বস্তুগত ব্যাখ্যাকে বৈজ্ঞানিক বলে গণ্য করার চল জেঁকে বসে। বিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যার সীমাকে জগতের মাঝে বেঁধে ফেলা হয়। (মাইকেল রুজ, ২০১৯) মুক্তচিন্তার দ্বার রুদ্ধ করে জোরপূর্বক জগত-সংকীর্ণ ঠুলি পরিয়ে দেওয়া হতে থাকে বিজ্ঞানের চোখে। পাশাপাশি ভিক্টোরিয়ান সমাজে তখন পুনর্গঠনের শোর উঠতে থাকে। এই পুনর্গঠনের বিপক্ষে ছিলেন তখনকার ধনিকসমাজ, যারা মূলত ছিলেন খ্রিস্টান। এই দোলাচলের সময় ডারউইন অরিজিন অফ স্পিসিস বই প্রকাশ করে শত বছরের বায়োলজিক্যাল ডিজাইনের ধারণার জাগতিক ব্যাখ্যা পেশ করেন। হুলুস্থুল পড়ে যায় ইউরোপে!

শারীরিক অসুস্থতার কারণে স্বীয় তত্ত্ব নিয়ে ডারউইন মাঠ পর্যায়ে আসতে পারেননি; জনসম্মুখে কোনো বক্তব্য রাখারও সুযোগ পাননি। তার মত প্রচারের গুরুদায়িত্ব কাঁধে নেন 'ডারউইনের বুলডগ' বলে খ্যাত থমাস হাক্সলি। তবে হাক্সলির উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। হাক্সলি তৎকালীন সমাজ পুনর্গঠনের লক্ষ্য নিয়ে ডারউইনের মতবাদকে প্রচার শুরু করেন। যেহেতু ডারউইনের তত্ত্ব প্রজাতির বদলে যাওয়া নিয়ে, তাই সমাজ বদলের সেই ক্রান্তিকালে, প্রচলিত খ্রিস্টধর্মের বদলে প্রবল বেগে নতুন ধর্ম প্রতিষ্ঠায় মাঠে নামেন হাক্সলি। ডারউইনবাদ শুধু ধর্মের বিকল্পই নয়, বরং ধর্মের মতো একই সুখকর অনুভূতি হাক্সলিকে দিয়েছিল। হাক্সলি এবং তার অনুসারীরা তাদের নতুন ধর্মের জন্য গির্জাও বানিয়েছে। তবে এটাকে তারা গির্জা না বলে নাম দিয়েছিল প্রাকৃতিক ইতিহাসের জাদুঘর (natural history museum)! এই জাদুঘর বানানোও হয়েছিল গির্জার আদলে। খ্রিস্টানরা গির্জায় যেত রবিবার সকালে, আর হাক্সলির ধর্মের জাদুঘরে

www.QuranerAlo.net

মানুষ যেত বিকেলে। সেখানে তারা দেখত অতীত জীবন, ডায়নোসরের হাড়গোড়। পুলকিত হয়ে তারা বলে উঠত—বাহ, কী অদ্ভুত! (মাইকেল রুজ, ২০১১) হাক্সলির এই পরিকল্পনার সাথে অনেকটা সহযোগীর ভূমিকা পালন করেছিলেন তৎকালীন আর্নেস্ট হেকেল ও হার্বার্ট স্পেনসার।

উপরের ছবিটি ফ্রান্সের লাওন গীর্জার অভ্যন্তরেব দৃশ্য। নিচেরটি লন্ডনের ন্যাচারাল হিস্টোরি মিউজিয়ামের অভ্যন্তরেব দৃশ্য। গঠনের সাদৃশ্য খুব সহজেই চোখ পড়ে।

ছবি: সাইন্সম্যাগ

প্রচলিত বইপত্রে বলা হয়, ডারউইনের তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক প্রামাণ্যতার কারণে প্রবল বিজয় পেয়েছিল! ডারউইনের বিরোধিতা করেছিল স্রেফ কিছু কূপমণ্ডুক যাজক। কিন্তু ইতিহাস বলে ভিন্ন কথা। ডারউইন প্রাণের বিকাশে জাগতিক ব্যাখ্যার উপর জোর দিচ্ছিলেন। হাক্সলিও সে সময় এমন কিছুই চাচ্ছিলেন। ভিক্টোরিয়ান সমাজ বদলের হাওয়ায় রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে আলাদা করার প্রক্রিয়া জারি রাখতে হলে—যেসব প্রশ্নের উত্তর ধর্ম দেয়, সেসব প্রশ্নের বিকল্প উত্তর দাঁড় করাতে হবে। মানুষের-মাঝে-থাকা চিরাচরিত প্রশ্নগুলো যদি জাগতিক ব্যাখ্যা দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া যায়, তা হলে এই পৃথক্করণ প্রক্রিয়ায় কোনো বাধা থাকবে না। তাই ডারউইনের তত্ত্ব নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন থমাস হাক্সলি। ঐতিহাসিকদের মতে, ডারউইন প্রাণের জাগতিক ব্যাখ্যার উপর জোর দিচ্ছিলেন বলেই তার তত্ত্ব এতটা আপ্যায়ন পায়। (নিল গিলেস্পি, ১৯৭৯)

বৈজ্ঞানিক অবস্থান বিচারে ডারউইনের সমসাময়িক বিজ্ঞানীদের অধিকাংশই প্রাকৃতিক নির্বাচন নিয়ে তার মতকে আমলে নেননি। তখনকার অধিকাংশ বিজ্ঞানী মনে করতেন বিবর্তনের পিছে কোনো বুদ্ধিমত্তা ক্রিয়াশীল। (দ্বিজেন শর্মা, ২০১৬) আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেসও এই মত পোষণ করতেন। তিনি মত দেন, বিবর্তন কোনো এলোপাথাড়ি খেল নয়; বরং যৌক্তিক সিদ্ধান্ত হলো, কোনো বুদ্ধিমত্তা এই বিবর্তনকে নিয়ন্ত্রণ করছে। ওয়ালেস বিবর্তন তত্ত্বের সহ-প্রতিষ্ঠাতা হওয়ায় তার এই মনোভাবে ডারউইন আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। সমকালীন বিবর্তন সমর্থকদের গলার কাঁটায় পরিণত হন ওয়ালেস। (মাইকেল এ. ফ্লেনারি, ২০১৮) তাই ডারউইনের মতো তিনি অতটা

www.QuranerAlo.net

মনোযোগ পেলেন না।

১৮৯০ থেকে শুরু করে পরবর্তী প্রায় চল্লিশ বছর ডারউইনের তত্ত্ব ব্যাপকভাবে বিজ্ঞানীদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়। প্রাণের বিকাশের বিভিন্ন স্বতন্ত্র তত্ত্ব পেশ করেন বিজ্ঞানীরা। ডারউইনবাদের পোপ-হিসেবে-খ্যাত থমাস হাক্সলি এই ক্রান্তিকালের নাম দেন—ডারউইনবাদের সংকটকাল (Eclipse of Darwinism)। অবস্থা এতটাই সঙ্গিন হয়ে পড়ে যে বিবর্তনের কড়া সমর্থক জে. বি. এস হ্যালডেন বলতে বাধ্য হয়ছিলেন—'যত বয়ানই দেওয়া হোক না কেন, ডারউইনবাদ মরে গেছে।' (পিটার জে. বোলার, ১৯৮৯)

বিশ শতকের প্রথম অর্ধাংশে ডারউইনের মৃত তত্ত্বকে আবার বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টা চালানো হয়। ডারউইন জেনেটিক্স বিষয়ে কিচ্ছু জানতেন না। জেনেটিক্সের চল শুরু হওয়ার পর ডারউইনের প্যানজেনেসিস ধারণা বর্জিত হয়। জুলিয়ান হাক্সলি, আর্নেস্ট মায়ার, থিওডোসিয়াস ডবঝানস্কি-সহ আরও গবেষক ডারউইনের মতের সাথে মেন্ডেলিয় জেনেটিক্স মিলিয়ে তৈরি করেন নতুন খিচুড়ি! ডারউইনের বুলডগ থমাস হাক্সলির দৌহিত্র্য জুলিয়ান হাক্সলি এই নবতত্ত্বের নাম দেন মডার্ন সিন্থেসিস। ডারউইন বিবর্তনবিদ্যাকে পেশাদার বিজ্ঞানের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পারেননি। তার অধরা স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করে মডার্ন সিন্থেসিস প্রবক্তারা। (পি.জে. বোলার, ২০০৩)

কিন্তু এখানেও একটা চমকপ্রদ ব্যাপার আছে। মডার্ন সিন্থেসিস রচনাকারেরা শুরুতে বিবর্তন তত্ত্বের আপাত-ধর্মীয় (quasi-religious) দিকটি দেখেই আকর্ষিত হয়েছিলেন বলে জানা যায়। (মাইকেল রুজ, ২০০৩) যেমন—জুলিয়ান হাক্সলি দাদাজানের ধর্ম-প্রতিস্থাপনের ইচ্ছাকে সামনে এগিয়ে নিতে থাকেন। বিবর্তনকে পুঁজি করে তিনি নবধর্মের (evolutionary humanism) ছক কাটেন; আর সেই ধর্মের বাণী প্রচার করেন Religion Without Revelation বইতে! (মাইকেল রুজ, ২০১১) তীব্র খোদাবিরোধী এই ব্যক্তি UNESCO এর ১ম ডিরেক্টর-জেনারেল ছিলেন। এই প্রভাবশালী পদ কাজে খাটিয়ে শিক্ষাব্যবস্থাতে তার ধর্মের বীজ ঢুকিয়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। এ ছাড়াও বিশ শতক ও তারপরের বিবর্তন প্রচারকদের অধিকাংশই বিবর্তনকে শুধু বিজ্ঞানের গণ্ডিতে রাখেননি, বিশ্বদৃষ্টিতে (worldview) টেনে এনেছেন। (জন লিঙ্ক, ২০০৫) শয়তানের চার্চের প্রতিষ্ঠাতা এন্টন জান্দর লেভেই তো শয়তানের ধর্মের মূলনীতিই দাঁড় করিয়েছিলেন ডারউইনবাদের উপর! (এন্টন জান্দর লেভেই, ১৯৬৯)

গত শতাব্দীর পুরোটা জুড়ে এই মডার্ন সিন্থেসিসের খিচুড়ি বণ্টন করা হয়েছে। জোর করে গেলানো হয়েছে। শেখানো হয়েছে—বিবর্তনের চোখে না দেখলে জীববিজ্ঞান অর্থহীন! যারাই প্রাকৃতিক নির্বাচনের সীমাবদ্ধতা, ব্যর্থতা নিয়ে বৈজ্ঞানিক অঙ্গনে মুখ খুলতে চেয়েছে তাদের মুখ বন্ধ করার জোর চেষ্টা চলেছে। ডারউইনকে সাধু-সন্ত নয়,

www.QuranerAlo.net

বরং খোদার আসনে বসানো হয়েছে। বলা হয়েছে—হয় খোদায় বিশ্বাস করো, না হয় ডারউইনে বিশ্বাস করো! (জেরি ফডোর ও মাসিমো পিয়াতেলি, ২০১০)

> "বিবর্তনবিদ্যায় ডারউইনকে ঈশ্বরে পরিণত করা হয়েছে। তাই ডারউইনের কোনো সমালোচনা করা যাবে না। যদি করো, তা হলে তোমাকে হঠকারী সাব্যস্ত করা হবে।"
>
> - মাসাতোশি নাই
> মলিকুলার ইভোলিউশনারি বায়োলজিস্ট

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, বিবর্তন সূচনা থেকেই একটি মতাদর্শ হিসেবে প্রচারিত হয়েছে, পুরোনো ধর্মের বদলে নতুন ধর্ম হিসেবে প্রসার পেয়েছে। (মাইকেল রুজ, ২০১৭) বিশ শতকে পেশাদার বিজ্ঞানে রূপ পাওয়ার পরও এই তত্ত্বের চর্চাকারীদের অধিকাংশই একে বিজ্ঞানের বাইরে নিয়ে গেছেন। কেউ কেউ এও বোঝাতে চেয়েছেন, বিবর্তন হলো একটি মিথ, যা খ্রিস্টধর্মকে পরাস্ত করতে সদাপ্রস্তুত। নিজেকে গোঁড়া বিবর্তনবাদী আখ্যা দেওয়া দার্শনিক মাইকেল রুজ এই ঐতিহাসিক বাস্তবতার দিকে ইঙ্গিত করে বলেন (মাইকেল রুজ, ২০১১):

> বিবর্তনবাদকে এর চর্চাকারীরা শুধু বিজ্ঞান নয়, বরং এর চেয়েও বেশি কিছু হিসেবে প্রচার করেছে। বিবর্তনবাদ ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে একটি মতাদর্শ ও সেকুলার ধর্ম হিসেবে।

মাধ্যমিক শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে মডার্ন সিন্থেসিস সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'বিবর্তনের বিপক্ষে কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ এখন পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি।' (জীববিজ্ঞান। নবম-দশম শ্রেণি, ২০১৯) অথচ বিংশ শতকের শেষ তৃতীয়াংশে পরিচালিত নানা গবেষণা থেকে দেখা যাচ্ছে মডার্ন সিন্থেসিস তত্ত্ব সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়েছে। এই তত্ত্বের অনুমানগুলো ভয়াবহ চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে গেছে। গবেষকদের মতে একবিংশ শতকের শুরুতে এসে প্রচলিত মডার্নিস্ট জীববিদ্যা মুখ থুবড়ে পড়েছে! (মাইকেল রোজ ও টড ওকলে, ২০০৭)

সাম্প্রতিক সময়ে মডার্ন সিন্থেসিসের মূল ধারণাগুলোকে নবপর্যবেক্ষণের আলোকে ভুল প্রমাণ করেছেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডেনিস নোবেল। (ডেনিস নোবেল, ২০১৩) তার এই কর্মে নব্য-ডারউইনবাদীরা মোটেও খুশি হয়নি। এক সাক্ষাৎকারে ডেনিস নোবেল জানান :

> পারলে নব্য-ডারউইনবাদীরা আমার গায়ে ফুটন্ত গরম পানি ঢেলে দিত!

বিবর্তনবাদী জীববিদ ইউজিন কোনিন প্রায় দশ বছর আগে বলেছেন, মডার্ন সিন্থেসিস-এর আয়ু শেষ, এবার পোস্ট-মডার্ন সিন্থেসিস নিয়ে খেলা হবে! (সুজান মাজুর, ২০০৯)। বিবর্তনবাদী জীববিদ মাসিমো পিগলিউচ্চি বলেছেন, নাহ, মডার্ন সিন্থেসিস আর চলছে না। এই নিন এক্সটেন্ডেড ইভোলিউশনারি সিন্থেসিস-এর হালুয়া! (গার্ড মুলার এট এল., ২০১৫) এগুলো ছাড়াও আরও বেশ কয়েকটি বিকল্প তত্ত্ব হাজির করেছেন

www.QuranerAlo.net

বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানীরা! (পিট গাস্টার, ২০০৬)

২০১৬ সালে বিখ্যাত রয়াল সোয়াইটি-তে আয়োজিত 'নিউ ট্রেন্ডস ইন ইভোলিউশনারি বায়োলজি'-শীর্ষক আন্তর্জাতিক কনফারেন্স-এ বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানীরা। কার তত্ত্ব বেশি ঠিক তা নিয়ে তুমুল আলোচনা চলে। একদল বিজ্ঞানী পুরোনো জঙ-ধরা মডার্ন সিন্থেসিস তত্ত্ব আঁকড়ে ধরে বাঁচার স্বপ্নে উকিলগিরি চালিয়ে যান। অন্যরা নিজেদের বিকল্প তত্ত্ব দিয়ে পালটা আঘাত হানেন। সব তত্ত্বেরই নিজস্ব সীমাবদ্ধতা থাকায় কেউ কারোটা মানতে রাজি হন না। (কার্ল জিমার, ২০১৬)

এসবের কিছুই আমাদের পাঠ্যপুস্তকে নেই, বিজ্ঞান প্রচারকদের বইয়েও নেই। আমাদের শুধু নিশ্চিন্তে বিশ্বাস করে যেতে বলা হচ্ছে। সাদা-এপ্রোন-পরা পুরোহিতদের কথা চোখ বুজে মেনে নিতে বলা হচ্ছে। অনেক বিজ্ঞানপ্রেমী সানন্দে তা করেও যাচ্ছে। বিজ্ঞান যে বহু আগেই ধর্মে পরিণত হয়ে গেছে এ নিয়ে আক্ষেপ করতে গিয়ে বিবর্তনবাদী ফসিলবিদ ড. হেনরি গী বলেন (হেনরি গী, ২০১৩) :

> আমরা যখন খুঁটিয়ে দেখা শুরু করলাম, তখন সহসাই বুঝতে পারলাম—বিজ্ঞানীরা আসলে সত্যের ডালা সাজিয়ে বসে নেই! দেখতে পেলাম তারা বিজ্ঞানের একেবারে বুনিয়াদী বিষয় নিয়ে বাকবিতণ্ডায় লিপ্ত। বুক বেয়ে দীর্ঘশ্বাস নেমে এল। তারা তা হলে পুরোহিত ছিল না, স্রেফ ধাপ্পাবাজ ছিল। বিজ্ঞানের দোকান খুলে তারা আমাদের লুটে নিল। দ্বারে দ্বারে তারা সর্বরোগের মহৌষধ ফেরি করে বেড়াল। অথচ বিজ্ঞান নিয়ে তারা নিজেরাই যে একমত হতে পারে না—এই বাস্তবতা সুকৌশলে ধামাচাপা দিয়ে রাখল। যদি তারা নিজেরাই একমত হতে না পারে, তা হলে আমার-আপনার মতো ভালোমানুষগুলো কেন এদের বিশ্বাস করবে?

www.QuranerAlo.net

বিবর্তনচিন্তার কাঠামো

There is a horror in this view of Life
~ rA

বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসেবে বিবর্তন তত্ত্ব চেষ্টা করে জীববৈচিত্র্যের জাগতিক ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে। প্রাণের উৎপত্তি নিয়ে মূল বিবর্তন তত্ত্বের মাথাব্যথা নেই। বিবর্তন তত্ত্ব প্রাণের উৎপত্তির পর থেকে জীবনেতিহাস সাজাতে চায় প্রকৃতিবাদের বৃক্ষে। প্রকৃতিবাদে বিশ্বাসের প্রতি আনুগত্যের কারণে প্রাণের বিকাশে কোনো ঐশ্বরিক নির্দেশনা বা পরিকল্পনা আগেই প্রত্যাখ্যান করে। ধরে নেয়, জীববৈচিত্র্য স্রেফ এলোপাথাড়ি জাগতিক প্রক্রিয়ার ফলে দুর্ঘটনাস্বরূপ আবির্ভূত হয়েছে; এর পিছে নেই কোনো পরিকল্পনা, কোনো উদ্দেশ্য, কোনো পরোয়া, কোনো ভালো-মন্দ! এই ধূসর বিশ্বাস নিয়ে শুরু করে অর্থহীন-উদ্দেশ্যহীন জীবনের গল্প লেখা। বিবর্তন তত্ত্ব অনুযায়ী—আমাদের বেঁচে থাকার কোনো উদ্দেশ্য নেই। (কসটাস ক্যাম্পোরকিস, ২০১৪)

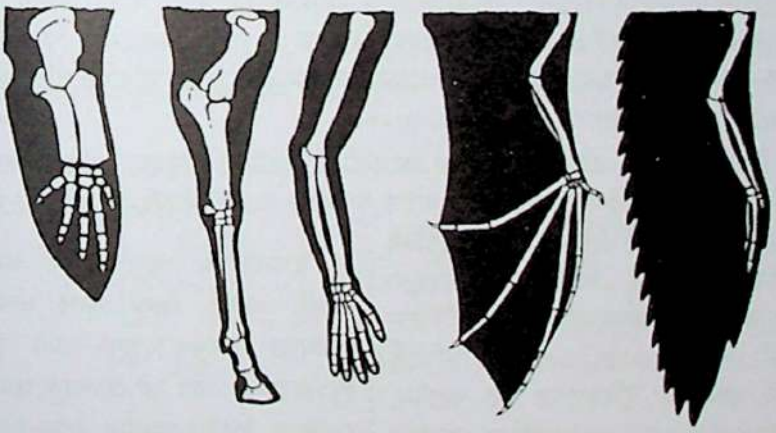

হোমোলজির বহুল প্রচলিত উদাহরণ। ডান দিক থেকে যথাক্রমে পাখি ও বাদুড়ের ডানা, মানুষের হাত, ঘোড়ার সামনের পা এবং তিমির ফ্লিপার এর গঠন। পাঠ্যবইয়ের ভাষ্য সাদৃশ্য থাকা বিবর্তনের প্রমাণ, সাধারণ-পূর্বপুরুষের নিশ্চয়তা। আসলেই কি?

www.QuranerAlo.net

বিবর্তনকে মেনে নেওয়া মানুষও আসলে এটা মানতে পারে না যে—বেঁচে থাকার নিয়ত সংগ্রামের পথে কোনো এক দুর্ঘটনার ফলে তার আবির্ভাব। তার জীবনের কোনো মানে নেই; তার বিষাদ-হর্ষ-স্বপ্ন-ভালোবাসা-শিল্প-সাহিত্য-আশা সবকিছুই অর্থহীন। তাই তারা আফিম সেবকের মতো বিভ্রম নিয়ে বাঁচতে চায়, মিছে অর্থের বিভ্রম। আফসোস, ব্যর্থ সে প্রচেষ্টা! (হুইটলে কফম্যান, ২০১৬)

প্রাণের ইতিহাস (Tree of Life)

জীবজগতের দিকে তাকালে সহজেই প্রাণের মাঝে মিল-অমিলের ব্যাপারটা চোখে পড়ে। চড়ুই আর টুনটুনি-র মাঝে যেমন মিল, ব্যাঙের সাথে তাদের মিল তেমন না। এদের কারও সাথে তারামাছের মিল নেই। এই চারজনের সাথে মিল নেই রজনীগন্ধার; রজনীগন্ধার মিল হলো বেলির সাথে, গোলাপের সাথে। সুইডিশ নিসর্গী ক্যারোলাস লিনিয়াস এই মিল-অমিলের ভিত্তিতে জীবজগতকে শ্রেণিবিন্যাস করেন—উদ্ভিদজগৎ আর প্রাণিজগৎ। তিনি মনে করতেন প্রাণের মাঝে এই সাদৃশ্য স্রষ্টার ইচ্ছারই বহিঃপ্রকাশ। (পিটার জে. বোলার, ২০০৩)

জীববিজ্ঞানী ওয়েন এই মিলকে দুভাগে বর্ণনা করেন—হোমোলজি (Homology) আর অ্যানালজি (Analogy)। হোমোলজি মানে গঠন বা অবস্থানের ভিত্তিতে সাদৃশ্য; কাজ যাই হোক না কেন। যেমন : মানুষের হাত, ঘোড়ার সামনের পা, পাখি ও বাদুড়ের ডানা গঠনের দিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ। এই হোমোলজির ভিত্তিতে জীবিজগতের শ্রেণিবিন্যাস করা হয়। অন্যদিকে অ্যানালজি মানে কর্মে সাদৃশ্য, গঠন যেমনই হোক না কেন। যেমন : পাখির ডানা আর প্রজাপতির ডানার গঠনে মিল নেই, কিন্তু কাজে মিল; দুটোই উড়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। ওয়েন ভাবতেন এটা স্রষ্টার সাধারণ পরিকল্পনার (Archetype) ফসল। (পি. জে. বোলার, ২০০৩)

কিন্তু ডারউইন এই ধারণা পছন্দ করেননি। ডারউইন অনুমান করেন, প্রাণের মাঝে থাকা গাঠনিক মিল হয়তো সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে বিবর্তনের ফলে হয়েছে। (assumption of homology) সাধারণ পরিকল্পনা থেকে সরে এসে সাধারণ পূর্বপুরুষ-এর অনুমানকে প্রাধান্য দেন তিনি। (পি. জে. বোলার, ২০০৩) এর ভিত্তিতে তিনি জীবনের ইতিহাসের ছক কাটেন, যা Tree of life নামে পরিচিত; বাংলায় জীবনবৃক্ষ বলা যাক। দুটি প্রাণির মাঝে গাঠনিক মিল (হোমোলজি) যত বেশি তারা জীবনবৃক্ষে ততই একে-অপরের কাছে। (বার্নাড উড, ২০০৫) তিনি আরও অনুমান

> "ডারউইনের পরে কোনো প্রমাণ ছাড়াই প্রাণের মাঝে থাকা সম্পর্ক বিবর্তনের ফলে হয়েছে—এমন বুঝ দেওয়া হলো। আর এই ধারণাকে সমর্থন জোগাতে বিবর্তন-সম্বন্ধীয় ধ্যান-ধারণা গড়ে তোলা হলো।"
>
> - কেভিন দ্য কুয়েরোজ
> বিবর্তনবাদী প্রাণিবিদ

www.QuranerAlo.net

Contents

করেন সমস্ত প্রাণ একটি প্রাণ থেকে জাগতিক প্রক্রিয়ায় পর্যায়ক্রমে আবির্ভূত হয়েছে (assumption of common origin)। ডারউইন ভেবেছিলেন জীবনবৃক্ষের ধারণা ঐশ্বরিক সৃষ্টিকে অপ্রমাণিত করবে। এজন্যই ডারউইনের তত্ত্ব নিয়ে এতো মাতামাতি। কিন্তু বাস্তবতা হলো—এই ধারণা ভুল! স্রেফ মিল দেখে সাধারণ-পূর্বপুরুষের নিশ্চিত প্রমাণ হয় না। কারণ স্রষ্টা চাইলেই একইরকম জিন দিয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ প্রাণি তৈরি করতে পারেন। (ফোর্ড ডুলিট্‌ল ও টাইলর ক্রুনেট, ২০১৬)

হোমোলজির অনুমান বিবর্তনবিদ্যার কেন্দ্রীয় বিষয়গুলোর একটি। পুরো বিবর্তন-চিন্তার কাঠামো দাঁড়িয়ে আছে এর উপর। এটি ছাড়া জীববিদ্যা অচল! পাঠ্যবইতে বিবর্তনের পক্ষে যে-সকল প্রমাণ দেওয়া হয় তার প্রায় সবই হোমোলজি অর্থাৎ সাদৃশ্যভিত্তিক। কিন্তু একটা অনুমানের উপর পুরো বিবর্তনের কাঠামো দাঁড়িয়ে থাকবে এটা কেউ কেউ মেনে নিতে পারেননি। তাই বিবর্তনবাদীরা হোমোলজির সংজ্ঞায় বদল ঘটান। এর ফলে এমন এক সমস্যার সৃষ্টি হয় যা আজ পর্যন্ত তারা সমাধান করতে পারেননি। (এড্রু ইংকপেন ও ফোর্ড ডুলিটল, ২০১৬) হোমোলজির নতুন সংজ্ঞা দেওয়া হয়, দুটি প্রাণির মাঝে কোনো বৈশিষ্ট্যকে তখনই হোমোলগাস অর্থাৎ সাদৃশ্যপূর্ণ বলা হবে, যখন সেই বৈশিষ্ট্যগুলো সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে আসবে। এই বৈশিষ্ট্য হতে পারে গাঠনিক (morphological), শারীরবৃত্তীয় (physiological), আণবিক (molecular), আচরণগত (behavioural) ইত্যাদি। (আর্নস্ট মায়ার, ২০০২)

কিন্তু সমস্যা হলো, সাধারণ পূর্বপুরুষ এর মাধ্যমে হোমোলজির সংজ্ঞা দিলে এ আর বিবর্তনের প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। (রিচার্ড ডকিন্স, ২০০৯) কার এক্ষেত্রে আগে হোমোলজির সাহায্য ছাড়া স্বতন্ত্রভাবে সাধারণ-পূর্বপুরুষ (commor ancestry) প্রমাণ করতে হবে। তারপর বলা যাবে, যেহেতু সাধারণ-পূর্বপুরুষ প্রমাণিত তাই এদের অমুক-অমুক গঠন হোমোলগাস। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, হোমোলজির

বিবর্তনবাদীরা প্রকৃতিবাদে বিশ্বাসের কারণে আগেই অনুমান করে নেয়—সাধারণ পূর্বপুরুষ থাকতেই হবে। তারপর সুবিধামতো সাদৃশ্য দিয়ে বিবর্তন-সম্পর্ক দাঁড় করায়। যে-সকল উপাত্ত মিলে না সেগুলো হয় বাদ দেয় বা ব্যাখ্যা করে ঘুরিয়ে দেয়। তারপর প্রচার করে অমুকের পূর্বপুরুষ তমুক।
ছবি : ব্রায়ান ও আংকো

www.QuranerAlo.net

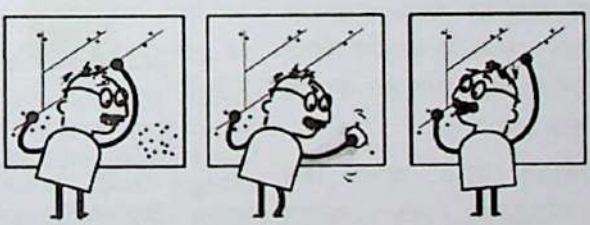

Contents

সাহায্য ছাড়া সাধারণ-পূর্বপুরুষ-প্রস্তাব সম্ভব না! সাধারণ পূর্বপুরুষ বলে দাবি করার বিদ্যা (Phylogeny) পুরোটাই হোমোলজি-ভিত্তিক। সুতরাং, অমুক অমুক বৈশিষ্ট্য মিলে যায় তাই প্রমাণিত হয় এদের সাধারণ পূর্বপুরুষ এক—এমন দাবি স্রেফ কুযুক্তি (ফ্যালাসি অফ সার্কুলার রিজনিং, ফ্যালাসি অফ আনডিস্ট্রিবিউটেড মিডল)! (রোনাল্ড ব্রেইডি, ১৯৮৫) আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, অধুনা বিবর্তনবিদ্যার সর্বত্রই এমন কুযুক্তির ছড়াছড়ি!

তা ছাড়া দেখা যায়, বিভিন্ন প্রাণির মাঝে অনেক সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়ার পরও, বিজ্ঞানীরা বলেন এদের সাধারণ-পূর্বপুরুষ এক না। যেমন : বাদুর ও তিমির একোলোকেশন, মারসুপিয়াল ও প্লাসেন্টাল সেবারটুথ টাইগার, নানা ধরণের ডানা ইত্যাদি। একে বলা হয় হোমোপ্লেইজি/কনভার্জেন্স (Homoplasy/Convergence)। এমন নমুনা প্রচুর পাওয়া যায়। সুতরাং মিল থাকা মানেই যে তা সাধারণ-পুর্বপুরুষ এর নিশ্চিত প্রমাণ—এমন ধারণাও অযৌক্তিক।

এখানে আরেকটা বড়ো সমস্যা হলো—'মিল/সাদৃশ্য' এর মানদণ্ড নিয়ে! (ইংকপেন ও ডুলিট্‌ল, ২০১৬) দেখা গেছে, গাঠনিক মিল বিবেচনা করলে যে সাধারণ পূর্বপুরুষ আসে, আণবিক সাদৃশ্য বিবেচনা করলে সেই সাধারণ পুর্বপুরুষ আসে না; ভিন্ন কিছু আসে। (ত্রিশা গুরা, ২০০০) আবার ভিন্ন ভিন্ন জবঅণুর সাদৃশ্য বিবেচনা করলে আলাদা বিবর্তন-সম্পর্ক আসে! যেমন RNA দিয়ে যে বিবর্তন-সম্পর্ক পাওয়া যায়, DNA দিয়ে তার থেকে ভিন্ন বিবর্তন-সম্পর্ক পাওয়া যায়! প্রোটিনের দিয়ে বিবেচনা করলে পাওয়া যায় আরেক বিবর্তন-সম্পর্ক। (লিলিয়ানা ডাভালস এট এল., ২০১৬) ফলে দেখা যায় একই প্রজাতি একসাথে অনেকগুলো গণ বা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে!

বিবর্তনবাদীদের বড়ো আশা ছিল মলিকুলার বায়োলজি বহু বছরের হোমোলজি সমস্যার সমাধান নিয়ে আসবে। (আর্নেস্ট মায়ার, ২০০২) কিন্তু সেই বিশ্বাস (!) সাম্প্রতিক গবেষণায় ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়েছে। (ইংকপেন ও ডুলিট্‌ল, ২০১৬)

জীবনবৃক্ষ নিয়ে ডারউইনের ধারণা যে ভুল ছিল, সে বিষয়ে বিবর্তনবাদী বিজ্ঞান সাময়িকী *নিউসাইন্টিস্ট*-এর কভার স্টোরি। এই খবর জনসম্মুখে আনার কারণে নিউসাইন্টিস্ট অন্যান্য বিবর্তনবাদীদের তোপের মুখে পড়ে যায়। নিউসাইন্টিস্ট-এর প্রতিবেদনকে 'মিথ্যা, হিংসাত্মক' বলে চিঠি পাঠায় নিজেদের লোকেরাই! বিবর্তনবাদীরা সব সময় চেষ্টা করে যাতে তাদের সমস্যাগুলো জনসম্মুখে প্রকাশ না পায়। মাঝে মধ্যে নিজেদের লোকেরা মুখ ফসকে কিছু বলে ফেললে তার উপর হামলে পড়তেও দ্বিধাবোধ করে না।

www.QuranerAlo.net

আরেকদল বিজ্ঞানী ভ্রূণতত্ত্বের দিক থেকে হোমোলজিকে বাঁচানোর চেষ্টা করলেন।। তারা ভাবলেন ভ্রূণের বিকাশের সময় হয়তো একইরকম কোষ থেকে সাদৃশ্যযুক্ত গঠন তৈরি হয়। এই অনুমানও প্রমাণের ভিত্তিতে ভুল প্রমাণিত হয়! ভিন্ন ভিন্ন কোষ থেকে সাদৃশ্যযুক্ত অঙ্গ এবং সাদৃশ্যযুক্ত কোষ থেকে ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ গঠিত হওয়ার অনেক নজির পাওয়া যায়। তখন কেউ কেউ বললেন, তা হলে আমরা জিন ঘেঁটে দেখি—একইরকম জিন থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ গঠন আসবে নিশ্চয়! কিন্তু হতাশার কথা হলো—একইরকম জিন থেকে ভিন্নরকম অঙ্গ, আবার ভিন্নরকম জিন থেকে সাদৃশ্যযুক্ত অঙ্গ আসার প্রমাণ পাওয়ায়—এই আশাতেও গুঁড়ে বালি! তাই ভ্রূণবিদ্যার দিক থেকেও হোমোলজি সমস্যার কোনো সমাধান হলো না। (ইংকপেন ও ডুলিটল, ২০১৬) একটু ভেবে দেখো, জীববিদ্যার একেবারে কেন্দ্রীয় বিষয় হোমোলজির ধারণা এত বছর পরও ছায়ায় ঘিরে আছে, নানা সংশয়-সমস্যায় জর্জরিত হয়ে আছে। বাস্তবতা হলো, হোমোলজি আসলে প্রমাণ করাই সম্ভব না, এটা একটা অনুমান (inferrence) মাত্র। (আর্নেস্ট মায়ার, ২০০২)

আরেকটা বিষয় তোমরা জানো না। ডারউইন যে গাঠনিক সাদৃশ্যের উপর ভিত্তি করে Tree of life বা জীবনবৃক্ষের ছক এঁকেছিলেন, যা না হলে ডারউইনবাদের জন্মই হতো না; সেই বহুল প্রচারিত ও বিখ্যাত ধারণা বিভিন্ন কারণে বাতিল হয়ে গেছে! ডারউইনের তত্ত্বের কেন্দ্রীয় গঠন আজ বিবর্তনবাদী-বিজ্ঞানী-মহলে প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে! ক্যামব্রিয়ান বিস্ফোরণ জীবনবৃক্ষকে পুরো উল্টিয়ে দিয়েছে। আর পার্শ্বীয় জিন সঞ্চার (Horizontal gene transfer) পুরো বৃক্ষকেই উপড়িয়ে ফেলেছে। (ফোর্ড ডুলিটল, ২০০০) সকল প্রাণ একটি আদিপ্রাণ থেকে আবির্ভূত হয়েছে এমন ধারণাও টিকছে না। (রেচেল মোলার, ২০০২) বিবর্তনবাদী জীববিদ এরিক ব্যাপটিস্ট বলেন, 'ট্রি অফ লাইফ সত্য—এই দাবির স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ নেই।' (গ্রাহাম লটন, ২০০৯)

> "আমার মনে হয়, প্রচলিত ট্রি অফ লাইফ হলো শুরুর দিককার বৈজ্ঞানিক গবেষণা থেকে অনুমিত চিত্র, যা এখন আর খাটছে না... তাই, ট্রি অফ লাইফ ধারণা সঠিক না।"
>
> - ক্রেগ ভেন্টর
> বিবর্তনবাদী জিনবিদ

অবাক করার মতো কথা না?

সর্বজনীন সত্য বানিয়ে ফেলা তত্ত্বের মূলভিত্তি সম্পর্কে ১৫০ বছর পর এসে বলা হচ্ছে—এর কোনো প্রমাণ নেই! (আয়ান স্যাম্পল, ২০০৯)

> ট্রি অফ লাইফ-কে দরদভরে দাফন করা হয়েছে। জীববিদ্যা সম্পর্কে আমাদের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আনা দরকার। যদিও এ ব্যাপারটা অধিকাংশই মানতে রাজি না।
>
> - মাইকেল রোজ, বিবর্তনবাদী জীববিদ

www.QuranerAlo.net

ক্রমবিবর্তন প্রক্রিয়া (Mechanism of Evolution)

ডারউইন ও তার অনুসারি নব্য-ডারউইনবাদীদের মতে প্রাকৃতিক নির্বাচন (1. pre-eminence of Natural Selection) হলো (লক্ষ্য-উদ্দেশ্যহীন, এলোপাথাড়ি) বিবর্তনের মাধ্যমে প্রাণবিকাশের প্রধান নিয়ামক। মাধ্যমিক পাঠ্যবইয়ের ভাষ্যে, 'যুগ-যুগান্তর ধরে নির্বাচিত করে করে প্রকৃতি প্রাণি ও উদ্ভিদের নতুন প্রজাতি সৃষ্টি করে।' (জীববিজ্ঞান। নবম-দশম শ্রেণি, ২০১৯) উচ্চমাধ্যমিক পাঠ্যবইয়ের ভাষায়, 'যুগ যুগ ধরে প্রকৃতির মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে প্রাণি ও উদ্ভিদের **নতুন নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয়।**' (গাজী আজমল ও গাজী আসমত, ২০১৯) কিন্তু সমস্যা হলো ডারউইন তার সময়ে জীবন-সংগ্রামে যোগ্যতমের টিকে যাওয়ার কথা বললেও, কীভাবে উপযুক্ত প্রকরণের উদ্ভব হয় তা দেখাতে পারেননি। একই প্রজাতির বিভিন্ন সদস্যের যে পার্থক্য দেখা যায় তার ভিত্তিতে নতুন প্রজাতি সৃষ্টির সম্ভাবনা খুবই কম। সোজা কথায়—ডারউইন যোগ্যতমের আবির্ভাবের ব্যাখ্যা দিতে পারেননি! (আজমল ও আসমত, ২০১৯; নূর-ই-পারভিন খানম ও অন্যান্য, ২০১৯)

> "কোনো যোগ্যতম প্রাণির টিকে থাকা হয়তো প্রাকৃতিক নির্বাচন দিয়ে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। কিন্তু সেই যোগ্যতম প্রাণির উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা যায় না।"
>
> - হুগো দে ভ্রিস
> জিনতত্ত্ববিদ

অগাস্ট ভাইজম্যান নব্য-ডারউইনবাদের গোড়াপত্তনের সময় প্রস্তাব করেন, জীবদেহে পরিবেশ থেকে উদ্ভূত বাহ্যিক প্রভাব বংশানুসৃত হয় না। সহজ ভাষায়—পরিবেশের প্রভাবে দেহকোষে যে বদল আসে তা বংশধরদের মাঝে সঞ্চারিত হয় না; কেবল জননকোষের পরিবর্তন বংশধরদের মাঝে সঞ্চারিত হবে। অর্থাৎ দেহকোষে পরিবর্তনের প্রভাব থেকে জননকোষ মুক্ত; একে বলা হয় ভাইজম্যান বাধা (2. Weismann Barrier)। ল্যামার্কের ধারণাকে ভুল প্রমাণ করতে গিয়ে ভাইজম্যান ইঁদুর নিয়ে যে পরীক্ষা করেছিলেন, তার ফলাফল থেকে তিনি উপরিউক্ত সিদ্ধান্তে আসেন। মজার ব্যাপার হলো, আমরা কেউই এই সত্য জানি না যে—ভাইজম্যানের পরীক্ষার পদ্ধতিই ভুল ছিল! (ডেনিস নোবেল, ২০১৭)

ভাইজম্যান আরও মত দেন, জননকোষে-ঘটা-পরিবর্তন হতে হবে কেবলই জিন পর্যায়ে (3. gene-centred perspective); যা কিনা এলোমেলো ও উদ্দেশ্যহীন (4. random genetic variation)। কেবল জিন-পর্যায়ে-ঘটা এলোপাথাড়ি পরিবর্তনই বংশানুসৃত হবে (5. genetic inheritance)। এই সকল বদল বা মিউটেশন ঘটবে খুব মন্থর গতিতে, অল্প অল্প করে (6. gradualism)।

পরিবেশের সাথে মানিয়ে চলতে গিয়ে একই প্রজাতি বা প্রকরণে ঘটে-চলা পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করা যায়। কিন্তু এক প্রজাতি থেকে নবকাঠামো-সম্পন্ন ভিন্ন প্রজাতির প্রস্তাবিত আবির্ভাব বা ম্যাক্রোবিবর্তন প্রক্রিয়া লোকচক্ষুর অন্তরালবর্তী ও

www.QuranerAlo.net

লক্ষ লক্ষ বছরের ব্যাপার। সেজন্য কারও পক্ষেই আন্তঃপ্রজাতি রূপান্তর স্বচক্ষে দেখা সম্ভব না। (ব্রায়ান ও ডেবোরাহ চার্লসওর্থ, ২০১৭) তাই নব্য-ডারউইনবাদীরা অনুমান করে নেয় একই প্রজাতির মাঝে বেঁচে থাকার সংগ্রামে যে পরিবর্তন আসে, তা দিয়েই হয়তো ম্যাক্রোবিবর্তন (7. macroevolution) ব্যাখ্যা করা যাবে। নব্য-ডারউইনবাদের অন্যতম পুরোধা থিওডসিয়াস ডবঝান্স্কি-র ভাষ্যে (থিওডসিয়াস ডবঝান্স্কি, ১৯৮২) :

> ... আমাদের বর্তমানের জ্ঞান ব্যবহার করে অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাইক্রো ও ম্যাক্রোবিবর্তনের মাঝে সমতার চিহ্ন বসাতে হয়েছে। আমরা এই অনুমান নিয়ে এগোতে চাই।

চমকপ্রদ ব্যাপার হলো, নব্য-ডারউইনবাদ যে বুনিয়াদি অনুমানগুলোর উপর দাঁড়ানো (১-৭) তার সব ক'টি বিগত কয়েক যুগের বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ভুল প্রমাণিত হয়েছে! বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানী প্রফেসর ডেনিস নোবেল স্বীয় গবেষণার আলোকে বলেন (ডেনিস নোবেল, ২০১৩):

> বিবর্তন তত্ত্ব ইতোমধ্যে অনিশ্চয়তার দোলাচলে আছে। আমি গবেষণাপত্রে দেখাব যে, মডার্ন সিন্থেসিস (যাকে অনেক সময় নব্য-ডারউইনবাদও বলা হয়)—এর কেন্দ্রীয় অনুমানগুলোর সব ক'টি ভুল প্রমাণিত হয়েছে।

যেমন দেখা গেছে, ভাইজম্যান বাধা আর কার্যকর নয়; ভেঙে পড়েছে এই বা (এম.এ. সুরানি, ২০১৬) সাম্প্রতিক এক গবেষণায় মনে হচ্ছে, বর্তমানের ৯০ ত প্রজাতি ভূতাত্ত্বিক স্কেলে খুব অল্প সময়ের মাঝেই পৃথিবীতে এসেছে; এর মধ্যে মানুষ আছে! ব্যাপারটি বিস্ময়কর। কারণ এ থেকে বোঝা যাচ্ছে খুব মন্থর গতিতে, অল্প অল্প করে মিউটেশন ঘটে বিবর্তন এগিয়েছে—এই দাবি আর ধোপে টিকছে না! (মার্ক স্টিকল ও ডেভিস থেলার, ২০১৮) গবেষকদের একজন জানান, 'গবেষণার ফল দেখে আমি হতভম্ব হয়ে গেছি! আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি এই ফল বাতিল করতে!' কেন? কারণ বিবর্তনের প্রচলিত ধারণার সাথে খাপ খায় না তাই! কালের আবর্তে নব্য-ডারউইনবাদের ভিত্তিগুলো একে একে ভেঙে যাওয়ার ফলে এই তত্ত্বকে এখন আর বিবর্তনের সর্বজনীন রূপরেখা হিসেবে গ্রহণ করা যাচ্ছে না। (ডেভিড ডেপু ও ক্রস ওয়েবার, ২০১১) বইয়ের স্বল্প পরিসরে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই। তবে যেহেতু পাঠ্যবইয়ে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয় বলা হচ্ছে, তাই এই দাবি নিয়ে কিছু আলোচনা করা দরকার।

প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন প্রজাতির সৃষ্টি বুঝতে হলে আগে জানতে হবে—প্রজাতি কাকে বলে। মজার ব্যাপার হলো, প্রজাতির সংজ্ঞা নিয়ে বিজ্ঞানীরা আজ পর্যন্ত একমত হতে পারেননি! এ নিয়ে বিস্তর বিতর্ক চলে আসছে বিজ্ঞানীদের মাঝে। এখন পর্যন্ত প্রজাতির সংজ্ঞা প্রায় ২৬-২৭টি! (জন উইলকিনস, ২০০৯) নব্য-ডারউইনবাদের জনকরাও প্রজাতির ধারণা নিয়ে নিজেদের মাঝে ঝগড়া করেছেন।

www.QuranerAlo.net

সচরাচর পাঠ্যবইয়ে বলা হয়—যদি দুই জীবের অন্তঃপ্রজননের মাধ্যমে বংশধরের জন্ম হয় এবং সেই বংশধরের মাঝেও প্রজননের ক্ষমতা থাকে, তা হলে জীব দুটি একই প্রজাতির্ভুক্ত। এটি হলো বায়োলজিক্যাল প্রজাতি ধারণা। এই ধারণাকে ভিত্তি ধরে বলা হয় প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় সালামান্ডার বা ফিঞ্চ পাখির নতুন প্রজাতি আবির্ভাব হয়ে গেছে। কিন্তু প্রজাতির অন্যান্য সংজ্ঞা—যেমন ইকোলজিক্যাল প্রজাতি ধারণা অনুযায়ী এরা প্রকরণের মধ্যে পড়ে, নতুন প্রজাতি হয় না!

আরও মজার ব্যাপার হলো, বায়োলজিক্যাল প্রজাতি ধারণা মেনে নিলে অনেক স্তন্যপায়ী প্রজাতিকে আর স্বতন্ত্র প্রজাতি বলে দাবি করা যায় না; প্রকরণ গণ্য করতে হয়। দেখা গেছে বিভিন্ন প্রজাতির বেবুন, ভালুক, চিতা, নেকড়ে-বুনো কুকুর এরা নিজেদের মাঝে আন্তঃপ্রজনন করতে পারে। পাখিদের প্রায় ১৬% প্রজাতি বন্য পরিবেশে আন্তঃপ্রজননের মাধ্যমে উর্বর বংশধর তৈরি করে। এতদিন ধরে তোমরা শুনে এসেছ ঘোড়া আর গাধার আন্তঃপ্রজননের ফলে যে খচ্চর বা অশ্বতর জন্ম হয়, তার কোনো বাচ্চাকাচ্চা হয় না। কিন্তু অবাক করার মতো ব্যাপার হলো, খচ্চরও বাচ্চা দিয়েছে এমন রেকর্ড অন্তর্জাল ঘুরলেই চোখে পড়ে! (ন্যানসি লফহম, ২০০৭) সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, যে সংজ্ঞা অনুযায়ী বলা হয় নতুন প্রজাতি আবির্ভূত হয়েছে সেটাই বিতর্কিত!

এখন আসা যাক প্রাকৃতিক নির্বাচনের দিকে। প্রাকৃতিক নির্বাচন আদৌ নতুন প্রজাতির আবির্ভাব ব্যাখ্যা করতে পারে কিনা তা নিয়েও বিজ্ঞানীরা সংশয়ে আছেন বহু আগে থেকেই। যদিও প্রচলিত বইপত্রে বলা হয় প্রাকৃতিক নির্বাচন দিয়েই সমগ্র প্রাণ, এর বৈচিত্র্য, জটিলতা ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু বাস্তবতা হলো, প্রাকৃতিক নির্বাচন শুধু ভ্যারিয়েশন বা মাইক্রোবিবর্তন ব্যাখ্যা করতে পারে। নব-কাঠামোসম্পন্ন প্রজাতির উদ্ভব ব্যাখ্যা করতে পারে না; শুরুতেও পারেনি, এখনও পারে না! প্রস্তাবিত নতুন প্রজাতি আবির্ভাবের সবগুলো প্রক্রিয়াকে সহজেই মাইক্রোবিবর্তনের কাতারে ফেলা যায়। কারণ, প্রতিটি ক্ষেত্রেই কোন বড়োমাত্রার জেনেটিক পরিবর্তন লক্ষ করা যায় না। বড়োজোর একই গণের অন্তর্গত একাধিক প্রজাতি তৈরির কিছু নমুনা মিলতে পারে; যেগুলোকে প্রকরণের কাতারেও ফেলা যায়।

অনেক বিবর্তনবাদী জীববিদ প্রজাতির উদ্ভবে প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রস্তাবিত ভূমিকা মেনে নেননি। মাইক্রোবিবর্তনের প্রক্রিয়া দিয়ে যে ম্যাক্রোবিবর্তন ব্যাখ্যা করা যায় না—এ ব্যাপার নিয়ে বিজ্ঞানীদের অন্দর-মহলে বহু আগে থেকেই কানাঘুষা চলে আসছে। (স্কট গিলবার্ট এট এল., ১৯৯৬) যদিও জনসম্মুখে তারা এ নিয়ে নীরব

> "চায়নাতে আমরা ডারউইনের সমালোচনা করতে পারি, কিন্তু সরকারের সমালোচনা করতে পারি না। আর আমেরিকাতে তোমরা সরকারের সমালোচনা করতে পারো, কিন্তু ডারউইনের সমালোচনা করতে পারো না।"
>
> - জে. ওয়াই. চেন
> ফসিলবিদ

www.QuranerAlo.net

থাকেন! (সুজান মাজুর, ২০১০) ক্যারিয়ার নিয়ে ঝামেলায় জড়াতে চান না। তাদের মাঝে এক-দুইজন যারা মুখ খুলেছেন, তারা অন্য বিবর্তনবাদীদের গালমন্দের শিকার হয়েছেন। তবে বিবর্তনবিদ্যার চৌহদ্দিতে এমন বিদ্রোহীর সংখ্যা বেড়ে চলেছে কয়েক দশক ধরে। যেমন: বিবর্তনবাদী জীববিদ জেমস শ্যাপিরো গবেষণার ভিত্তিতে জোর দিয়ে বলেছেন (জেমস শ্যাপিরো, ২০১১):

> ডারউইন যে দাবি করেছিলেন, সেই প্রাকৃতিক নির্বাচনের দ্বারা কখনোই নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয়নি। এই বিষয়টা খেয়ালে রাখা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

তোমরা পাঠ্যবইতে জীববিদ লিন মার্গুলিস-এর নাম পড়েছ। (জীববিজ্ঞান। নবম-দশম শ্রেণি, ২০১৯) ফাইভ কিংডম ক্লাসিফিকেশনকে পরিমার্জনের জন্য উনার সুনাম আছে। (লিন মার্গুলিস, ১৯৭৪) তিনিও বুঝতে পেরেছিলেন প্রাকৃতিক নির্বাচন দিয়ে আসলে প্রজাতির উদ্ভব ব্যাখ্যা করা যায় না; তাই তিনি বিকল্প তত্ত্ব প্রস্তাব করেছিলেন। এক সাক্ষাৎকারে তিনি অকপটে জানিয়েছেন (ডিক টেরেসি, ২০১১):

> প্রাকৃতিক নির্বাচন [বিরাজমান প্রজাতি থেকে] বেছে নিতে পারে, হয়তো বজায়ও রাখতে পারে। কিন্তু নতুন প্রজাতি তৈরি করতে পারে না। ... নব্য-ডারউইনবাদীরা বলতে চায়, মিউটেশনের দ্বারা জীবে পরিবর্তন আসার মাধ্যমে নতুন প্রজাতি তৈরি হয়। আমাকে বারবার শেখানো হয়েছে যে, এলোপাথাড়ি মিউটেশন জমে জমে একসময় নতুন প্রজাতি তৈরি হয়। আমিও তাই বিশ্বাস করতাম, কিন্তু যখন প্রমাণের খোঁজে নামলাম— আমার বিশ্বাস উবে গেল।

মার্গুলিসের তত্ত্ব যদিও অনেকেই মেনে নেয় নি। তবে তার অভিজ্ঞতা থেকে আরেকটি বিষয় স্পষ্ট হয়, সেটা হলো বিজ্ঞানীদের মাঝে গ্রুপ থিংকিং-এর প্রবণতা। অনেককে বলতে দেখা যায়—আমেরিকার ৯৮% বিজ্ঞানী বিবর্তনকে সঠিক মনে করেন! এদের ধারণা—বিবর্তন তত্ত্ব নিশ্চিত সত্য বলেই অধিকাংশ বিজ্ঞানী এর পক্ষে ভোট দিয়েছেন। আফসোসের বিষয় হলো, চিন্তার দুর্বলতার কারণে এরা যে বেশ ক'টি অপযুক্তিতে জড়িয়ে পড়ে (ad ignorantium, ad verecundiam, ad populum ইত্যাদি), নিজেরাই তা বুঝে উঠতে পারে না। বিজ্ঞানীদের ঐকমত্য কোনো বৈজ্ঞানিক বিষয় নয়, বরং সামাজিক বিষয়! বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত বদলের সাথে সাথে তাদের সমর্থনও বদলে যায়। (হেলঘ ক্রাঘ, ২০১৯) তা ছাড়া, কোনো তত্ত্বের প্রতি বিভিন্ন ফিল্ডের বিজ্ঞানীদের নিরঙ্কুশ সমর্থন থাকা মানে এই না যে—তারা ব্যক্তি পর্যায়ে সেই তত্ত্ব খুব ভালো করে খতিয়ে দেখেছেন। বিজ্ঞানের প্রতিটা শাখা এতটাই বিস্তৃত যে নিজের কর্ম-পরিসরের বাইরে বিজ্ঞানীরা খুবই কম জানেন। এমনকি স্বীয় ফিল্ডের অনেক ক্ষেত্রেই তাদেরকে প্রচলিত মত ধরে আগাতে হয়। স্বীয় ফিল্ডের বাইরের কোনো বিষয়ে তারা ওই ফিল্ডের বিজ্ঞানীদের মাঝে প্রচলিত মতকেই মেনে নেন; যদিও তারা

www.QuranerAlo.net

সে-সকল মতের ভিত্তি ও প্রামাণ্যতার বিষয়ে তেমন কোনো জ্ঞানই রাখেন না। (রিচার্ড লেউনটিন, ১৯৯৭) অন্য ফিল্ডের অধিকাংশ বিজ্ঞানী প্রচলিত বিবর্তন তত্ত্বের ভিত্তি ও প্রামাণ্যতা নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় পান না। ব্যক্তিজীবন, কর্মজীবনের ব্যস্ততার মাঝে ইচ্ছে করে ওঠাও মুশকিল। সর্বোপরি, বিজ্ঞানী হিসেবে প্রকৃতিবাদের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্যের কারণে তারা বিবর্তনের বাইরে কিছু ভাবার এখতিয়ার রাখেনও না।

এসব নিয়ে মুক্তভাবে ভাবতে শুরু করলে তারা নানা রকম সমস্যা খুঁজে পান। (ড. জন স্যনফোর্ড ও ক্রিস্টফার রুপ, ২০১৯) যদিও এদের সংখ্যা অল্পই বলতে হবে। এই সংখ্যালঘুদের মাঝে যারা মুখ খোলার সাহস করেন, তাদের নানা অপমান-গালমন্দ সইতে হয়। যেমন কিছুদিন আগে খ্যাতনামা কম্পিউটার গুরু ডেভিড গার্লেন্টার ডারউইনের ধারণার সীমাবদ্ধতা নিয়ে মুখ খুলেছেন। (ডেভিড গার্লেন্টার, ২০১৯) ব্যস, শুরু হয়ে গেল অপমানের বহর! অবস্থা দেখে তিনি দুঃখ করে বলেছেন (জেনিফার কাবানি, ২০১৯):

> ডারউইনবাদকে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে চ্যালেঞ্জ করতে চাইলে তোমাকে জীবন হাতে নিয়ে মাঠে নামতে হবে। কারণ ওরা তোমাকে ধ্বংস করে ফেলবে। ... অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, আমি তাদের ধর্মানুভূতিতে আঘাত হেনেছি। এমন উন্মত্ত আচরণের জন্য আমি তাদের দোষ দিই না। বিবর্তন তো তাদের কাছে ছোটোখাটো কিছু না।

এসবের কিছুই তোমার পাঠ্যপুস্তকে নেই, প্রচলিত বিজ্ঞান বইয়েও নেই। সেখানে শুধু বিজ্ঞানের জয়জয়কার, বিবর্তনের বন্দনা। বিবর্তনে বিশ্বাস পাকাপোক্ত করানোর জন্য কেউ কেউ বানোয়াট কথা বলতেও পিছপা হন না! সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার হলো এমন কথা টেক্সটবইতেও বিদ্যমান! মাধ্যমিক শ্রেণির বিজ্ঞান বইতে বলা হয়েছে (বিজ্ঞান । নবম-দশম শ্রেণি, ২০১৯):

> পৃথিবীর সব বিজ্ঞানীকে নিয়ে একবার একটা জরিপ নেওয়া হয়েছিল, জরিপের বিষয়বস্তু ছিল পৃথিবীর নানা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ কোনটি। বিজ্ঞানীরা রায় দিয়ে বলেছিলেন, বিজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব হচ্ছে ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব।

অন্তর্জালের জগৎ চষে বেড়িয়েও এমন কোনো জরিপের খোঁজ পাওয়া যায় না। সব বিজ্ঞানীকে নিয়ে জরিপ করা তো আর চাট্টিখানি কথা না! এমন খবর মিডিয়া ছেড়ে দেবে? একটা হাড্ডি আবিষ্কার হলেও তিন লাফ দিয়ে তারা সংবাদ ছেপে বেড়ায়! না কোনো আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে এ নিয়ে খবর পাওয়া যায়, আর নাই-বা সেই জরিপের কোনো দলিল মেলে। বাস্তবতা বলো, আমজনতার কাছে বিবর্তনকে প্রমাণ করার জন্য নানা ছলচাতুরীর আশ্রয় নেওয়া হয়। নানাবিধ শিশুতোষ গল্পকে একেবারে ফ্যাক্ট বানিয়ে প্রচার করা হয়। কিন্তু কেন করা হয়? কেন মিথ্যের এই আঁধার?

কারণটা তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে।

www.QuranerAlo.net

বুদবুদ রহস্য

মনে হয় প্রাণ এক দূর স্বচ্ছ সাগরের কূলে
জন্ম নিয়েছিল কবে;
পিছে মৃত্যুহীন জন্মহীন চিহ্নহীন
কুয়াশার রে-ইঙ্গিত ছিল –
সেই সব ধীরে ধীরে ভুলে গিয়ে অন্য এক মানে
পেয়েছিল এখানে ভূমিষ্ঠ হ'রে– আলো জল আকাশের টানে;
কেন যেন কাকে ভালোবেসে। [যাত্রী – জীবনানন্দ দাশ]

সৌরজগতের এই তৃতীয় গ্রহটি অন্যসব গ্রহ থেকে ভিন্ন; রহস্যময় ও বৈচিত্র্যে ঠাসা। কারণ কেবল এই গ্রহটিতেই প্রাণের বিকাশ হয়েছে। প্রায় এক লক্ষ বড়োসড় গ্যালাক্সি চুলচেরা অনুসন্ধান করেও কোনো প্রাণের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি! প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর, সদা হাস্যময়ী আমাদের এই নিবাস। কেন ও কীভাবে কেবলমাত্র এই গ্রহে প্রাণের উৎপত্তি ও বিকাশ হলো?

কীভাবে পৃথিবীর বুকে এত অবাক-করা প্রাণবৈচিত্র্য আবির্ভূত হলো তা নিয়ে ভাবনার অন্ত নেই। আগে প্রাণকে খুব সরল কিছু ভাবা হতো। এককোষী এমিবা বা ব্যাকটেরিয়া কতই-বা জটিল হবে? সোজাসাপটা কিছুই হওয়া উচিত—প্রোটোপ্লাজমের বুদবুদ টাইপ কিছু। তাই কিছু মানুষ কল্পনা করল প্রাণ হয়তো পৃথিবীর বুকেই আচমকা তৈরি হয়ে গেছে। কপাল ভালো ছিল বলতে হবে! বন্ধুবর জোসেফ হুকারকে লেখা এক চিঠিতে চার্লস ডারউইন তার এক স্বপ্নের কথা তুলে ধরেছিলেন। তিনি একবুক আশা নিয়ে কল্পনার মালা গেঁথেছিলেন—হয়তো কোনো এক উষ্ণ জলাশয়ে (warm little pond) প্রাকৃতিক ক্রিয়ার ফলে আচমকা প্রাণ উদ্ভব হয়ে গিয়েছিল। (ডারউইন, ১৮৭১)

এটি মূলত প্রকৃতিবাদের বিশ্বাসপ্রসূত অনুমান। এহেন বিশ্বাসের কারণেই বিজ্ঞানীরা কেবল জাগতিক উপায়ে প্রাণ আবির্ভাবের ব্যাখ্যা দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। উচ্চ-মাধ্যমিক শ্রেণির বহুল পঠিত উদ্ভিদবিজ্ঞান বইতে দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বলা হয়েছে, 'প্রথম কোষ **অবশ্যই** *জড় উপাদান থেকে [স্রেফ জাগতিক প্রক্রিয়ায়] তৈরি হয়েছিল।*' (ড. মোহাম্মদ আবুল হাসান, ২০১৯) ডারউইনের প্রস্তাবনার বেশ পরে, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে অনুপ্রাণিত হয়ে বিজ্ঞানী অপারিন ও আরেক বিজ্ঞানী হ্যালডেন তার কল্পনাকে অনুকল্পে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন। (পিটার জে. বোলার, ২০০৩) তারা ধারণা করেন, আদি পৃথিবীর

www.QuranerAlo.net

বায়ুমণ্ডলে প্রচুর পরিমাণ মিথেন (CH_4), অ্যামোনিয়া (NH_3), হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S), জলীয় বাষ্প, নাইট্রোজেন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস ছিল; কিন্তু কোনো অক্সিজেন ছিল না। অহরহ আগ্নেয়গিরির উদ্‌গিরণের ফলে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি ঘটত। (জীববিজ্ঞান, বিজ্ঞান। নবম-দশম শ্রেণি, ২০১৯; ড. নিশীথ কুমার পাল, ২০১৪) এমন পরিবেশে বিদ্যুতের চমকানির ফলে ও অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে কাকতালীয়ভাবে হয়তো জলজ পরিবেশে প্রাণের মৌলিক উপাদান তৈরি হয়ে গিয়েছিল। আর তা থেকে হয়তো বা এলোমেলো প্রক্রিয়ায় ঘটনাক্রমে প্রাণের আবির্ভাব হয়েছিল। এই বিজ্ঞানীরা মনে করেছিলেন প্রাণ কেবলই রসায়নের খেল।

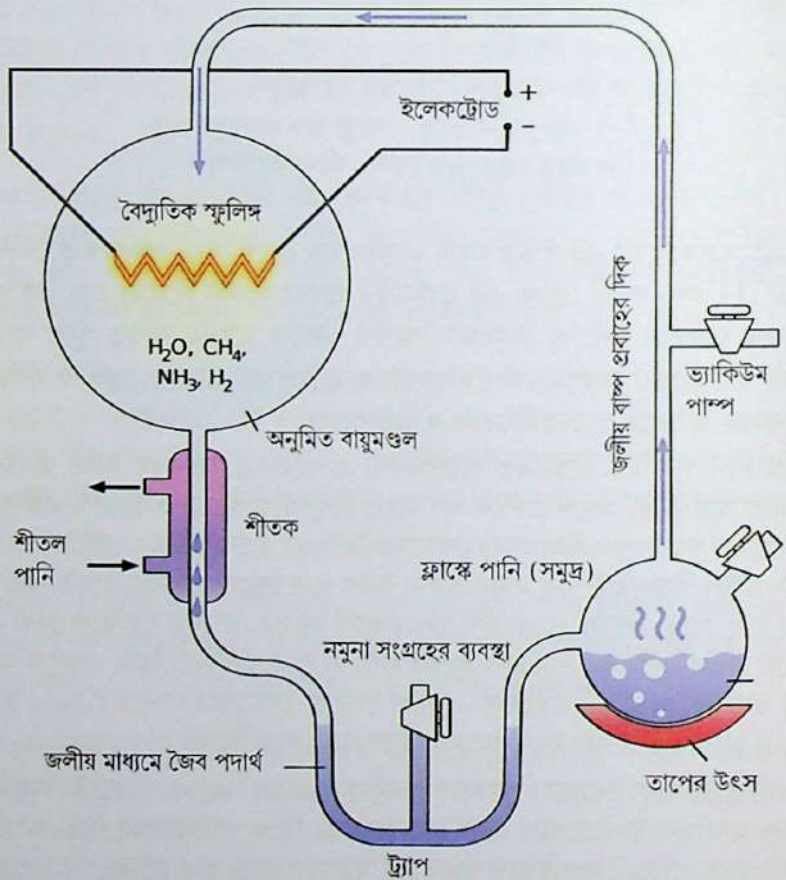

মিলার-উরি পরীক্ষার মডেল। প্রাণের উৎপত্তির রহস্য সমাধানে এই পরীক্ষাকে প্রচলিত বিজ্ঞান বইপত্রে ব্যাপকহারে উল্লেখ করা হয়। আশ্বাস দেওয়া হয় প্রাণের উৎপত্তির রহস্য সমাধান হয়ে গেছে! আসলেই কি?

মূলছবি : উইকিপিডিয়া

www.QuranerAlo.net

Contents

১৯৫২ সালে স্ট্যানলি মিলার তার উস্তাদ হ্যারল্ড উরি'র ল্যাবরেটরিতে এই অনুকল্পের সমর্থনে প্রমাণ খুঁজতে নামলেন। আদি পৃথিবীর অনুমিত বায়ুমণ্ডল বানালেন ল্যাবরেটরিতে। কাঁচের আবদ্ধ একটি গোলকে পানি, মিথেন, অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন, একসাথে নিয়ে পরীক্ষা শুরু করেন। কোনোভাবেই যাতে গোলকে অক্সিজেন না থাকতে পারে সে ব্যবস্থা করা হলো। এরপর পানিকে তাপ দিয়ে জলীয় বাষ্প বানালেন, সেটাকে আবার শীতল করে তরল করতে থাকলেন। ইলেকট্রোডের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক ডিসচার্জ দিয়ে বজ্রপাতের মতো বানালেন সেখানে। সপ্তাহ-জুড়ে চলল এই খেলা। তারপর যে তলানী জমা হলো সেটা নিয়ে চলল ঘষামাজা। (একটা বিষয় খেয়াল করো, এইসব ঘষামাজার সুযোগ কিন্তু আদি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ছিল না। যাই হোক) পরে গ্লাইসিন ও অ্যালানিন নামের দুটি সরলতম অ্যামিনো-এসিডের দেখা মিলল। ব্যস, চারিদিকে হইচই পড়ে গেল! এলোমেলো প্রক্রিয়ায় প্রাণ আসা সম্ভব হতেও পারে। (যদিও পরীক্ষাটি কিন্তু এলোমেলো ছিল না, ল্যাবরেটরিতে বেশ মাপজোখ করেই পরীক্ষা সাজানো হয়েছিল)

কিন্তু ১৯৭০–৮০'র দিকে জানা গেল, আদি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল আসলে ভিন্ন ছিল। সেখানে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, কিছু কার্বন মনোঅক্সাইড, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন ও জলীয় বাষ্প ছিল। হাইড্রোজেন হালকা হওয়ায় উড়ে চলে যেত। ফলে কার্বন ও নাইট্রোজেন বিজারিত হয়ে মিথেন ও অ্যামোনিয়া গঠন সম্ভব ছিল না। যদি গঠিত হতোও সেক্ষেত্রে বেশিক্ষণ এদের অস্তিত্ব থাকত না, সে পরিবেশে খুব দ্রুতই ভেঙে যেত। (কেভিন জ্যানলে এট এল., ২০১০)

তা ছাড়া জলীয় বাষ্প সালোকবিশ্লেষণের মাধ্যমে অক্সিজেন বায়ুমণ্ডলে মুক্ত হওয়ারও কথা। কিন্তু মিলার বারবার অক্সিজেন থাকার সম্ভাবনা নাকচ করেছেন কারণ এই মুক্ত অক্সিজেন প্রাণের মৌলিক উপাদান গঠনে প্রতিবন্ধকস্বরূপ। সামান্য অক্সিজেন থাকলেও প্রাণের মৌলিক উপাদান গঠন সম্ভব নয়! প্রচলিত বইপত্রে বলা হয়—২.৪ বিলিয়ন বছর আগে থেকে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন আসা শুরু হয়। (ড. জাফর ইকবাল, ২০১৮) কিন্তু পরে বোঝা যায়, পৃথিবীর প্রায় শুরু থেকেই বায়ুমণ্ডলে মুক্ত অক্সিজেন ছিল! অর্থাৎ প্রাণের অনুমিত সূচনাকাল থেকেই মুক্ত অক্সিজেন বায়ুমণ্ডলে উপস্থিত ছিল। (সাইন্সডেইলি, ২০১৬) অথচ এখনও পাঠ্যবই ও বিজ্ঞানবইপত্রে বলা হয়—আদি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে কোনো অক্সিজেন ছিল না! প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও বহুবছর ধরে এই বাস্তবতা অগ্রাহ্য করাকে স্রেফ 'অন্ধবিশ্বাস' বলে সমালোচনা করেছেন কতিপয় গবেষক! (হ্যারি ক্লেমি ও নিক বাধাম, ১৯৮২)

> "আগে প্রাণ এসেছে, না বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন এসেছে? আমাদের গবেষণা এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সমাধান দিচ্ছে—আগে বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন এসেছে।"
>
> - আউই ব্রান্ড
> ভূতত্ত্ববিদ

www.QuranerAlo.net

মিলার নিজেও বুঝেছিলেন তার পরীক্ষা সংকটে জর্জরিত। পরে ১৯৮৩ সালের দিকে ল্যাবরেটরিতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও কার্বন মনোঅক্সাইড নিয়ে তিনি পরীক্ষা করে দেখেছেন, এমন পরিবেশে স্রেফ গ্লাইসিন পাওয়া যায়। কিন্তু তার জন্য অতিরিক্ত হাইড্রোজেন ও মিথেন ঢোকাতে হয়েছিল। (মিলার ও গর্ডন, ১৯৮৩) যা আদি বায়ুমণ্ডলে থাকার কথা না। তা ছাড়া এই বিক্রিয়ার ফলে ফরমালডিহাইড ও হাইড্রোজেন সায়ানাইডও তৈরি হয়েছিল, যা প্রাণের জন্য নির্ঘাত বিষ! এগুলো দ্রুত সরানোর ফলে গ্লাইসিন উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু প্রকৃতিতে এগুলো সরানোর তো উপায় নেই! সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে, এমন পরিবেশে রাসায়নিক বিবর্তন অসম্ভব!

> "... অনেক বিজ্ঞানী [মিলারের] এই পরীক্ষাকে বাতিল ঘোষণা করেছেন, কারণ তারা দেখেছেন যে আদি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল মোটেই মিলার-উরি পরিচালিত পরীক্ষার মতো ছিল না।... মিলার নিজেও দেখেছেন—অক্সিজেনযুক্ত বায়ুমণ্ডলে জীবনের মৌলিক অণু তৈরি অসম্ভব।"
>
> - জন কোহেন
> *সাইন্স জার্নাল*

অথচ অবাক করার মতো ব্যাপার হলো, এসবের কিছুই পাঠ্যবই বা প্রচলিত বিজ্ঞান বইতে নেই! বরং একজন প্রফেসর আশ্বাস দিয়েছেন, '*ওপারিন এবং হলডেন প্রস্তাবিত জীবনের রাসায়নিক বিবর্তন তত্ত্বটির বাস্তবতা অনেকটা প্রমাণিত হয়েছে।*' (ড. নিশীথ কুমার পাল, ২০১৪) মাধ্যমিক শ্রেণির পাঠ্যবইয়ে মিলার-উরি অনুমিত বায়ুমণ্ডলের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, '*এই যৌগ পদার্থগুলো মিলিত হয়ে অ্যামাইনো এসিড এবং নিউক্লিক এসিড (!) উৎপন্ন করে। ল্যাবরেটরিতে এই প্রক্রিয়াটি পরীক্ষা করে প্রমাণ করা হয়েছে।... জীবনের উদ্ভব তথা রাসায়নিক বিবর্তনের আরও কিছু সম্ভাব্য ব্যাখ্যা আছে, তবে উপরে উল্লিখিত ব্যাখ্যাটিই এখন পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকভাবে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য।*' (জীববিজ্ঞান। নবম-দশম শ্রেণি, ২০১৯) উচ্চ-মাধ্যমিক উদ্ভিদবিজ্ঞান বইতে একই পরীক্ষার কথা কয়েক লাইনে উল্লেখ করে শিক্ষার্থীদের আশ্বস্ত করা হয়েছে। না মিলারের পরীক্ষার বিবরণ আছে, আর নাই-বা মিলারের পরীক্ষার ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (ড. আবুল হাসান, ২০১৯) প্রচলিত এক বিজ্ঞান বইতে এক লাফ দিয়ে বলা হয়েছে, '*মিলার-উরি একটি যুগান্তকারী পরীক্ষা করে দেখালেন, পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশেই জীবন্ত প্রাণি তৈরির জৈব উপাদান তৈরি হতে পারে।*' (জাফর ইকবাল, ২০১৮)

> "মিলারের পরীক্ষা আদি পৃথিবীর প্রাণপূর্বক রসায়নের অনুরূপ হওয়ার কথা ছিল। তবে, তার এই পরীক্ষা এখন আর কেউই সঠিক মনে করে না।"
>
> - ফ্রিম্যান ডাইসন
> তাত্ত্বিক পদার্থবিদ ও গণিতবিদ

মিলার-উরির পরীক্ষা যে বহু আগেই বাতিল সাব্যস্ত হয়েছে এর কোনো নামগন্ধও এই বইগুলোতে নেই!

www.QuranerAlo.net

Contents

প্রাণ উৎপত্তির স্থান হিসেবে আরেকটি মত হলো, প্রাণ হয়তো সমুদ্রে প্রথম উৎপন্ন হয়েছিল। মাধ্যমিক জীববিজ্ঞান বইতে বলা হয়েছে, 'জীবনের উৎপত্তি যে প্রথমে সমুদ্রের পানিতে হয়েছিল, এ সম্পর্কে কোনো দ্বিমত নেই।' (!) অথচ বাস্তবতা হলো, বহু আগে থেকেই বিজ্ঞানীদের মাঝে এই ধারণা নিয়ে বিতর্ক হয়ে আসছে। এই ধারণার সমস্যাগুলো নিয়ে যথেষ্ট গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে। (নোরিও কিতাদাই ও শিগেনোরি মারুইয়ামা, ২০১৮) মিলার-উরি'র পরীক্ষা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে পরবর্তীকালে বেশ কয়েকবার এমন পরীক্ষা চালানো হয়েছে। নানা মুখরোচক গল্প এসেছে খবরের পাতায়। কিন্তু লাভ খুব একটা হয়নি। কসমোকেমিস্ট শেরউড স্যাং নাসা-র এক ওয়ার্কশপ শুরু করেছিলেন এই বলে যে, রাসায়নিক বিবর্তন থেকে প্রথম কোষ আসা বিষয়ে যা বলা হয় সেগুলো স্রেফ অলীক কাহিনি! (ল্যান্ডওয়েবার ও কাট্য, ১৯৯৮) সাম্প্রতিক এক গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে (নোরিও কিতাদাই ও শিগেনোরি মারুইয়ামা, ২০১৮):

> এখন পর্যন্ত জাগতিক প্রক্রিয়ায় প্রাণের উৎপত্তির সকল ধাপের ব্যাখ্যায় কোনো গ্রহণযোগ্য দৃশ্যকল্পের দেখা মেলেনি।

দুঃখের বিষয় হলো, এসব কথা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছায় না! তা ছাড়া গভীর চিন্তা করলে বোঝা যায়, এহেন প্রস্তাবনা বাস্তবিক নয়। কপালফেরে তৈরি-হয়ে-যাওয়া কিছু ইট থেকে জাতীয় সংসদ-ভবন বা বুর্জ আল-আরব বিল্ডিং আপনা-আপনি তৈরি হয়ে যাওয়ার কিচ্ছা কি তোমরা কেউ বিশ্বাস করবে? মাথা ঠিক থাকলে করার কথা না।

কোষ এত সহজ কিছু নয়। কোষকে বরাবরই অবমূল্যায়ন করা হয়েছে, এখনও করা হয়। (ব্রুস অ্যালবার্ট, ১৯৯৮) বিশ শতকে কোষ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান ব্যাপক বৃদ্ধি পাওয়ায় আমরা বুঝতে পেরেছি কোষ আসলে অত্যন্ত জটিল মলিকুলার মেশিন। একেবারে সাদাসিধা একটা কোষও বিস্ময়কর এক ফ্যাক্টরি! এমন এক ফ্যাক্টরি মানুষ তৈরি করা তো দূরে থাক, কল্পনাতেও আনতে পারে না। কোষের মধ্যে যে কী অভাবনীয় ও জটিল কর্মযজ্ঞ চলে তার কিছু অনুমিত সরল এনিমেশন ভিডিও তৈরি করা হয়েছে। যা দেখলে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে হয়! (বায়োভিশন, ২০১১)

> "ব্যাকটেরিয়ার একদম সাধাসিধা কোষও অত্যন্ত জটিল একটি জিনিস। এটি হলো অতিক্ষুদ্র এক ফ্যাক্টরি। যাতে আছে হাজার-হাজার অতি সুচারুরূপে সন্নিবেশিত জটিল আণবিক যন্ত্রপাতি... মানুষের তৈরি যে-কোনো যন্ত্র থেকেও এটি বহু-বহু গুণে জটিল ..."
>
> - মাইকেল ডেন্টন
> জিনবিদ

এলোপাথাড়ি প্রক্রিয়ায় আপনা-আপনি কোষ তৈরি হওয়া তো দূরের কথা, স্রেফ একটা প্রোটিন তৈরির কথা ভাবা যাক চলো। তোমরা জানো প্রোটিন তৈরিতে বিশ প্রকারের এক শ'র বেশি অ্যামিনো এসিড লাগে। একেবারে সরলতম কোষের কাজ চালাতে অন্তত ২৫০-৩৫০ ধরণের প্রোটিন লাগে বলে জানা যায়। (সাইন্সডেইলি,

www.QuranerAlo.net

১৯৯৯) এখন মাত্র ১৫০ অ্যামিনো এসিডের ছোটোখাটো একটা প্রোটিন নিয়ে আমরা চিন্তা করি চলো। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হলো, শুধু প্রোটিন তৈরি হলেই হবে না, বরং কর্মক্ষম প্রোটিন তৈরি হতে হবে। হিসেব করে দেখা গেছে, এলোমেলো প্রক্রিয়ায় আকস্মিকভাবে মাত্র ১৫০ অ্যামিনো এসিডের একটা কর্মক্ষম প্রোটিন তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা $১/১০^{১৬৪}$! মানে সোজা কথায় অসম্ভব। এখন পুরো ২৫০টি প্রোটিন বিবেচনা করলে এই সম্ভাবনা দাঁড়ায় অন্তত $১/১০^{৪১০০০}$!! (স্টিফেন মায়ার, ২০০৯) দেখা গেছে, কোনো ঘটনা ঘটার সম্ভাব্যতা যদি $১০^{১৪০}$-এর মধ্যে একবার হয় এবং তা ঘটার জন্য মহাবিশ্বের সকল পার্টিকেল ও সকল সময় ব্যবহার করার সুযোগ দেওয়া হয়—তা হলে তাত্ত্বিকভাবে ঘটনাটি একবার হলেও ঘটতে পারে। কিন্তু, কোনো ঘটনা ঘটার সম্ভাব্যতা যদি $\leq ১/১০^{১৪১}$ হয়, তা হলে মহাবিশ্বের সকল পার্টিকেল ও সকল সময় ব্যবহার করেও উক্ত ঘটনা এলোপাতাড়ি প্রক্রিয়ায় একবারের জন্যও ঘটবে না। (ডেভিড অ্যাবেল, ২০০৯) সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, এলোমেলো প্রক্রিয়ায় কপাল ফেরে একটা কর্মক্ষম প্রোটিন তৈরি হয়ে যাবে এমন প্রস্তাবনা যুক্তিবিরোধী, কাল্পনিক! তাই অনেক বিজ্ঞানী নিজেরা স্রষ্টায় বিশ্বাস না করা সত্ত্বেও এই আকস্মিকভাবে প্রাণের উদ্ভব হওয়ার গালগল্প মেনে নেননি।

> "এখন পর্যন্ত আমাদের হাতে থাকা জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে কোনো সৎ মানুষ বলতেই পারেন – প্রাণের উৎপত্তি নির্ঘাত অলৌকিক ব্যাপার। প্রাণের শুরু হওয়ার জন্য অসংখ্য নিয়ামক আগে থেকেই প্রয়োজন।"
>
> - ফ্রান্সিস ক্রিক
> *DNA এর মডেল প্রণেতা*

ধীরে ধীরে যখন বোঝা গেল এলোমেলো প্রক্রিয়ায় আমিষ তৈরি হওয়া বা DNA তৈরি হওয়া সম্ভব না, তখন কেউ কেউ ভিন্ন প্রস্তাব দিলেন। তারা কল্পনা করলেন, আদি জীবন সম্ভবত সরল RNA থেকে এসেছিল। যা থেকে পরে প্রোটিন তৈরি হয়। এটাকে RNA World অনুকল্প নাম দেওয়া হলো।

এই অনুকল্প একগাদা অনুমানের-উপর-দাঁড়ানো। (রবার্টসন ও জয়েস, ২০১২) তা ছাড়া, RNA World কীভাবে এল তার কোনো সমাধান এখনও মেলেনি। কেউ কেউ অনুমান করেছেন, RNA-এর আগে অন্য কোনো যৌগ থাকতে হবে; সেটা থেকে হয়তো RNA আসতে পারে। তা ছাড়া RNA-এর মতো একটা জটিল গঠন কীভাবে আপনা-আপনি গঠিত হলো, কীভাবে নিজে নিজে রেপ্লিকিট হলো, কীভাবে RNA থেকে প্রাণ এল তার কোনো সুরাহা হয়নি আজও। (হ্যারল্ড বার্নহার্ড, ২০১২)

এর অনেক কারণ রয়েছে। যেমন : বেশি তাপমাত্রায় RNA-এর উপাদান গঠিত না হওয়া, RNA অস্থিতিশীল হওয়ায় খুব দ্রুতই ভেঙে যাওয়া, আগে থেকেই কর্মক্ষম রাইবোজাইম প্রোটিন উপস্থিত থাকার প্রয়োজনিয়তা ইত্যাদি। মিলার নিজেও স্বীকার করেছেন যে RNA দিয়ে কাজ হবে না।

www.QuranerAlo.net

এসবের কিছুই পাঠ্যপুস্তকে নেই; উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে এক লাইনে RNA World এর আলোচনা শেষ! (ড. আবুল হাসান, ২০১৯)

প্রাণ আসলে এতটাই জটিল যে, কপাল ফেরে হঠাৎ করে হয়ে গেছে এমন ভাবা যুক্তি ও জ্ঞানবিরোধী। তা ছাড়া DNA'র গঠন আবিষ্কারের পর এই সমস্যা আরও প্রকট আকার ধারণ করেছে। আমরা জানতে পেরেছি যে প্রাণ নিছক কিছু রাসায়নিক পদার্থের বিচলন নয়, বরং প্রাণ হলো বিপুল তথ্যের আধার!

অবাক হচ্ছ?

www.QuranerAlo.net

প্রাণের গান

আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে

DNA'র গঠন আবিষ্কারের ফলে আণবিক জীববিদ্যায় বিপ্লব ঘটে। জেমস ওয়াটসন ও ফ্রান্সিস ক্রিক DNA'র গঠনের দ্বিসূত্রক মডেল প্রস্তাব করেন। বলা হয়ে থাকে, ফ্রান্সিস ক্রিক নাকি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কোড ব্রেকারের কাজও করেছিলেন (অর্থাৎ শত্রুপক্ষের গুপ্তবার্তার মর্মোদ্ধার করা)। DNA'র গঠন আবিষ্কারের পর অভাবনীয় বিষয় উঠে আসে মানুষের সামনে। তোমরা তো DNA'র সম্পর্কে পড়েছ। তাও একটু বলি, কিছু অজানা কথাও থাকছে কিন্তু।

সুকেন্দ্রিক সজীব কোষের নিউক্লিয়াসে DNA অবস্থান করে। ব্যাকটেরিয়া-জাতীয় প্রাণিতে এটি সাইটোপ্লাজমেই থাকে, ওদের নিউক্লিয়াস নেই সেজন্য। বিজ্ঞানীরা মনে করেন বংশগতির প্রবাহে মূল ভূমিকা রাখে এই DNA। DNA হলো জৈবরাসায়নিক পদার্থ দিয়ে তৈরি ইয়া লম্বা প্যাঁচানো সূতা। কত লম্বা? বলা হয় তোমার শরীরে যত DNA আছে সেগুলোকে একের-পর-এক সাজিয়ে দড়ি বানালে যে দূরত্ব হবে, তা পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বের প্রায় দু শগুণের সমান! (যে শিন, ২০১৮) অবাক করার মতো ব্যাপার না! DNA গঠিত হয় অসংখ্য নিউক্লিওটাইড দিয়ে। ডিঅক্সিরাইবোজ সুগারের একদিকে ফসফেট ও অন্যদিকে ক্ষার যুক্ত হয়ে একেকটা নিউক্লিওটাইড তৈরি হয়। ক্ষারগুলো হলো এডেনিন, থাইমিন, সাইটোসিন, গুয়ানিন; এদের সংক্ষেপে A, T, C, G বর্ণগুলো দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। দেখা গেছে একটি অ্যামিনো-এসিডের সংকেত হিসেবে অন্তত তিনটা নিউক্লিওটাইড দরকার হয়। তিন-নিউক্লিওটাইডের ট্রিপলেটকে কোডন বলা হয়।

তোমরা পাঠ্যবইয়ে পড়েছো DNA'র কাজ হলো, মানুষের নানা বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করা। বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী DNA'র একটি ক্ষুদ্র একককে 'জিন' বলে। অনেকগুলো কোডন নিয়ে একেকটা জিন গঠিত হয়। সাধারণত বলা হয় DNA-তে থাকা সবগুলো জিনের সমষ্টি হলো জিনোম; কোনো প্রাণি কেমন বৈশিষ্ট্যের হবে তার ছক কাটা থাকে এই জিনোমে। মানুষের (হ্যাপ্লয়েড) জিনোম প্রায় ২৮০-৩৫০ কোটি ক্ষারযুগল নিয়ে গঠিত! কোষপ্রতি হিসেব করলে দেখা যাবে ৬০০ কোটি ক্ষারযুগল সুনির্দিষ্ট অনুক্রমে সাজানো! অন্যভাবে বললে আমরা বলতে পারি, DNA হলো প্রতিটি কোষে থাকা ছয় শ কোটি বর্ণ দ্বারা গঠিত এক মহা-উপন্যাস।

www.QuranerAlo.net

আগে ভাবা হতো কেবল DNA-তে থাকা তথ্যই জীবের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে, এবং এই বৈশিষ্ট্য কেবল DNA থাকা জিন দিয়েই বংশধরদের মাঝে সঞ্চারিত হয়। DNA-তে থাকা বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী সংকেতগুলোকে ট্রান্সক্রিপশান-নামক জটিল প্রক্রিয়ায় কপি করে নেয় mRNA নামক রাসায়নিক পদার্থ; এই প্রক্রিয়াটি চলে কোষের নিউক্লিয়াসে। mRNA এরপর কোষের নিউক্লিয়াস থেকে বেরিয়ে এসে জোট বাঁধে কোষের ভেতরে-থাকা প্রোটিন তৈরির অঙ্গাণু রাইবোসোমের সাথে। এর ফলে শুরু হয় আরেক জটিল প্রক্রিয়া, যার নাম ট্রান্সলেশান। এর ফলস্বরূপ সুনির্দিষ্ট ধারায় অ্যামিনো এসিড সজ্জিত হয়ে প্রোটিন তৈরি হয়। আর এই নানাবিধ প্রোটিন দিয়েই আমরা তৈরি! এই বহুল প্রচলিত ধারণা জীববিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় প্রত্যয় (central dogma of biology) নামে পরিচিত।

আগে বিজ্ঞানীরা মনে করতেন DNA'র কাজ কেবলই প্রোটিন তৈরির সংকেত বহন করা। তাই ভাবলেন DNA'র যে অংশে প্রোটিন তৈরির সংকেত নেই তার কোনো কাজ নেই, এগুলো স্রেফ আবর্জনা। বিজ্ঞানীরা অনুমান করলেন মানব-জিনোমের মাত্র ১-২ শতাংশ হয়তো প্রোটিন তৈরির সংকেত বহন করে (coding region), বাকি ৯৮ শতাংশই মূলত নিষ্ক্রিয় (non-coding region)। এই ৯৮%-কে তারা DNA-আবর্জনা (Junk DNA) বলে অবজ্ঞা করলেন। এসব আবর্জনা ঘাঁটাঘাঁটি বাদ দিয়ে ডিএনএ-র যে অংশ প্রোটিন কোড করে তা নিয়েই মেতে রইলেন! উচ্চমাধ্যমিক পাঠ্যবইয়ে ভাষায়, *'মানব-জিনোমে মাত্র ২ ভাগ জিন বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য প্রকাশে অংশগ্রহণ কে বাকি ৯৮ ভাগই জিনই নিষ্ক্রিয় থাকে। এদের জাংক DNA বলে।'* (আবুল হাসান, জু ২০১৯) বিবর্তনবাদীরা এটা শুনে মহাখুশি হলো। যদি পরম-বুদ্ধিমান স্রষ্টাই আমাদের তৈরি করে থাকেন তবে DNA ভর্তি এত আবর্জনা কেন!

কিন্তু কয়েকজন ভবঘুরে বিজ্ঞানীর মাথায় পোকা কামড়াতে থাকল, এত আবর্জনা হয় কীভাবে? তারা গোঁয়ারের মতো লেগে রইলেন এই তথাকথিত আবর্জনার পিছে। তাদের প্রচেষ্টার ফলেই ধীরে ধীরে DNA-আবর্জনা সম্পর্কে জ্ঞানের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হতে শুরু হয়েছে। (স্টিফেন হল, ২০১২) *যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখো তাই, পাইলেও পাইতে পারো অমূল্য রতন*—প্রবাদকে সার্থক করে এনকোড প্রজেক্ট (২০১২) জানাচ্ছে, DNA'র ৮০% শতাংশই মূলত সক্রিয় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে! (অলোক ঝা, ২০১২) তাদের এই গবেষণা ত্রিশটিরও বেশি আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। যতই দিন যাচ্ছে, ততই 'জাংক-DNA' বলে অবজ্ঞা করার অংশের নতুন নতুন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। DNA'এ এই অজানা অংশ নতুন সম্ভাবনার দুয়ার মেলে ধরছে। (নেসা ক্যারি, ২০১৫) বিজ্ঞানীরা

www.QuranerAlo.net

আশা করছেন এই জ্ঞান কাজে লাগিয়ে মানুষের বিভিন্ন রোগের সঠিকতর কারণ অনুধাবন ও সে অনুযায়ী চিকিৎসার সম্ভাবনায় নয়াদিগন্ত আসবে।

কিন্তু গোঁড়া বিবর্তনবাদীদের এই আবিষ্কার একদমই পছন্দ হয়নি। কারণ, তারা DNA-আবর্জনাকে বিবর্তনের প্রমাণ হিসেবে সগর্বে উপস্থাপন করত। তাদের দাবি, উদ্দেশ্যহীন-এলোমেলো বিবর্তন হয়েছে বলেই তো এত ময়লা-আবর্জনা জমেছে DNA-তে। বুদ্ধিমান স্রষ্টা কি আর আবর্জনা বানাবেন? কিন্তু এনকোড প্রজেক্ট তাদের সুখনিদ্রায় পানি ঢেলে দিয়েছে! তাই এই গবেষণার ফল প্রকাশ পাওয়ার পর তীব্র নিন্দা শুরু করে দেয় তারা। প্রবল ক্ষোভে হামলে পড়ে। প্রায় ৩০০ মিলিয়ন ডলারের এনকোড প্রজেক্টকে 'মতিভ্রম' আখ্যা দিয়ে কলম চালাতে থাকে! আন্তর্জাতিক এই প্রজেক্টে অংশ নেওয়া ৪৪২ জন বিজ্ঞানীদেরকে তারা অজ্ঞ, টেকনিশিয়ান বলে গালমন্দ শুরু করে দেয়! (রবিন ম্যাকি, ২০১৩) কারণ DNA'র অধিকাংশই যদি সক্রিয় হয়, তাহলে DNA যে পরিকল্পিতভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে—এই মতই জোরদার হয়। তাই তারা সিদ্ধান্ত নিলেন—এনকোডকে হত্যা করতে হবে! যে প্রজেক্টের দ্বারা মানবকল্যাণের স্বপ্ন দেখা হচ্ছে, বিবর্তনের বিরুদ্ধে যায় বলে সেই প্রজেক্টকে হত্যা করার কথা বলতে গলা এতটুকুও কাঁপল না!

> "এনকোড প্রজেক্টের বক্তব্য অনুযায়ী যদি মানব জিনোমে কোনো DNA-আবর্জনা নাই থাকে, তা হলে দীর্ঘ সময় ধরে চলা, উদ্দেশ্যহীন বিবর্তন প্রক্রিয়ার দ্বারা মানব জিনোমকে ব্যাখ্যা করা যাবে না। পক্ষান্তরে, প্রাণ যদি ডিজাইনের ফসল হয়, তা হলে পুরো DNA'র অধিকাংশেরই কাজ থাকার কথা। তাই এনকোড প্রজেক্টের দাবি সত্য হলে, বিবর্তন ভুল। ... তা হলে সমাধান কি? এনকোডকে হত্যা করো!"
>
> – ড্যান গ্রাওয়ার
> বিবর্তনবাদী জীববিদ

DNA-আবর্জনাতে গুপ্তধনের খোঁজ পাওয়ার পাশাপাশি আরও অনেক আবিষ্কার জীববিজ্ঞানের মৌলিক ধারণাকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলছে। আগে ভাবা হতো mRNA অনেকটা পেনড্রাইভের মতো কাজ করে, স্রেফ DNA'র কোডন কপি করে নিয়ে আসে; এটাই প্রোটিন তৈরির সংকেত। কিন্তু পরে জানা গেল RNA এডিটিং, অল্টারনেটিভ স্প্লাইসিং ইত্যাদির দ্বারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মূল mRNA বদলে যায়! (Post-transcriptional modification) যার ফলে জিনোমে-থাকা সংকেতের সাথে mRNA-এর সংকেত মিলে না! (এরিকা চেক হেডেন, ২০১১) প্রোটিনের ক্ষেত্রেও এমন কাণ্ড ঘটে। তৈরি হওয়ার পর এর উপর চলে ব্যাপক ঘষামাজা। (Post-translational modification) ফলে জেনেটিক কোড একই থাকলেও অসংখ্য ধরণের ভিন্ন প্রোটিন তৈরি হয়! (এডাম লথরপ এট এল.,২০১৩) প্রোটিন তৈরি হবার পর আরেকটা অবাক কাণ্ড ঘটে। প্রতিটি প্রোটিন জটিল প্রক্রিয়ায় বিশেষভাবে কুণ্ডলিত হয়ে নির্দিষ্ট ত্রিমাত্রিক আকার ধারণ করে; যার ফলে এটি কর্মক্ষম হয়। ঠিকমতো কুণ্ডলিত হতে না পারলে প্রোটিন কাজই করতে পারে না! একাজে প্রোটিনকে সাহায্য করে শত শত চ্যাপেরণ

www.QuranerAlo.net

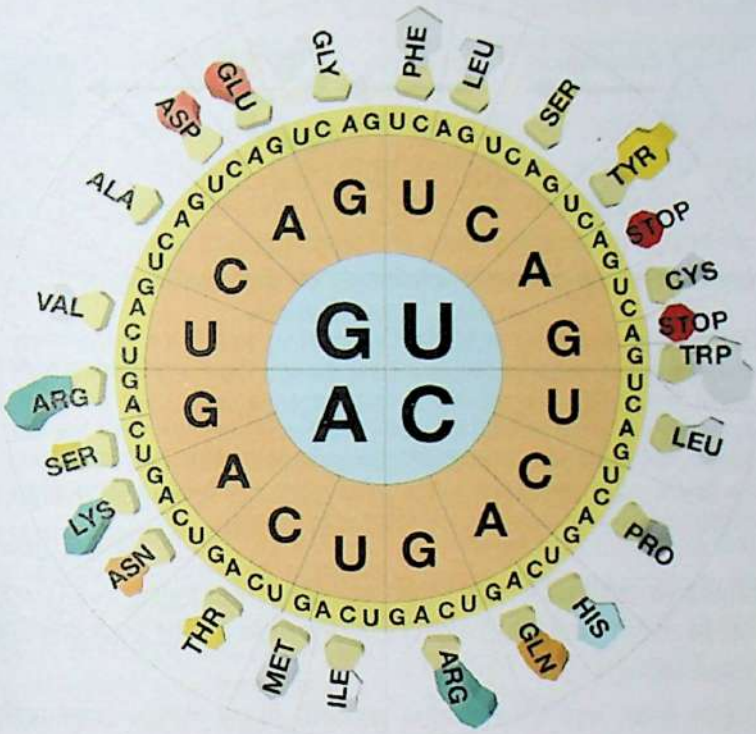

৬৪টি জেনেটিক কোডের বহুল প্রচলিত চিত্র। পাঠ্যবইতে সাধারণত বর্গাকার টেবিলে কোডগুলো সাজানো থাকে। প্রচলিত ধারণা হলো, এই কোডগুলো সকল প্রজাতিতে একই অর্থাৎ এগুলো সর্বজনীন। একটি কোডন কখনও একাধিক অ্যামিনো এসিড কোড করে না। কোনোভাবে জেনেটিক কোডের অর্থ বদলে গেলে প্রাণের উপর বিপর্যয় নেমে আসবে। কারণ এর ধ্বংসাত্মক প্রভাব পড়বে সারা শরীরের উপর। (রিচার্ড ডকিন্স, ২০০৯) বিবর্তনবাদীরা সকল জীবের মাঝে কোড একই ভেবে দাবি করল, এটি বিবর্তনের প্রায় নিশ্চিত প্রমাণ! সকল প্রাণই একটি সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে আসা। (রিচার্ড ডকিন্স, ১৯৯৬)

কিন্তু যতই বিভিন্ন প্রাণির জেনেটিক কোড সম্পর্কে জানা যাচ্ছে ততই আগের অনুমান ভুল প্রমাণিত হচ্ছে। জেনেটিক কোড সর্বজনীন এই দাবি আর খাটছে না। ইতোমধ্যে প্রায় ৩৩টি ভ্যারিয়েন্ট কোড পাওয়া গেছে! যেমন : মানুষের ক্ষেত্রে UGA হচ্ছে স্টপ কোডন, কিন্তু মাইকোপ্লাজমাতে UGA ট্রিপটোফ্যানকে কোড করে, মানুষের মুখে-থাকা একটি ব্যাকটেরিয়াতে UGA গ্লাইসিন কোড করে। সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে বোঝা যাচ্ছে, ভ্যারিয়েন্ট কোড নিয়ে আমাদের জ্ঞানের দরজা কেবল খুলতে শুরু করেছে। সামনে আরও অনেক ভ্যারিয়েন্ট কোডের দেখা মিলবে। (সাইন্সডেইলি, ২০১৯) ফলে জেনেটিক কোডের মিল দেখে একটি সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে আসার দাবিও আর টিকছে না।

ছবি : ইউনিভার্সিটি অফ উটাহ

www.QuranerAlo.net

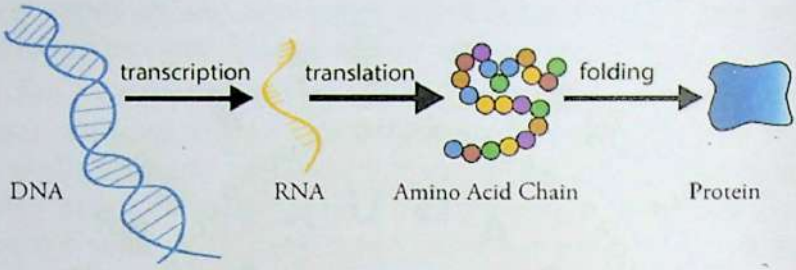

সর্বপ্রথম ফ্রান্সিস ক্রিক সেন্ট্রাল ডগমা প্রস্তাব করেন। তার ধারণা ছিলো সোজাসাপ্টা :

DNA ☐ RNA ☐ Protein

কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেলো রেট্রোভাইরাস (যেমন HIV) RNA থেকে DNA বানায়! লাগলো ঝামেলা। ডগমাতে সংযোজন আনা হলো। পরে আরো জানা গেলো প্রিয়ন ভাইরাস প্রোটিন দিয়ে বংশগতি কাজ সমাধা করে! তাছাড়া RNA ও প্রোটিন তৈরি হওয়ার পর অনেক অতিরিক্ত তথ্যের সংযোজন ঘটার প্রমাণ পাওয়া গেলো। পাশাপাশি আরও ভিন্ন ভিন্ন কোডের খোঁজ পাওয়া গেলো যেগুলো জিনোমে থাকে না। তাই সেন্ট্রাল ডগমা আর যথাযথ নয়। কিন্তু পাঠ্যবই বা প্রচলিত বিজ্ঞান বইয়ে এখনো আগের ধারণাই বহাল তবিয়তে আছে। সেন্ট্রাল ডগমা এখন আর প্রত্যয় না, গোঁড়ামিতে পরিণত হয়েছে।

ছবি: মি. জোনস

প্রোটিন! বিভিন্ন প্রোটিনের কাজেও সাহায্য করে এরা। (সারাহ ইভার্টস, ২০১৭) এতসব লঙ্কাকাণ্ডের কোনো তথ্যই জিনোমে নেই! তাই দেখা যাচ্ছে সেন্ট্রাল ডগমা আর টিকছে না! (ইউজিন কোনিন, ২০১২)

সেন্ট্রাল ডগমা পড়ে যাওয়ার সাথে আরেকটি বিপদে পড়েছে বিবর্তনবাদীরা। বিজ্ঞানীরা একসময় মনে করতেন DNA-তে প্রোটিন তৈরির ৬৪টি সংকেত বা কোডন সব প্রজাতিতে একই। ফলে মনে হচ্ছিল, জেনেটিক কোডগুলো সর্বজনীন! পাঠ্যবইয়ের ভাষায়, *'একটি কোডন কখনও একাধিক অ্যামিনো এসিড কোড করে না। ... কোডসমূহ সার্বজনীন অর্থাৎ বিশ্বের সকল প্রজাতির জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য এবং সেই আদিকাল থেকে শত বিবর্তন ধারা অতিক্রম করে এখনও একই রকম আছে।'* (আবুল হাসান, জুন ২০১৯) বিবর্তনবাদীরা এই কথা লুফে নিল। এক লাফ দিয়ে বলল— দেখো, কত মিল! সুতরাং আমরা বিবর্তনের ফলে সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে এসেছি সন্দেহ নেই।

তবে বিবর্তনবাদীদের জন্য দুঃখের ব্যাপার হলো, জেনেটিক কোডের এই সর্বজনীনতার দাবি সাম্প্রতিক গবেষণার আলোকে টিকছে না! এখন পর্যন্ত ৩৩টি (প্রায় ৫১%) কোডের ভ্যারিয়েশন পাওয়া গেছে! একই কোড থেকে ভিন্ন প্রাণিতে ভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরি হচ্ছে, আবার

> "জেনেটিক কোড সব প্রজাতিতে এক নয়। যেমন মাইক্রোপ্লাজমা এমন কোড ব্যবহার করে যা আমাদের শরীরে কাজ করবে না। এমন অনেক নমুনা আছে..."
>
> - ক্রেগ ভেন্টর
> বিবর্তনবাদী জিনবিদ

www.QuranerAlo.net

বিকল্প কোড একই কাজে ব্যবহার হচ্ছে! অল্পকিছু প্রাণি নিয়ে গবেষণার ফলেই প্রায় ৫১% ভ্যারিয়েন্ট কোড পাওয়া গেছে, গবেষণা বাড়ার সাথে সাথে আরও কত ভ্যারিয়েশন আসবে ভাবা যায়!

DNA-তে থাকা এই কোডগুলো থেকে বোঝা যাচ্ছে, প্রাণ কেবল কিছু রাসায়নিক পদার্থের বিচলন নয়, বরং প্রাণ হলো বিপুল তথ্যের আধার! কোষের মাঝে অকল্পনীয় পরিমাণ তথ্য সঞ্চিত। (এন্টনি ফ্লিউ, ২০০৬) তোমরা জানো কম্পিউটারে বাইনারি পদ্ধতি ব্যবহার করে তথ্য জমা রাখা হয়। কেবল ১ ও ০ এর বিন্যাস দ্বারা তথ্যকে সঞ্চিত করা হয়। যেমন আমার নাম বাইনারি পদ্ধতিতে লিখলে নিচের সংকেত পাওয়া যায় :

Rafan Ahmed

01010010 01100001 01100110 01100001 01101110 00100000
01000001 01101000 01101101 01100101 01100100

DNA-তে তথ্য সঞ্চয় করে রাখা হয় ক্ষারযুগলের বিন্যাস দিয়ে। এই বিন্যাস সুনির্দিষ্ট অর্থ বহন করে। (semantic information) জেনেটিক কোড নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা কম্পিউটার কোডের সাথে এর চমকপ্রদ মিল খুঁজে পেয়েছেন। যেমন : ৫০০ ধরণের ব্যাকটেরিয়ার উপর গবেষণায় দেখা গেছে, এরা বিপাক ক্রিয়ার সময় যে পরিমাণ তথ্য ব্যবহার করে, তা ২০ লক্ষ কম্পিউটারে ২ লক্ষ বার লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করার সমান! (টিন পাং ও সার্জেই ম্যাসলভ, ২০১৩)

> "মানুষের DNA-কে কম্পিউটার প্রোগ্রামের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। তবে আমাদের তৈরি করা যে-কোনো প্রোগ্রামের চেয়ে এটি অনেক অনেক গুণ বেশি উন্নত।"
>
> - বিল গেটস
> মাইক্রোসফট® এর প্রতিষ্ঠাতা

এখন তোমাকে একটা প্রশ্ন করি। খুব ভেবেচিন্তে উত্তর দেবে।

ধরো, তুমি প্রতিদিনের মতো সকালে ক্লাস রুমে ঢুকলে। ঢোকা মাত্র ক্লাসের বিজ্ঞ, মোটা চশমাওয়ালা ছেলেটি তোমাকে গম্ভীর স্বরে বলল, ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে তাকাও। তুমি তাকিয়ে দেখতে পেলে সেখানে লেখা—

'বাংলাদেশ, আমার বাংলাদেশ'

সেই মোটা চশমাওয়ালা তোমাকে বলল, শোন, এই লেখাটা আপনা-আপনি বোর্ডে লেখা হয়ে গেছে। বাতাস এসে চক উড়িয়ে নিয়ে গেছে, চক উড়ে গিয়ে পড়েছে ব্ল্যাক বোর্ডে, আর কপাল ফেরে, দূর্ঘটনাক্রমে বোর্ডে এই তিনটা শব্দ লেখা হয়ে গেছে। চশমাওয়ালার এই দাবি তুমি মেনে নেবে কি? কোনো সুস্থমস্তিষ্কের মানুষ মেনে নেবে কি? কখনোই না! কারণ, আমরা জানি তথ্য কোনো জড় পদার্থের বৈশিষ্ট্য না, বরং স্বতন্ত্র মননের প্রকাশ। অর্থপূর্ণ তথ্যের পিছনে ক্রিয়াশীল থাকে কোনো-না-কোনো বুদ্ধিমত্তা। আমাদের অভিজ্ঞতা ও কমনসেন্স তাই বলে।

www.QuranerAlo.net

কয়েক হাজার শব্দে লেখা এই বইটিতে তথ্যের পরিমাণ যত নগণ্যই হোক না কেন, বইটি পড়ে সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন যে-কেউ সিদ্ধান্ত নেবে—এই বইটির পিছে কোনো বুদ্ধিমত্তা ক্রিয়াশীল। এই সিদ্ধান্ত তুমি ইতোমধ্যেই নিয়ে ফেলেছ। যদিও লেখককে বই লিখতে দেখোনি, এই বই যারা বানিয়েছে তাদের কাউকেই দেখোনি। কিন্তু বই হাতে নিয়ে এই অবাস্তব অঙ্ক কষতে শুরু করোনি যে, এলোমেলো প্রক্রিয়ায় কোনো বুদ্ধিমত্তা ছাড়াই এই বই আচমকা তৈরি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কত!

DNA-তে বিদ্যমান তথ্য এর চেয়েও অনেকগুণ বেশি জটিল, অনেক অনেক বেশি সুবিন্যস্ত ও সুনির্দিষ্ট! সাম্প্রতিক সময়ে আরও কোড পাওয়া যাচ্ছে যা DNA'র বাইরে থাকে! (যেমন : এপিজেনেটিক কোড, সুগার কোড, মেমব্রেন কোড, বায়োইলেকট্রিক কোড ইত্যাদি) সামগ্রিক তথ্যের পরিমাণ কেমন হতে পারে তার একটা উদাহরণ দিই। অনুমান করা হয়, ক্ষুদ্র একটি কোষে তথ্যের পরিমাণ 10^{10} বিটস! এই পরিমাণ তথ্য দিয়ে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা লিখলে ১০ লক্ষ পৃষ্ঠা ছাড়িয়ে যাবে! (এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, লাইফ অন আর্থ) মানবদেহে মোট কোষের সংখ্যা প্রায় ৩৭ লক্ষ কোটি! এবার হিসেব কষতে বসে যাও। দেখো মাথায় কুলোয় কি না!

বিখ্যাত বিশ্বকোষ এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা-এর ৩২ খণ্ডের সংকলন। সব মিলিয়ে পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩০,০০০ এর বেশি। একটি ছোটখাট কোষের মাঝে যে পরিমাণ তথ্য থাকে তা এমন বিশ্বকোষের চেয়ে ত্রিশ-চল্লিশগুণ বেশি!

ছবি: ব্রিটানিকা

সামান্য তিনটা শব্দ আপনা-আপনি, উদ্দেশ্যহীন প্রক্রিয়ায় তৈরি হওয়ার কথা বিশ্বাস করা যায় না, অথচ এর চেয়ে অসংখ্য কোটি গুণে জটিল ও সুবিন্যস্ত তথ্যে-ঠাসা কোষ কপাল ফেরে এলোমেলো-উদ্দেশ্যহীন প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন হয়ে গেছে—এমন গল্প মানুষ কেন বিশ্বাস করে, বলতে পারবে?

জাগতিক প্রক্রিয়ায় হঠাৎ করে প্রাণ উদ্ভব হয়ে গেছে, বিপুল তথ্যের আবির্ভাব হয়েছে, এটা 'happy chemical accident' ছিল—এসকল বক্তব্য অন্ধবিশ্বাস ছাড়া কিছু নয়! গবেষণাতে দেখা গেছে, চান্স বা নেসেসিটির গালগপ্পো দিয়ে DNA'র উৎপত্তি, এর তথ্যের প্রাচুর্য ও নির্দিষ্টতা ব্যাখ্যা করা যায় না। হঠাৎ করে হয়ে গেছে এমন হাস্যকর বুলি আওড়ানোর দ্বারা প্রাণের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা যায় না। (জে. ট্রেভর ও ডি. অ্যাবেল, ২০০৪) স্রেফ জাগতিক প্রক্রিয়ায় প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত উদ্ভাবনের প্রচলিত বিশ্বাস কেবলই কুযুক্তিপ্রসূত অন্ধবিশ্বাস! (হুবার্ট ইয়োকি, ১৯৭৭, ২০০২) এসকল গবেষক নিজেরা

www.QuranerAlo.net

Contents

বিবর্তনবাদী হওয়া সত্ত্বেও এই বাস্তবতা স্বীকার করেছেন! তোমাদের এতসব জানানো হয়নি। বিজ্ঞানের নাম করে তোমাদেরকে কল্পবিজ্ঞানের মুখরোচক গল্প গেলানো হয়।

মহাকাশের পানে তাকিয়ে বুদ্ধিমত্তার নিদর্শন যে পদ্ধতিতে খোঁজা হচ্ছিল, সেই মূলনীতি অনুসরণ করে সাম্প্রতিক কালে DNA'র মধ্যে অনুসন্ধান চালানো হয়েছে। (ভ্লাদিমির শারবাক ও ম্যাক্সিম মাকুকভ, ২০১৩) ফলাফল দাঁড়াল বিস্ময়কর! দেখা গেল, DNA-তে তথ্যের যে বিন্যাস বিদ্যমান, তা কেবলমাত্র বুদ্ধিমান সত্তা দ্বারাই সৃষ্টি সম্ভব; নিছক এলোমেলো বিবর্তন থেকে এমন প্যাটার্ন তৈরি হবার সম্ভাবনা ১ লক্ষ-কোটি ভাগের ১ ভাগের চেয়েও কম অর্থাৎ অসম্ভবের-উপর-অসম্ভব! (P-value < 10^{-13})

কোষের মাঝে-থাকা এই অকল্পনীয় তথ্যের উৎসের বিষয়ে যৌক্তিক চিন্তা করলে আমরা বুঝতে পারি, মূর্ত-জড় বস্তু থেকে এলোপাথাড়ি-জড় প্রক্রিয়ায় বিমূর্ত তথ্য আসা সম্ভব না। এর জন্য দরকার কোনো বুদ্ধিমত্তা; এই রে আবারও স্রষ্টার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে দেখি! কিন্তু প্রকৃতিবাদের প্রতি আনুগত্যের কারণে বিজ্ঞানীরা তা মেনে নিতে পারেন না। প্রচলিত বিজ্ঞানের ময়দানে তারা চিন্তায় স্বাধীন নন। নোবেল বিজয়ী জর্জ ওয়াল্ডের ভাষায়, *'প্রাণ হঠাৎ করে আপনা-আপনি উদ্ভব হয়েছে—এমন অনুকল্প দাঁড় করানো ছাড়া বিজ্ঞানীদের কোনো উপায় নেই।'* (জর্জ ওয়াল্ড, ১৯৫৪) আরেক জীববিজ্ঞানী এই বাস্তবতা স্বীকার করে বলেন (স্কট টড, ১৯৯৯):

> সকল উপাত্তও যদি কোনো বুদ্ধিমত্তা-সম্পন্ন স্রষ্টার দিকে ইঙ্গিত করে, তারপরও এমন অনুকল্প বিজ্ঞান থেকে বাদ দেওয়া হবে। কারণ এই ব্যাখ্যা প্রকৃতিবাদী নয়।

কোষ, DNA ও তথ্যের জটিলতা দেখে কিছু বিজ্ঞানী ভাবলেন—হঠাৎ করে হয়ে গেছে বা হওয়ার দরকার ছিল, এমন গুল মেরে পার পাওয়া যাবে না। কিন্তু তাই বলে স্রষ্টাকে তো আর মানা যায় না! তাই তাদের কেউ কেউ কল্পনা করলেন, প্রথম প্রাণ হয়তো পৃথিবীর বাইরে থেকে এসেছে! বহির্জগতের উন্নত কোনো সভ্যতা সেটা নিয়ে এসেছিল বা প্রাণ পৃথিবীর বাইরেই দৈবাৎ তৈরি হয়ে যায়; পরে উল্কাপিণ্ড তাকে বয়ে নিয়ে আসে পৃথিবীতে! ফ্রান্সিস ক্রিক, ফ্রেড হোয়েল, কার্ল স্যাগান-সহ বেশকিছু বিজ্ঞানী এমনটাই ভাবতেন।

যাক বাবা, স্রষ্টার আদেশ মেনে চলার ঝামেলা থেকে তো মুক্তি পাওয়া গেল!

www.QuranerAlo.net

হেকেলের ভণ্ডামো

A lie stands on one leg, truth on two
~ Mark Twain

যে-সকল উপাত্তের উপর ডারউইনের বেশ আস্থা ছিল তার মধ্যে প্রস্তাবিত ভ্রূণতাত্ত্বিক প্রমাণ অন্যতম। ডারউইন এক চিঠিতে জানিয়েছিলেন, ভ্রূণতাত্ত্বিক প্রমাণ তার তত্ত্বের পক্ষে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ। (ডারউইন, ১৮৬০) যেহেতু ডারউইন নিজে ভ্রূণবিশারদ ছিলেন না। তাই ভ্রূণসংক্রান্ত উপাত্ত অন্যজন থেকে ধার করতে হয়েছিল। এদের মাঝে একজন ছিলেন আর্নেস্ট হেকেল, অন্যজন ভন বেয়ার। মজার ব্যাপার হলো প্রথমজনের প্রমাণ ছিল জালিয়াতিপূর্ণ, আর পরের জনের কথাকে অপব্যাখ্যা করে বিবর্তনের পক্ষে আনা হয়েছিল!

ডারউইন ভন বেয়ার-এর উপাত্ত উল্লেখ করে বলেন, একই শ্রেণিভুক্ত প্রাণিরা প্রাথমিক ভ্রূণাবস্থায় দেখতে প্রায় একইরকম; কিন্তু পরিণত অবস্থায় এরা পুরো ভিন্ন আকার-আকৃতি ধারণ করে। (ডারউইন, ১৮৫৯) পাঠ্যবইয়ের ভাষায়, 'মাছ, উভচর, সরীসৃপ, পাখি ও স্তন্যপায়ীর ভ্রূণগুলোকে প্রথম অবস্থায় পরস্পর থেকে প্রায় পৃথকই করা যায় না।' (গাজী আজমল ও গাজী আসমত, জুন ২০১৯) কিন্তু বেয়ারের সিদ্ধান্ত থেকে বেরিয়ে, ভ্রূণগত সাদৃশ্য থেকে ডারউইন অনুমান করেন, এসকল প্রাণি হয়তো একই পূর্বপুরুষের বংশধর; এবং এদের পূর্বপুরুষ দেখতে কেমন ছিল তাও বোঝা যাবে ভ্রূণের সাধারণ গঠন দেখে। ডারউইনের মতে, প্রাণির ভ্রূণীয় পরিস্ফুটনের দশাগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিণত প্রাণির অনুরূপ নয়, বরং নিম্নতর প্রজাতির বয়স্ক প্রাণির অনুরূপ।

এই ধারণার বিপক্ষে সরব ছিলেন বেয়ার। তিনি বারবার বলেছেন, উচ্চতর প্রাণির ভ্রূণীয় পরিস্ফুটনের দশাগুলো নিম্নতর প্রজাতির বয়স্ক প্রাণির অনুরূপ নয়। ডারউইন তাকে ভুলভাবে উপস্থাপন করেছেন! (পিটার জে. বোলার, ২০০৩; আলেক্সান্ডার ভুশিনিচ, ১৯৮৮) কিন্তু হেকেল ডারউইনের ধারণাকেই প্রচার করতে ওঠেপড়ে লাগেন, পুনরাবৃত্তি মতবাদ (Recapitulation Theory) বা বায়োজেনেটিক সূত্র দাঁড় করান—কোনো জীবের ভ্রূণের

> "তথাকথিত বায়োজেনেটিক সূত্র গলদ। কোনো কিন্তু বা যদি'র দ্বারা একে আর ঠিক করা সম্ভব নয়। ... এটি পুরোপুরি ভুল।"
>
> - এরিক ব্লেকশস্মিথ
> ভ্রূণবিদ

www.QuranerAlo.net

Contents

পরিস্ফুটনের সময় তার পূর্বপুরুষের ক্রমবিকাশের ঘটনাবলি পুনরাবৃত্তি হয়। (গাজী আজমল ও গাজী আসমত, ২০১৯) এই ধারণা ব্যাপক প্রচার লাভ করে। এখনও সব পাঠ্যবইয়ে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। কোনো কোনো পাঠ্যবইয়ে বেয়ারের মত এমনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যাতে মনে হয় বেয়ার-হেকেল একই মত দিয়েছেন! (মাজেদা বেগম ও অন্যান্য, মে ২০১৯) কেউ আবার বেয়ারের মত উল্লেখ করেছেন ঠিকই, কিন্তু সেটা যে ডারউইন-হেকেলের ধারণার বিপরীত—এ ব্যাপারটা খেয়াল করেননি। (গাজী আজমল ও গাজী আসমত, ২০১৯) হেকেলের পুনরাবৃত্তি মতবাদকেই সঠিক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে সব পাঠ্যবইতে! বলা হয়েছে এটি, 'বিবর্তনের স্বপক্ষে একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ।' (বিজ্ঞান। নবম-দশম শ্রেণি, ২০১৯)

অথচ পুনরাবৃত্তি মতবাদ যে বহু আগেই বাতিল সাব্যস্ত হয়েছে, এর কোনো উল্লেখ পাঠ্যবইয়ে নেই! (নিকোলাস রেসমুজেন, ১৯৯১; এন্ড্রু ইংকপেন ও ফোর্ড ডুলিটল, ২০১৬) তা ছাড়া হেকেল তার তত্ত্বের সমর্থনে যে ভ্রূণতাত্ত্বিক প্রমাণ উল্লেখ করেছিলেন, তাও ছিল ছলনাপূর্ণ! মেরুদণ্ডী প্রাণিদের ভ্রূণবিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। (আন্দ্রেজ কোলাজো, ২০০০) কিন্তু হেকেল ইচ্ছে করেই প্রাথমিক পর্যায়গুলো ছবিতে আনেননি। তা ছাড়া, তিনি বেছে বেছে এমন প্রাণিদের নিয়েছেন যাতে সাদৃশ্য দেখানো সহজ হয়। (জোনাথন ওয়েলস, ১৯৯৯) যে ধাপকে তিনি প্রথম হিসেবে উপস্থাপন করেছেন

ছবির একদম উপরে দেখা যাচ্ছে মেরুদণ্ডী প্রাণিদের ভ্রূণের প্রথমদিকের অবস্থা। বামদিক থেকে শুরু করে ঘড়ির কাঁটার দিকে যথাক্রমে—মাছ, পাখি, স্তন্যপায়ী, সরীসৃপ, উভচর-এর ভ্রূণ। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে প্রাথমিক দশা যথেষ্ট বৈসাদৃশ্যপূর্ণ। হেকেল এই প্রাথমিক ধাপ তার ছবিতে দেখাননি।

ছবি : জন জোগ্রেন

www.QuranerAlo.net

তা ছিল মূলত মধ্যবর্তী ধাপ। তা ছাড়া সেই মধ্যবর্তী ধাপের চিত্রকেও তিনি ইচ্ছে করে বদলে দিয়েছেন, যাতে করে সাদৃশ্য বেশি মনে হয়! (এলিজাবেথ পেনেসি, সাইন্স ১৯৯৭) ডারউইন হেকেলের ছবিকে নিজের মতের পক্ষে প্রমাণ ভেবেছিলেন। তিনি জানতেন না, শতাব্দীর অন্যতম ধোঁকাবাজির জালে তিনি ফেঁসে গেছেন!

"আগে যা ভাবা হতো তার চেয়েও অধিক বৈপরীত্যের দেখা মেলে মেরুদণ্ডী প্রাণিদের ভ্রূণবিকাশে।"

- স্কট গিলবার্ট
ডেভলোপমেন্টাল বায়োলজিস্ট

বিবর্তনবাদী ভ্রূণবিদ মাইকেল রিচার্ডসনের ভাষায় হেকেলের এই ছবি, 'জীববিদ্যায় বহুল প্রচলিত জালিয়াতিগুলোর একটি।' নিউসাইন্টিস্ট-এর স্বীকারোক্তি অনুযায়ী হেকেলের ভ্রূণচিত্র 'অতিমাত্রায় গলদ'! (ম্যাথু কব, ২০১৫) মজার ব্যাপার হলো, হেকেল নিজেও স্বীকার করেছিলেন যে, ছবিতে তিনি ঝামেলা করেছিলেন; তবে সেটা কেউ মনে রাখেনি। (এলিজাবেথ পেনেসি, ১৯৯৭) আজও হেকেলের সেই ছবিগুলো দেশের সব পাঠ্যবইতে দেখতে পাওয়া যায়; কোনোটা সাদা-কালো, কোনোটা রঙচঙা! কিন্তু কোথাও বলা নেই যে—এই ছবিতে জালিয়াতি করা হয়েছে! কোথাও বলা নেই হেকেলের পুনরাবৃত্তি তত্ত্ব ভুল! একশত বছর আগের ভুল আজও আমাদের পাঠ্যবইতে শেখানো হয়! অথচ উচ্চমাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান বইতে স্টিফেন হকিং-এর জায়গায় ভুলে হলিউড অভিনেতা এডি রেডমেইন-এর ছবি দিয়ে ফেলার পরের বছরই সেটা ঠিক করে দেওয়া হয়! (দৈনিক শিক্ষা, ২০১৭)

এ পর্যায়ে কেউ বলতে পারে—আচ্ছা ঠিক আছে, হেকেল জালিয়াতি করেছে বুঝলাম। ডারউইন না হয় ভুল করেছেন; তাই বলে নব্য-ডারউইনবাদ ভুল প্রমাণিত হয় না। (মাইকেল রিচার্ডসন, ১৯৯৮) ভ্রূণবিকাশবিদ্যার নতুন শাখা তো আছেই—ইভোলিউশনারি ডেভলোপমেন্টাল বায়োলজি (ইভো-ডিভো)। কিন্তু কেন এই ইভো-ডিভো প্রস্তাব করা হয়েছে, এর কারণ তারা জানে না! নব্য-ডারউইনবাদ নবকাঠামো সম্পন্ন প্রজাতির উদ্ভব প্রমাণ করতে পারে না, স্রেফ অনুমান করে নেয় বলেই ইভো-ডিভো প্রস্তাব করতে হয়েছে। (স্কট গিলবার্ট, ২০০৩) ডারউইনবাদ ও নব্য-ডারউইনবাদ উভয়েরই মূল দাবি হলো প্রজাতির উদ্ভব। যদি প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রজাতির উদ্ভব (ম্যাক্রোইভোলিউশন) প্রমাণ করতে সক্ষম নাই হয়, তা হলে নব্য-ডারউইনবাদের আর বাকি থাকল কী? স্রেফ প্রকৃতিবাদের প্রতি বিশ্বাস?

তা ছাড়া প্রচলিত বিজ্ঞান বই দেখলে মনে হয়, ইভো-ডিভো সব সমস্যার সমাধান করে ফেলেছে! বাস্তবতা এর থেকে বহু দূর! ইভো-ডিভো'র বক্তব্য হলো—ভ্রূণবিকাশে ক্রিয়াশীল জিনগুলোতে সূচনাকালীন পরিবর্তনের ফলে দেহের গঠনে বড়ো মাপের রদবদল আসতে পারে। সুবিধাজনক কোনো বদল কপালে জুটলে এভাবেই হয়তো নবকাঠামো (Body plan) চলে আসতে পারে—ফলে আবির্ভূত হতে পারে নতুন

www.QuranerAlo.net

নিচের সারিতে হেকেলের আঁকা ছবি। (হেকেল, ১৮৭৪) উপরের সারিতে ভ্রূণের প্রকৃত ছবি। (মাইকেল রিচার্ডসন, ১৯৯৭) স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে হেকেল কীভাবে ছবিকে বদলে দিয়েছেন। ভ্রূণবিকাশের মাঝের স্তরকে প্রথম স্তর বলে চালিয়ে দিয়েছেন। বিবর্তনবাদি গবেষকরা এহেন ধড়িবাজিতে ক্ষোভ ও লজ্জা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু বিবর্তনবাদিদের কাছে এ-ছবি এতই প্রিয় যে, নিজেদের লোক জোচ্চুরি প্রকাশ করার পরও এই ছবির পক্ষে নির্লজ্জভাবে দালালি করেছেন কেউ কেউ। এরাও হেকেলের মতই আকাজ করেছেন। প্রথম ধাপ বাদ দিয়েছেন। মধ্যবর্তী ধাপে যে গঠন আসে তার অংশবিশেষ ছেঁটে দিয়ে বলেছেন - দেখো কতো মিল! (রবার্ট রিচার্ডস, ২০০৯)

ছবি: সাইন্স

www.QuranerAlo.net

Contents

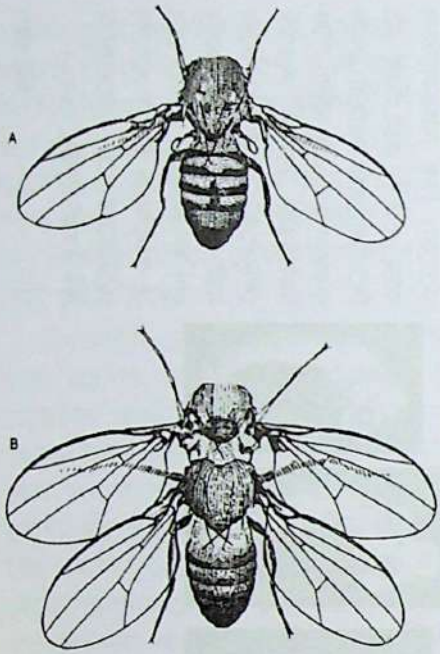

ড্রসোফিলা মাছির ভ্রূণে হিসেব করে তিনটি মিউটেশন ঘটানোর ফলে ব্যালেন্সারের জায়গায় নতুন দুটি ডানা গজিয়েছে ঠিকই; কিন্তু মাছিটি তার উড়ার ক্ষমতা হারিয়ে পঙ্গু হয়ে গেছে। ভ্রূণবিকাশের সূচনাকালে মিউটেশন হলে এমন ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে যে প্রাণিটি বিবর্তনের দৌড়ে ব্যর্থ হয়ে যায়।

ছবি: গেট ড্রয়িংস
(ছবিতে মাছির মাথা মুছে দেয়া হয়েছে)

কোনো প্রজাতি! কিন্তু এমন ধারণার বিপরীতে অনেক আগে থেকেই প্রমাণ মিলেছে। ভ্রূণবিকাশের শুরুর দিকে মিউটেশনের হলে মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে প্রাণির উপর। ড্রসোফিলা মাছির উপর এ নিয়ে করা পরীক্ষা নোবেল পুরস্কারও পেয়েছে। বিজ্ঞানী এডওয়ার্ড লুইস বেশ মাপজোখ করে ড্রসোফিলার ভ্রূণে তিনটি মিউটেশন ঘটাতে সক্ষম হন। এর ফলে মাছি উড়ার সময় যে অংশ দিয়ে ভারসাম্য রক্ষা করে (Balancer), সে জায়গায় আরও দুটি ডানা গজায়। অর্থাৎ দুই ডানার মাছির, চার ডানার পরিণত হয়।

বিবর্তনবাদীরা আনন্দিত হয়ে বলে ওঠে—দেখেছ! মিউটেশন দিয়েই প্রাণিতে বদল আসে। বিবর্তনের কী সুন্দর নমুনা! কিন্তু তাদের একরাশ দুঃখে ভাসিয়ে পরে জানা গেল—মিউটেশনের ফলে দুটি অতিরিক্ত ডানা গজিয়েছে ঠিকই, কিন্তু ব্যালেন্সার না থাকায় ও উড়ার জন্য প্রয়োজনীয় পেশি তৈরি না হওয়ায় মাছি উড্ডয়ন ও বংশবিস্তারে সমস্যায় পড়ে গেছে। ল্যাবরেটরির বাইরে এরা অল্পকালও বাঁচতে পারবে না। সুতরাং বেঁচে থাকা ও বংশবৃদ্ধির দৌড়ে এরা অচল! বিবর্তনবাদী আর্নেস্ট মায়ার দুঃখ করে বলেছিলেন এরা হলো, 'নৈরাশ্যের দানব!' (আর্নেস্ট মায়ার, ১৯৭০)

ইভো-ডিভো এর নানাদিক নিয়ে বিজ্ঞানীরা এখনও বিতর্ক করে যাচ্ছেন। এর একটা কারণ হলো, ইভো-ডিভো বেশ বায়াসপূর্ণ। বহুকোষী প্রাণিতেই এর মনোযোগ বেশি। এই সীমিত উপাত্ত (Taxonomic sampling bias) থেকে সাধারণ সিদ্ধান্তে আসার পথে বিশাল বাধা রয়েছে। (অ্যালেসান্ড্রো মিনেলি, ২০১৫) তা ছাড়া ফিনোটাইপিক প্লাস্টিসিটি'র বাস্তবতা ঝামেলা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। ফিনোটাইপিক প্লাস্টিসিটি হলো একই জিনোটাইপের থেকে পরিবেশের প্রভাবের ফলে ভিন্ন ভিন্ন ফিনোটাইপ আসা। মডার্ন সিন্থেসিসের কাঠামোতে এই প্লাস্টিসিটির ব্যাখ্যা করা যায় না, আর ইভো-ডিভো

www.QuranerAlo.net

অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্লাস্টিসিটিকে আমলেই নেয় না! (জিসেপি ফাল্কো ও অ্যালেসান্দ্রো মিনেলি, ২০১০)

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে পাঠ্যবইয়ে যে নিশ্চয়তার আশ্বাস দেখা যায়, তা হয় অতিরঞ্জন অথবা একেবারেই গলদ। আমার মনে হয় না, বিজ্ঞানের চৌহদ্দিতে আর কোনো তত্ত্ব আছে যেটা শেখানোর জন্য এত বেশি মিথ্যে বলা হয়।

আমি স্বপ্ন দেখি, তোমরা একদিন এই অসুস্থ প্রচেষ্টার চল থামাতে পারবে। সেজন্য দরকার সচেতনতা আর জ্ঞানচর্চা চালিয়ে যাওয়া।

www.QuranerAlo.net

পাথরের কথা

Nature never deceives us; it is we who deceive ourselves
~ Jean-Jacques Rousseau

জীবাশ্ম বা ফসিল হলো বহু আগের কোনো প্রাণের দেহাংশ; যা কালের আবর্তে প্রতিস্থাপিত হয়ে পাথরে পরিণত হয়েছে। ভূগর্ভে কিংবা ভূ-পৃষ্ঠের কঠিন স্তরে সংরক্ষিত পাললিক শিলায় এদের দেখা মেলে। যৌগিক পদার্থে মিশ্রিত ও রূপান্তরিত অবস্থায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণির ধ্বংসাবশেষ, ছাপ ইত্যাদি পাওয়া যায়। সুদূর অতীতে প্রাণ কেমন ছিল তার নমুনা মেলে ফসিলের মাঝে। বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন রকম ডেটিং মেথড ব্যবহার করে ফসিলের বয়স অনুমান করে থাকেন। বিজ্ঞানীদের ধারণা পৃথিবীতে যতরকম প্রাণের আবির্ভাব হয়েছিল তার প্রায় ৯৯% বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এদের অতি নগণ্য সংখ্যকের ফসিল পাওয়া গেছে। ফসিলবিদগণ বিভিন্ন নিয়ামক উল্লেখ করেছেন, যার ফলে ফসিল খুবই অল্প পরিমাণে গঠিত হয়। (মাইকেল বেন্টন ও ডেভিড হারপার, ২০০৯)

ফসিল জোচ্চুরির বিখ্যাত উদাহরণ হলো—পিল্টডাউন ম্যান ফসিল। ১৯১২ সালে এই ফসিলটিকে মানুষ ও বানর-জাতীয় প্রাণির মাঝে মিসিং লিংক বলে দাবি করেন চার্লস ডাউসন। হুলুস্থুল পরে যায় ইংল্যান্ডে। প্রায় চল্লিশ বছর পরে বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারেন—এটি স্রেফ ভাঁওতা ছিল! মানুষের মাথার সাথে ওরাংওটানের চোয়াল মিলিয়ে এটি তৈরি করা হয়েছিল। এই প্রতারণায় যারা অংশ নিয়েছিলেন তাদের মাঝে বিখ্যাত শার্লক হোমস-এর রচয়িতা আর্থার কোনান ডয়েলেরও নাম আছে!

ছবি : দি ওয়াশিংটন পোস্ট

www.QuranerAlo.net

প্রচলিত বিজ্ঞানপত্রিকা, বিজ্ঞান বিষয়ক বইতে ফসিলকে বিবর্তনের বেশ জোরালো প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। উচ্চমাধ্যমিক জীববিজ্ঞান বইয়ের ভাষায় : 'বিবর্তনের সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য এবং প্রামাণিক সাক্ষ্য (উপাদান) হচ্ছে জীবাশ্ম।' (গাজী আজমল ও গাজী আসমত, ২০১৯) অন্য বইতে লেখা, 'জীবাশ্ম বিবর্তনের অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ বহন করে।' (ড. আবদুল আলীম, ২০১৯) আরেক পাঠ্যবইয়ের ভাষায় জীবাশ্ম থেকে বিবর্তনের, 'অত্যন্ত বলিষ্ঠ প্রমাণ পাওয়া যায়।' (প্রফেসর ড. নূর-ই-পারভিন খানম ও অন্যান্য, ২০১৯) ফসিলের নানারকম আসল ও কাল্পনিক ছবিতে ভরপুর থাকে বিজ্ঞানের বইগুলো। মানুষের পূর্বপুরুষ বলে ধরে নেওয়া ফসিলের তো কাল্পনিক ভাস্কর্যই বানিয়ে ফেলা হয়। আবার কখনও দেখা যায় কোনো জনপ্রিয় পশ্চিমা গায়িকার চেহারাকে সফটওয়্যার দিয়ে বদল করে মানুষের পূর্বপুরুষ হিসেবে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে! কিন্তু ফসিলের পেছনের গল্পটা আমরা কেউই জানি না।

আমরা বিবর্তন তত্ত্বের অনুমানগুলোর কথা আলোচনা করেছি। হোমোলজি বিবর্তন তত্ত্বের বুনিয়াদি একটি অনুমান। এই অনুমানের উপর ভিত্তি করে বিবর্তনের সমর্থনে ফসিলকে প্রমাণ হিসেবে নিয়ে আসা হয়। গঠনগত মিল/অমিল দেখে অনুমান করা হয় এদের সাধারণ পূর্বপুরুষ হয়তো এক/ভিন্ন। ডারউইন ভাবতেন বিবর্তন একটি ক্রমিক প্রক্রিয়া (Gradualism); ধারাবাহিক, অতি মন্থর ক্রম পরিবর্তনের মাধ্যমে অতীতের কোনো সরল জীব হতে জটিলতর জীবের আবির্ভাব হয়। তা হলে ফসিলের মাঝে এই ধারাবাহিক বদলের প্রমাণ থাকার কথা। কিন্তু ডারউইনের সময়ে ফসিল-প্রমাণ সমর্থন দেয়নি! এমনকি হালফিলেও ফসিল প্রমাণের মাঝে ধারাবাহিক ক্রমবদলে নমুনা পাওয়া যায় না বললেই চলে। কেন পাওয়া যায় না?

আনুমানিক সাড়ে-পাঁচ শ মিলিয়ন বছরের কাছাকাছি সময়ে জীবজগতে এক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটে। এই সময়কাল ক্যামব্রিয়ান পিরিয়ড নামে পরিচিত। এই কালের শুরুতে অল্প সময়ের মাঝে বিস্ময়কর পরিমাণ প্রাণের উদ্ভব হয়, যাদের পূর্ব-ফসিলের কোনো নমুনা আগের শিলাস্তরে পাওয়া যায় না! ফসিলবিদ স্টিফেন যে. গোল্ড-এর ভাষায়, 'প্রাণের ইতিহাসে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও হতবাক করে দেওয়ার মতো একটি ঘটনা হলো ক্যামব্রিয়ান বিস্ফোরণ।' অল্প সময়ের মাঝেই মলাস্কা, আর্থ্রোপড, মেরুদণ্ডী-সহ অধিকাংশ প্রাণি পর্ব (phylum/division) ও বহু শ্রেণির (class) উৎপত্তি হয়!

ক্যামব্রিয়ান বিস্ফোরণ নিয়ে বিখ্যাত টাইম ম্যাগাজিনের কভার স্টোরি

www.QuranerAlo.net

ডারউইন এই ক্যামব্রিয়ান বিস্ফোরণ সম্পর্কে জানতেন। তাই ফসিলের এহেন প্রমাণ তিনি বেশ বড়ো রকমের সমস্যা হিসেবে মনে করেছিলেন। ডারউইনের তত্ত্বের ধারণা অনুযায়ী হঠাৎ করে জটিল প্রাণ/অঙ্গ তৈরি হয়ে যাওয়ার কথা না, ক্রমান্বয়ে খাপ খাইয়ে নেওয়া ও বদলের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে জটিল প্রাণ/অঙ্গ গঠিত হওয়ার কথা। ডারউইন অরিজিন অফ স্পিসিস বইতে (৬ষ্ঠ অধ্যায়) মত দিয়েছিলেন : যে-কোনো জটিল অঙ্গ ক্রমান্বয়ে, ধাপে ধাপে অসংখ্য অল্প বদলের দ্বারা তৈরি না হয়ে, হঠাৎ করে তৈরি হয়ে যাওয়ার প্রমাণ পাওয়া গেলে তার বিবর্তন তত্ত্ব ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে! মজার ব্যাপার হলো, ফসিল আমাদের সেই প্রমাণই দিচ্ছে!

> "ক্যামব্রিয়ান বিস্ফোরণ দেখে মনে হয়, এত বিপুল পরিমাণ প্রাণ কোনোরূপ ক্রমবিবর্তন ছাড়াই প্রস্ফুটিত হয়েছে।"
>
> - রিচার্ড ডকিন্স
> বিবর্তনবাদী জীববিদ

অসংখ্য জটিল অঙ্গ কোনো বিবর্তনের ইতিহাস ছাড়াই শিলাস্তরে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এতে ডারউইন আশাহত হননি। তিনি ভেবেছেন : ফসিল-প্রমাণ (fossil record) অসম্পূর্ণ। স্বপ্ন দেখেছেন ভবিষ্যতে পর্যাপ্ত ফসিল আবিষ্কৃত হলে এই ঝামেলা মিটে যাবে। দুঃখের বিষয় এই সমস্যা তো মিটেইনি, বরং আরও প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। ক্যামব্রিয়ানে হঠাৎ করে বহু প্রাণের আবির্ভাবের ব্যাখ্যা হিসেবে কেউ কেউ অনুমান করেছিলেন, প্রাক-ক্যামব্রিয়ান প্রাণ হয়তো খুব ছোটো ছিল বা খুব নরম শরীরের ছিল। তাই তাদের ফসিল গঠিত হয়নি, আর সেজন্যই ক্যামব্রিয়ান সময়ে প্রাণের বিপুল বৈচিত্র্যকে আকস্মিকভাবে উদ্ভূত মনে হয়। কিন্তু এ ধারণাও প্রমাণের প্রেক্ষিতে বাতিলের খাতায় চলে যায়। প্রাক-ক্যামব্রিয়ান সময়-সহ আরও কয়েক বিলিয়ন বছর আগের শিলাস্তরেও ক্ষুদ্র ব্যাকটেরিয়া, বার্গেস শেলে ছোটো ও নরম শরীরের অনেক প্রাণের ফসিল দেখতে পাওয়া যায়। (স্টিফেন ডর্নবস এট এল., ২০১৬) যার সহজ অর্থ দাঁড়ায় এত বিপুল পরিমাণ প্রাণের কোনো পূর্ব-ফসিল নেই। একজন প্রফেসরের ভাষায় : *'প্রি-ক্যাম্ব্রিয়ান মহাকালে ক্রমবিবর্তনের ধারাবাহিকতা খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়'*। (ড. নিশীথ কুমার পাল, ২০১৪) তা ছাড়া সাম্প্রতিক ডিএনএ বিশ্লেষণ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে ক্যামব্রিয়ান সময়ের এসব প্রাণি এই সময়ের বহু আগে থেকেই স্বতন্ত্রভাবে ছিল!

ক্যামব্রিয়ান বিস্ফোরণই যে একমাত্র ঘটনা তা কিন্তু নয়। হঠাৎ করে ব্যাপক প্রাণবৈচিত্র্যের এমন আবির্ভাবের আরও ঘটনার প্রমাণ পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা (যেমন : এডিয়াকারান এক্সপ্লোশন, অর্ডোভিসিয়ান এক্সপ্লোশন, ওডোন্টোড এক্সপ্লোশন, ট্রায়াসিক এক্সপ্লোশন ইত্যাদি)। তাই ফসিলবিদ্যার টেক্সট বইয়ের মতে : ফসিল-প্রমাণের মাঝে ধারাবাহিক ক্রমবদলের নজির পাওয়া যায় না! (টি.এস.কেম্প, ১৯৯৯) ফসিল-প্রমাণের এই বৈপরীত্য বিবর্তনের কাঠামোর মাঝে ঢোকানোর জন্য ব্যাখ্যাও দাঁড় করানো হয়েছে (punctuated equilibrium)। কিন্তু এতে সমস্যা মিটেনি। (ম্যাথু পেনেল এট এল. ২০১৪) তা ছাড়া ডিএনএ'র গঠন আবিষ্কারের পর থেকে আমরা জেনেছি প্রাণ

www.QuranerAlo.net

হলো বিপুল তথ্যের আধার। নতুন প্রাণি, নতুন অঙ্গ মানেই হলো কোষে নতুন তথ্য, নতুন সমন্বয়ের আবির্ভাব। সুতরাং ক্যামব্রিয়ান, এডিয়াকারান, ট্রায়াসিক ইত্যাদি বিস্ফোরণ কেবল প্রাণের বিস্ফোরণ নয়, বরং ব্যাপক নব-তথ্যের বিস্ফোরণ। তোমরা ডিএনএ'র আলোচনায় দেখেছ তথ্য কোনো জড় প্রক্রিয়ার ফসল না, বরং বুদ্ধিমত্তার ইঙ্গিতবাহী। এলোপাথাড়ি মিউটেশন হয়ে নতুন তথ্য আসবে এহেন সম্ভাবনা দূরকল্পনা। (সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়াররা ব্যাপারটা আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবেন।) চার্লস লায়েল ও ডারউইন যে চিন্তা-পদ্ধতি গঠন করেছিলেন, সেই চিন্তা-পদ্ধতি অনুসরণ করলেও বিভিন্ন-সময়ে-ঘটা প্রাণ-বিস্ফোরণের পিছে জাগতিক ব্যাখ্যা যথার্থ হয় না। (স্টিফেন মায়ার, ২০১৩)

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, ফসিলকে প্রচলিত বইপত্রে যেভাবে বিবর্তন-সম্পর্কের নিশ্চিত প্রমাণ বলে প্রচার করা হয়, বাস্তবতা তার সাথে মিলে না। আগেই বলা হয়েছে, প্রাণের অধিকাংশই (৯৯%) বিলুপ্ত হয়ে গেছে মনে করা হয়। এবং ফসিল গঠন খুব দুর্লভ হওয়াতে ফসিল পাওয়াও যায় অনেক কম। তা ছাড়া ফসিলের বয়স নির্ধারণেও (ডেটিং মেথড) সাম্প্রতিক সময়ে বড়ো রকমের ত্রুটি ধরা পড়েছে। (আলেক্সান্ডার এম. ডানহিল এট. এল, ২০১৪) এই বাস্তবতাগুলো বিবেচনা করলে পাঠ্যপুস্তকে-থাকা নিশ্চয়তার আশ্বাস অতিরঞ্জন বলে মনে হয়।

> "কেউ যদি মনে করে ফসিল-প্রমাণের কাছে গিয়ে সে বৈজ্ঞানিকভাবে যাচাইযোগ্য উপায়ে বিবর্তন-সম্পর্ক উদ্ধার করবে তবে সে মারাত্মক বিভ্রান্তিতে ডুবে আছে।"
>
> - গ্যারেথ নেলসন
> বিবর্তনবাদী ফসিলবিদ

বিশিষ্ট ফসিলবিদ ড. হেনরি গী ফসিল প্রমাণের বাস্তবতা বোঝাতে একটা উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি বলেন, ফসিল-প্রমাণ কোনো নিরবচ্ছিন্ন বাক্য নয়, খণ্ডবাক্যও নয়; এমনকি শব্দও নয়। বরং ফসিলকে তিনি তুলনা করেছেন কিছু দুষ্প্রাপ্য যতিচিহ্নের সাথে! বিজ্ঞানীরা নিজেদের মনোমতো এই যতিচিহ্নগুলি দিয়ে বাক্য সাজায়; অর্থাৎ প্রাণের ইতিহাস রচনা করে। কিন্তু কারও পক্ষেই ফসিল দিয়ে নিশ্চয়তার সাথে বলা সম্ভব না—'অমুক থেকে তমুক এসেছে'। যা বলা হয় সবই অনুমান। (হেনরি গী, ২০১৩) হেনরি গী আরও বলেন, 'কেউ যদি এক সারি ফসিল নিয়ে দাবি করে অমুকের পূর্বপুরুষ তমুক, অমুক থেকে তমুক এসেছে তবে এহেন দাবিকে ঘুমপাড়ানি গল্পের সাথে তুলনা করা যায়। কারণ দুটোর কোনোটাই বৈজ্ঞানিকভাবে যাচাই করা সম্ভব না। এইসব গল্প শুনতে মজা লাগে, কিছু শেখাও যায় হয়তো; তবে এগুলো বৈজ্ঞানিক নয়।' (হেনরি গী, ১৯৯৯) সুতরাং বোঝা যাচ্ছে বিজ্ঞান বইপত্রে থাকা বিবর্তনের অনুধাবন, আর মাঠপর্যায়ের বিজ্ঞানীদের অনুধাবনের মাঝে বিশাল ফারাক। ফসিল সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা মাথায় রেখে এবার পাঠ্যপুস্তকের দিকে তাকানো যাক। পাঠ্যপুস্তকে বিবর্তনের সমর্থনে ঘোড়া ও আর্কিওপটেরিক্স-এর ফসিলের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। অল্প পরিসরে এই দুই ফসিল নিয়ে আলোচনা প্রাসঙ্গিক মনে করছি।

www.QuranerAlo.net

আর্কিওপটেরিক্স (Archaeopteryx)

ডারউইনের অরিজিন অফ স্পিসিজ বই প্রকাশিত হওয়ার দুই বছরের মাথায় একটি ফসিল আবিষ্কৃত হয়। ফসিলটি দেখতে সরীসৃপের মতো মনে হলেও, পাখির পালকের মতো কিছু গঠনও দেখতে পাওয়া যায় এতে। এর নাম দেওয়া হয় 'আর্কিওপটেরিক্স' বা 'প্রাচীন ডানা'।

"[আর্কিওপটেরিক্স] হলো সরীসৃপ ও পাখির মাঝে প্রায় নিটোল মেলবন্ধন।"

- আর্নেস্ট মায়ার
বিবর্তনবাদী ফসিলবিদ

বিবর্তনের একটি অনুমান হলো, জল থেকে ডাঙায় পর্যায়ক্রমে প্রাণের আবির্ভাব হয়েছে এমনটা মনে করা। (জি.এ. কারকাট, ১৯৬০) তাই ভাবা হয় সরীসৃপ-জাতীয় কোনো প্রাণি থেকে হয়তো পাখি আসতে পারে। ফলে সাথে সাথে বিবর্তনবাদীরা আর্কিওপটেরিক্স-কে বিবর্তনের হারানো যোগসূত্র (missing link) হিসেবে লুফে নেন! অচিরেই এটি সরীসৃপ ও পাখির মাঝে যোগসূত্রের আইকন হয়ে ওঠে। বিজ্ঞানী ও মিউজিয়ামের কিউরেটরদের কাছে আর্কিওপটেরিক্স হয়ে উঠে যেন মাইকেল এঞ্জেলোর কোনো শিল্পকর্ম!

প্রচলিত বিজ্ঞান বইপত্রে সরীসৃপ থেকে পাখি আসার বিষয়টি অত্যন্ত নিশ্চয়তার সাথে প্রচার করা হয়। একজন প্রফেসরের কলমে জানা যায়, 'আর্কিওপটেরিক্স একটি মূল্যবান জীবাশ্ম। কারণ সরীসৃপ গোষ্ঠী হতেই যে, পাখির উদ্ভব হয়েছিল সে কথা এর দ্বারাই বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়।' (ড. নিশীথ কুমার পাল, ২০১৪) জনপ্রিয় বিজ্ঞান-লেখককেও একমত হতে দেখা যায়, 'ডাইনোসরের একটা প্রজাতি প্রায় দুইশত মিলিওন বছর আগে বিবর্তিত হয়ে পাখিতে রূপান্তরিত হয়।' (ড. জাফর ইকবাল, ২০১৮)

উচ্চ-মাধ্যমিক প্রাণিবিজ্ঞান বইতে বলা হয়েছে, 'বিবর্তন-সম্পর্কিত জীবাশ্মঘটিত অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায় Archaeopteryx-নামক জীবাশ্ম থেকে।' (ড. মোঃ আবদুল আলীম, জুন ২০১৯) 'বিজ্ঞানীদের ধারণা পাখির উৎপত্তি হয়েছে সরীসৃপ ও পাখির মধ্যবর্তী প্রাণি Archaeopteryx থেকে।... বিজ্ঞানী Huxley যথার্থই বলেছেন, পাখিরা হলো মহিমান্বিত সরীসৃপ। পাখিদের বিবর্তনিক পথ হচ্ছে : সরীসৃপ □ Archaeopteryx □

www.QuranerAlo.net

পাখি।' (গাজী আজমল ও গাজী আসমত, জুন ২০১৯; ড. মোঃ আবদুল আলীম, জুন ২০১৯)

পাঠ্যবইয়ের এই 'অকাট্য প্রমাণ' দাবির বর্তমান বাস্তবতা ভিন্ন। আমরা আগেই দেখেছি স্রেফ হাতেগোনা কিছু ফসিল দিয়ে নিশ্চিতভাবে কিছুই বলা যায় না। যা বলা হয়, সবই অনুমান-ধারণা। ডাইনোসর-জাতীয় সরীসৃপ থেকে পাখির আবির্ভাবে ধারণাও বেশ কিছু অনুমানের উপর দাঁড়ানো। (হেনরি গী, ১৯৯৯) তা ছাড়া এই ডাইনো-পাখি ধারণার নানাবিধ সমস্যাও আছে। (হেনরি গী, ১৯৯৮) বিজ্ঞানীদের মাঝে এ বিষয়ে 'তুমুল বিতর্ক' এখনও চলছে। একদল বিজ্ঞানীর মতে ডাইনোসর পাখির পূর্বপুরুষ নয়, পাখির বিবর্তনের ধারা স্বতন্ত্র। (সাইন্সডেইলি, ২০০৯, ২০১০; অ্যালান ফেদুশিয়া, ২০১৪)

প্রাণিবিজ্ঞানী থালবর্ন গবেষণায় দেখিয়েছেন, আর্কিওপটেরিক্স পাখির পূর্বপুরুষ নয়; পাখি আর সরীসৃপের মাঝে সংযোগকারী সূত্র হিসেবেও যথার্থ নয়। (আর.এ. থালবর্ন, ১৯৮৪) ফসিলবিদ ল্যারি মার্টিন-এর গবেষণা জানায়, আর্কিওপটেরিক্স আজকের পাখির পূর্বপুরুষ নয়; বরং আদিযুগের হারিয়ে-যাওয়া কোনো পাখির জাত হতে পারে। (ল্যারি ডি. মার্টিন, ১৯৮৫) নিউ ইউর্ক ন্যাচারাল হিস্টোরি মিউজিয়ামের ফসিলবিদ মার্ক নোরেল (যিনি নিজেও ডাইনো-পাখি ধারণার সমর্থক) বেশ আগেই জানিয়েছেন, অধিকাংশ ফসিলবিদের মতে আর্কিওপটেরিক্স পাখির পূর্বপুরুষ নয়। (জন শোয়ার্টজ, দি ওয়াশিংটন পোস্ট, ১৯৯৬) ফসিলবিদ ড. হেনরি গী বলেছেন (হেনরি গী, ১৯৯৯) :

> একসময় আর্কিওপটেরিক্স আদিতম পাখি হওয়ার মর্যাদায় আইকন হিসেবে দাঁড়িয়ে ছিল। পাখির পূর্বপুরুষের মর্যাদায়ও আসীন ছিল সে। সে দিন আর নেই। আমার মতে, আর্কিওপটেরিক্স হলো পালকওয়ালা ডাইনোসর, অন্যকিছু নয়।

সাম্প্রতিক গবেষণাতেও দেখা যাচ্ছে, আর্কিওপটেরিক্স আসলে কোনো পাখিই নয়! বরং ডাইনোসরের ভাই-ব্রাদার! (ম্যাট কাপলান, ২০১১)

আর্কিওরেপ্টর নামের নকল ফসিল
ছবি : সাইন্সম্যাগ

ডাইনোসর আর পাখির মাঝে হারানো যোগসূত্র খোঁজার ঝোঁক এককালে এতই বেশি ছিল যে, ফসিল জালিয়াতি করতে ও পিছপা হয়নি কিছু লোক! ১৯৯৯ সালে আর্কিওরেপ্টর নামে একটি ফসিলের খোঁজ পাওয়া যায়। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক ম্যাগাজীন মহা উৎসাহে এই ফসিল প্রচারে নেমে পড়ে। পরে জানা যায় : জোড়াতালি দিয়ে এই নকল ফসিল বানানো হয়েছিল। (টিমোথি রোয়ে এট এল., নেচার ২০০১) আর্কিওপটেরিক্স যদি এতই 'অকাট্য প্রমাণ' হতো তা হলে জাল ফসিল বানিয়ে জোরেশোরে প্রচার করা লাগল কেন?

www.QuranerAlo.net

এ পর্যায়ে চিন্তাশীল কেউ প্রশ্ন করতে পারে, প্রচলিত বিজ্ঞান বইপত্রে, মিউজিয়াম এক্সিবিশনে ডাইনো-পাখি ধারণা একেবারে 'ফ্যাক্ট' বলে প্রচার করার কারণ কী? উত্তরটা একজন বিজ্ঞানীর মুখেই শোনা যাক।

প্রাণিবিদ জন রুবেন নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে বলেন (সাইন্সডেইলি, ২০১০) :

> সত্যি বলতে কী, এর সাথে মিউজিয়াম পলিটিক্স জড়িত, বুঝলেন। পাশাপাশি অনেক বিজ্ঞানীর ক্যারিয়ার জড়িয়ে আছে এই ডাইনো-পাখি ধারণার সাথে। তাই, নতুন বৈজ্ঞানিক উপাত্ত আগের ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করলেও তারা সেটা আঁকড়ে ধরে থাকতে চান।

www.QuranerAlo.net

Contents

আধুনিক ঘোড়ার বিবর্তন

ডারউইন ভেবেছিলেন প্রস্তাবিত ঘোড়ার বিবর্তন তার ক্রমবিবর্তন তত্ত্বের পক্ষে সবচেয়ে ভালো প্রমাণ। (রিচার্ড গাউনি, ২০১৫) একজন প্রফেসরকেও আত্মবিশ্বাসের সাথে বলতে দেখা যায়, ‘বিবর্তনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় ঘোড়ার জীবাশ্ম থেকে’। (ড. নিশীথ কুমার পাল, ২০১৪) পাঠ্যইয়ের ভাষায় ঘোড়ার বিবর্তন প্রমাণ করে, ‘পরিবর্তন ধীরে ধীরে এবং ধাপে ধাপে হয়।’ (গাজী আজমল ও গাজী আসমত, জুন ২০১৯) তবে ঝামেলা হলো উচ্চমাধ্যমিক পাঠ্যপুস্তকগুলো নিজেরাই ঘোড়ার বিবর্তনের ধাপ নিয়ে একমত না! পাঠ্যবইয়ে ঘোড়ার বিবর্তনের ক্ষেত্রে দীর্ঘতম ধাপ পাওয়া যায় এমন (গাজী আজমল ও গাজী আসমত, জুন ২০১৯) :

ইওহিপ্পাস → অরোহিপ্পাস → মেজোহিপ্পাস → মেরিচিপ্পাস → প্লিওহিপ্পাস → প্লেসিহিপ্পাস → ইকুয়াস (আধুনিক ঘোড়া)

কিন্তু অন্য বইতে অরোহিপ্পাস বাদ দেওয়া হয়েছে, ইওহিপ্পাস-এর পরবর্তী ধাপ বলা হয়েছে মেসোহিপ্পাস। (ড. নূর-ই-পারভিন খানম ও অন্যান্য, ২০১৯; মাজেদা বেগম ও অন্যা[illegible] ২০১৯; ড. নিশীথ কুমার, ২০১৪) আরেক বইতে অরোহিপ্পাস ও মেজোহিপ্পাস-এর জায়[illegible] শুধু মায়োহিপ্পাস লেখা হয়েছে। (ড. আবদুল আলীম, জুন ২০১৯) এ অবস্থায় চিন্তাশীল কে[illegible] প্রশ্ন তুলতেই পারে—সঠিক কোনটা? তাছাড়া এসব পাঠ্যবই দেখে মনে হয় ঘোড়ার বিবর্তন বেশ সোজাসাপটা, সরলরৈখিক (অর্থোজেনেটিক ধারণা)। বাস্তবতা হলো, এমন ধারণা প্রায় শত বছর আগেই বিজ্ঞানী-মহলে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে! এখন বলা হচ্ছে, ঘোড়ার বিবর্তনের পথ সরলরৈখিক নয়, বরং জঙ্গলের মতো প্যাঁচালো! (ব্রুস ম্যাকফ্যাডেন, ২০০৫) আরেকটা মজার ব্যাপার হলো, বিজ্ঞানীরা এখনও আধুনিক ঘোড়ার গণ (*Equus*)-এর সংজ্ঞা নিয়েই একমত হতে পারেন নি! (ক্রিস্টিনা ব্যারন-অর্টিয, ২০১৯)

ধারণা করা হয়, আধুনিক ঘোড়া ৫০০০ বছর আগে কাজাকিস্তানে আবির্ভূত হয়েছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক ডিএনএ-ভিত্তিক বিশ্লেষণ ঘোড়ার বিবর্তনের কাঠামোকে উলটপালট করে দিয়েছে! আধুনিক ঘোড়ার পূর্বপুরুষ কে?-এর উত্তর আরও ঘোলাটে হয়ে গেছে। অশ্ববিশারদ এমেলাইন হিল বলেন (এলিজাবেথ পেনেসি, ২০১৮):

> আমরা আবার সেই ধন্দে পড়ে গেলাম—আধুনিক ঘোড়ার পূর্বপুরুষ তা হলে কে ..?

নতুন নতুন ফসিল আবিষ্কারের ফলে আগের ধারণা বেশ-কয়েকবার বদলাতে হয়েছে। যেমন: দেখা গেছে ইওহিপ্পাস থেকে অরোহিপ্পাস আসেনি, বরং একসময় তারা উভয়েই একসাথে অস্তিত্বে ছিল। সব পাঠ্যবইতে প্লিওহিপ্পাস থেকে আধুনিক ঘোড়ার আবির্ভাব দেখানো হয়েছে, অথচ সাম্প্রতিক ধারণায় প্লিওহিপ্পাস আধুনিক

www.QuranerAlo.net

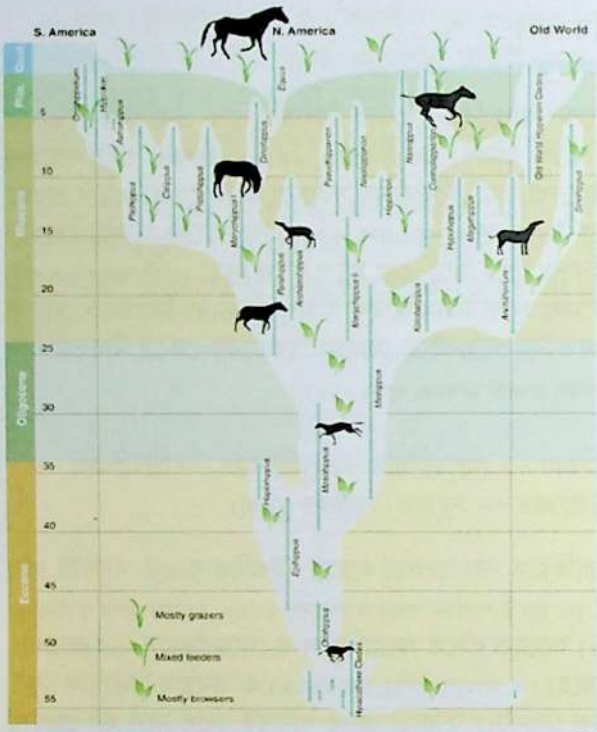

ঘোড়ার বিবর্তনের বর্তমান ধারণা। আগে ভাবা হতো ঘোড়ার বিবর্তন ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে হয়েছে। কিন্তু নতুন ফসিল-প্রমাণের আলোকে এই ধারণা টলে গেছে। তা ছাড়া আধুনিক ঘোড়ার পূর্বপুরুষ কে, তা নিয়ে বিজ্ঞানীরা এখনও একমত হতে পারেননি। সাম্প্রতিক গবেষণা এই সমস্যাকে আরও প্রকট করে তুলেছে।

ছবি : সাইন্স জার্নাল

ঘোড়ার পূর্বপুরুষই নয়! (ক্রস ম্যাকফ্যাডেন এট এল., ২০১২) প্লেসিহিপ্পাস-কে [সঠিক উচ্চারণ প্লেসিপ্পাস] আগে ঘোড়ার গণভুক্ত করা হলেও, সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রতীয়মান হচ্ছে সেটা ভিন্ন গণের অন্তর্গত। (ক্রিস্টিনা ব্যারন-অর্টিয, ২০১৯) তা ছাড়া ঘোড়ার বিবর্তন 'ধীরে ধীরে এবং ধাপে ধাপে' হয়েছে এমন দাবিও খাটছে না! বেশ কিছু বৈশিষ্ট্যের আচমকা আবির্ভাব দেখতে পাওয়া যায় ফসিল-প্রমাণে। (এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, ইভোলিউশন অফ দ্য হর্স)

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, প্রচলিত বইপত্রে যত নিশ্চয়তা দেওয়া হয় তা হয় অতিরঞ্জন বা মিথ্যা! এক্ষেত্রে চিন্তাশীল মন ভাবতে পারে—শত বছর আগেই ভুল প্রমাণিত হওয়া ধারণার এত ছড়াছড়ি কেন? শুধু পাঠ্যবই নয়, বরং আমেরিকার অনেক মিউজিয়ামে এখনও ঘোড়ার রৈখিক বিবর্তনের গল্প শেখানো হয়। এ নিয়ে বিবর্তনবাদী গবেষকরাও খেদ প্রকাশ করেছেন। তারা দেখেছেন, ঘোড়ার বিবর্তনের এমন প্যাঁচালো ঝোপঝাড়ওয়ালা চিত্র সহজে মাথায় ঢুকে না। এক্ষেত্রে বিবর্তন নিয়ে বিশ্বাস দৃঢ় না হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। তাই ইচ্ছে করেই ভুলভাবে বিবর্তনের প্রমাণ প্রচার করা হয় পাঠ্যবই, মিডিয়া, মিউজিয়ামগুলোতে! (ক্রস ম্যাকফ্যাডেন এট এল., ২০১২)

এখন প্রশ্ন হচ্ছে কেন এমন করা হচ্ছে?

www.QuranerAlo.net

কঙ্কালের কান্না

Tears are the silent language of grief

সারি করে রাখা মানুষের অনুমিত পূর্বপুরুষের খুলি। সস্নেহে খুলির মাথায় হাত বুলাচ্ছেন এক ব্যক্তি। প্রচলিত বইপত্রে যে আত্মবিশ্বাসের সাথে মানব-বিবর্তনে ফসিলকে প্রমাণরূপে নিয়ে আসা হয়, তা কতটুকু সঠিক?

ছবি : নিউ সাইন্টিস্ট

এতক্ষণ যে-সকল ফসিল নিয়ে আলোচনা হলো, এসব ততটা প্রভাব ফেলে না, যতটা প্রভাব মানব-পূর্বপুরুষের অনুমিত ফসিলের ক্ষেত্রে দেখা যায়। বাহ্যিকভাবে মানুষের সাথে শিম্পাঞ্জি বা গরিলার কিছু বিষয় মিলে এটা নতুন কোনো আবিষ্কার নয়। ক্যারোলাস লিনিয়াসের শ্রেণিবিন্যাস ব্যবস্থায় বাহ্যিক কিছু মিলের কারণে মানুষ ও শিম্পাঞ্জিকে একই গোত্রভুক্ত করা হয়েছে। আমরা আগেই দেখেছি, ডারউইনের পরে প্রাণের শ্রেণিবিন্যাসকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা শুরু হয়। এদের উপর বিবর্তন সম্পর্ক আরোপ করা হয় এবং সে সময় থেকে খুঁজে-পাওয়া ফসিলগুলোকে বিবর্তনের চিন্তায় সাজানো হতে থাকে।

www.QuranerAlo.net

ইতিহাস ঘেঁটে জানা যায়, মানুষের পূর্বপুরুষ তথা হোমিনিড ফসিলের খোঁজ জোরেশোরে আরম্ভ হয় বিশ শতকের শুরুর দিকে। এই সময় বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, মিউজিয়াম প্রদর্শনী ইত্যাদির দ্বারা হোমিনিড ফসিলকে জনপ্রিয় করে তোলা শুরু হয়। সম্মান-খ্যাতি-অর্থ লাভের আশায় ফসিল শিকারিরা চষে বেড়াতে থাকেন বিভিন্ন জায়গায়, বিশেষ করে আফ্রিকায়। (লিডিয়া পাইন, ২০১৬) হোমিনিড ফসিল খুঁজে পাওয়ার নেশা এতটাই জেঁকে বসে যে, চোখের সামনে যাই আসত সেটাকেই মানুষের পূর্বপুরুষের ফসিল মনে করার মানসিকতা দেখা যেতে থাকে! ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবর্তনবাদী নৃবিজ্ঞানী টিম হোয়াইট বিরক্তির সাথে বলেছিলেন, *'অধিকাংশ নৃবিদ হোমিনিড ফসিল পাওয়ার নেশায় এতটাই বুঁদ হয়ে থাকে যে, ভাঙাচোরা যে-কোনো হাড্ডির টুকরাই তাদের কাছে মানুষের পূর্বপুরুষের বলে মনে হয়।'* (আয়ান এন্ডারসন, ১৯৮৩)

প্রচলিত বিজ্ঞান বইপত্র পড়লে মনে হয়, মানুষের পূর্বপুরুষ বা হোমিনিড ফসিলগুলোর কপালে ছাপ মারা আছে যে—আমিই মানুষের অমুক পূর্বপুরুষ! কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন!

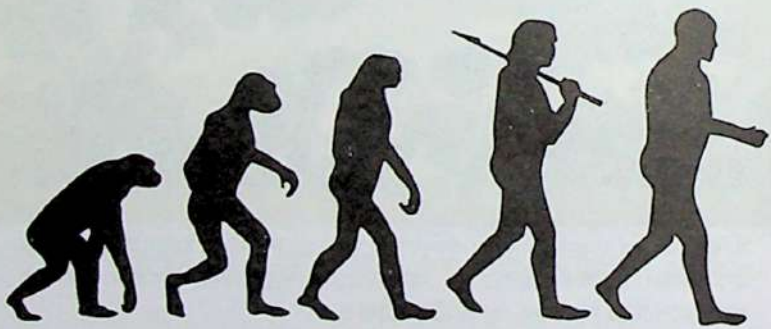

মার্চ অফ প্রগ্রেস—মানব-বিবর্তনের বহুল প্রচলিত কিন্তু ভুল চিত্র! এই চিত্র দেখে মনে হয় সোজাসাপটা রৈখিক বিবর্তনের ফলে, শিম্পাঞ্জি থেকে, ক্রম উন্নয়ন ও ক্রমবিকাশের মাধ্যমে আজকের মানুষের আবির্ভাব। মূল বিবর্তন তত্ত্ব অনুযায়ী এই সব ক'টি ধারণা ভুল। বিবর্তনের চোখে মানুষ কোনো বিশেষ/উন্নত প্রাণি নয়, বরং মূল্যহীন-তাৎপর্যহীন পশুমাত্র। (কসটাস ক্যাম্পোরকিস, ২০১৪; ইউভাল নোয়াহ হারারি, ২০১৪) যদিও উচ্চমাধ্যমিক পাঠ্যবইয়ে বিবর্তন অধ্যায়ের শুরুতেই এই ছবি দেখতে পাওয়া যায়। (আজমল ও আসমত, ২০১৯)

www.QuranerAlo.net

অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তকে (মাইকেল কেন্ট, ২০০০) জানা যায় :

> হোমিনিড পূর্বপুরুষদের থেকে আধুনিক মানবের বিবর্তন নিয়ে গবেষণা বড়োই অনুমাননির্ভর। আমাদের বর্তমান জ্ঞানের অধিকাংশই খুবই অল্প প্রমাণের উপর দাঁড়িয়ে আছে। কেবল হাজার কয়েক হোমিনিড আবিষ্কৃত হয়েছে, যেগুলোর অধিকাংশই অসম্পূর্ণ। কখনও এমন হয়েছে যে, বিস্তীর্ণ এলাকা-জুড়ে সংগ্রহ করা হাড়গোড়ের মধ্যে যেগুলো বাহ্যিকভাবে দেখতে একরকম লাগে, সেগুলোকে একই জন্তুর বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। তবে সেগুলো আসলে অন্য কারও হতে পারে।

ফসিলবিদগণ বিভিন্ন কারণ আলোচনা করেছেন যা থেকে জানা যায়, হোমিনিড কঙ্কাল ফসিল হিসেবে সংরক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। তাই এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হোমিনিড ফসিলের পরিমাণ অত্যন্ত স্বল্প; এগুলো মূলত কিছু খণ্ডিত হাড়গোড়, দাঁত, কখনও মাথার ভাঙাচোরা খুলি ইত্যাদি। ফসিলবিদ ড. লায়েল ওয়াটসন-এর মতে, হোমিনিড ফসিলের পরিমাণ এতই কম যে স্রেফ একটা কফিনের মধ্যে সবগুলো ফসিল এটে যাবে। এদিকে মানুষ ও শিম্পাঞ্জির সাধারণ পূর্বপুরুষ বলে ধরে নেওয়া ফসিলের পরিমাণ আরও কম। বিবর্তনবাদী ফসিলবিদ বার্নাড উড জানান, সুপারশপে থাকা শপিং ট্রলির মাঝে সবগুলো ফসিল রাখলেও অধিকাংশ জায়গা খালি থেকে যাবে! আর শিম্পাঞ্জির ফসিল-প্রমাণ নেই বললেই চলে। (বার্নাড উড, ২০০৫)

এই যৎসামান্য হোমিনিড ফসিল দিয়ে তৈরি করা মানুষের বিবর্তনের গল্প কতটা অনুমান নির্ভর তা বোঝানোর জন্য ফসিলবিদ কনস্টান্স হোলডেন একটি উদাহরণ দিয়েছেন (কনস্টান্স হোলডেন, ১৯৮১)। সেটাকে একটু বাংলাকরণ করা যাক। ধরো সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়-এর বিখ্যাত উপন্যাস প্রথম আলো-র অখণ্ড সংস্করণ নিয়ে আসা হলো ১০ কপি। বইপ্রতি পৃষ্ঠাসংখ্যা হাজারের বেশি। কিন্তু ঝামেলা হলো, প্রতিটি বইয়ে মাত্র ১৩টা করে পৃষ্ঠায় লেখা আছে; বাকি সব খালি! এবার এমন দশজন বেছে নেওয়া হলো যারা কেউই এই উপন্যাস পড়েনি এবং বলা হলো, বাকি প্রায় হাজার পৃষ্ঠা যেভাবে পারেন লিখে ফেলুন! তোমার কি মনে হয়, একজনও প্রথম আলো লিখতে পারবে? ধারেকাছেও যেতে পারবে? ফসিল দিয়ে মানব-বিবর্তনের গাঁথা মেলানোও এমনি জটিলতা ও অনুমানপূর্ণ! কিন্তু তাই বলে কি থেমে থাকা যাবে? নাহ, বিবর্তনবাদী ফসিলবিদ কোপানো রেটেইল-এর ভাষায় বললে, 'এদের নিয়ে গল্পের মালা সাজাতে হবে, আলোচনায় মুখর রাখতে হবে, মনোমতো ব্যাখ্যার ডালা সাজাতে হবে, এদের পূজার বেদিতে বসিয়ে নমঃনমঃ করতে হবে!' (লিডিয়া পাইন, ২০১৬)

এহেন মানসিকতা বারবার লক্ষ করা গেছে। ২০০৯ সালে একদল বিজ্ঞানী প্রাইমেট ফসিলের খোঁজ পান, যার নাম দেওয়া হয় আইডা (Ida)। মিডিয়াতে ব্যাপক হারে প্রচার হতে থাকে আইডা হলো স্তন্যপায়ী ও মানুষের মাঝের যোগসূত্র। সেলেব্রিটি

www.QuranerAlo.net

নিসর্গী ডেভিড এটেনব্রা নিজেও এমন কথা জোরেশোরে প্রচার করতে থাকেন। আইডা-কে 'মোনালিসা'র সাথে তুলনা করা হতে থাকে। বলা হতে থাকে আইডা হলো অষ্টম আশ্চর্য! কিন্তু কয়েক মাস পরে জানা যায় আইডা মানুষ নয়, বরং লেমুর-জাতীয় প্রাণির সাথে সম্পর্কযুক্ত! আইডা মানুষের লিনিয়েজ থেকে বহু দূরে। (রেক্স ডাল্টন, ২০০৯) একে মানুষ ও স্তন্যপায়ীর মাঝে যোগসূত্র বলে প্রচার করা বয়ান ভিত্তিহীন! (ক্রিস বেয়ার্ড, ২০০৯)

তা ছাড়া বিজ্ঞানী-মহলে-স্বীকৃত ফসিল নিয়েও মতানৈক্যের অন্ত নেই। কিছুদিন পরপর ভাঙা হাড়গোড় পাওয়া যায়, আর পত্রিকা ফলাও করে প্রচার করে মানব-বিবর্তনের ইতিহাস নতুন করে লিখতে হবে মনে হচ্ছে! (ইউইন ক্যালাওয়ে, ২০১৭) প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী লুসি (*অস্ট্রালোপিথিকাস অ্যাফারেনসিস*) ফসিলকে হোমিনিডের পূর্বপুরুষ গণ্য করা হয়। বলা হয়, লুসি ফসিল এসেছে পূর্বপুরুষ *অস্ট্রালোপিথিকাস এনামেনেসিস* থেকে। কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, *এনামেনেসিস* লুসির পূর্বপুরুষ নয়; বরং এরা একসময় সহাবস্থানে ছিল! (কলিন ব্যারাস, ২০১৯) *অস্ট্রালোপিথিকাস*-এর আগে যাদের হোমিনিড পূর্বপুরুষ ধরা হয়, যেমন : সাহেলানথ্রোপাস, ওরোনিন, আর্ডিপিথিকাস ইত্যাদির ফসিল মূলত শিম্পাঞ্জি-জাতীয় প্রাণির সাথে মিলে। অর্থাৎ এরা হোমিনিড পূর্বপুরুষ না হয়ে শিম্পাঞ্জি ও গরিলার (*পানিন*) পূর্বপুরুষ বলাই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু এদের *পানিন* পূর্বপুরুষ বললে তো আর যশ-খ্যাতি মিলবে না, মানুষের পূর্বপুরুষ বলে প্রচার করাই এক্ষেত্রে লাভজনক! তাই মানুষের পূর্বপুরুষ বলেই চালিয়ে দেওয়া হলো। (বার্নাড উড, ২০০৫) বলাই বাহুল্য, এগুলো নিয়েও ফসিলবিদগণ একমত নন।

Darwinius masillae

এই ফসিলকে মানুষ ও স্তন্যপায়ীর মাঝে যোগসূত্র বলে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়। পরে জানা যায়, এটি লেমুরের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে; কিন্তু মানুষের সাথে নয়!

ছবি : *PLOS One*

অস্ট্রালোপিথিকাস ও এর আগের ফসিলগুলো মূলত শিম্পাঞ্জির সাথে মিলে, অন্যদিকে হোমো নামের ফসিলগুলো আধুনিক মানুষের সাথে মিল-সম্পন্ন। কিন্তু এই দুয়ের সংযোগকারী কোনো ফসিল নেই! (এই বিশাল ঘাটতি ধামাচাপা দেওয়ার লক্ষ্যেই এককালে পিল্টডাউন ভাঁওতা সাজানো হয়েছিল!) আগে মনে করা হতো, *হোমো হ্যাবিলিস* হয়তো *অস্ট্রালোপিথিকাস* ও *হোমো* গণের মাঝে সংযোগকারী ফসিল।

www.QuranerAlo.net

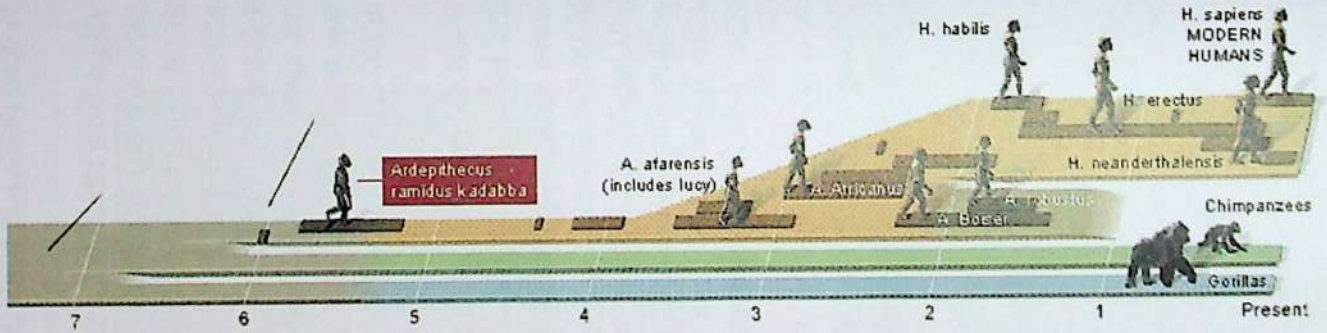

ডারউইন তার অরিজিন অফ স্পিসিজ গ্রন্থে মানব-বিবর্তন নিয়ে কিছু বলেননি। স্রেফ আশা ব্যক্ত করেছেন—বিবর্তনের গাথায় একদিন মানবেতিহাসও সাজানো হবে। আমজনতা-পর্যায়ে-প্রচলিত মানব-বিবর্তনের ধারণা অনেকটা এমন - প্রায় ৬০ লক্ষ ছর আগে মানুষ প্রথম সোজা হয়ে দাঁড়াল, ক্রমান্বয়ে তাদের মস্তিষ্ক বড়ো হলো, তারা নানাবিধ যন্ত্রপাতি আবিষ্কার ও ব্যবহার শুরু করল, আর এভাবেই উন্নত মানুষের জয়গান রচিত হলো। (ড. জাফর ইকবাল, ২০১৮) বিবর্তনবাদী ফসিলবিদ ড. হেনরি গী এই ধারণাকে 'গল্প' বলে আখ্যায়িত করে বলেন - নতুন কোনো ফসিল পাওয়া গেলে আমরা এই গল্পের মাঝে তাকে ঠেসে দিই; নাম দিই - মিসিং লিংক! অথচ বাস্তবতা হলো - এই গল্পের পুরোটাই মানুষের বানানো, মানুষ তার কুসংস্কার অনুযায়ী একে গুছিয়ে নিয়েছে! প্রতিটি ফসিল প্রকৃতপক্ষে বিচ্ছিন্ন বিন্দুর মতো। তার চারপাশে সাগরসম শূন্যতা। এক ফসিলের সাথে অন্য ফসিলের সম্পর্ক জানার কার্যত কোনো উপায় আসলে নেই। (ড. হেনরি গী, ২০০০) তা ছাড়া এই গল্প একেকজন একেকভাবে বলেন। নতুন-পাওয়া ফসিলের ভিত্তিতে আগের ধারণা প্রায়ই নতুন করে লিখতে হয়। নৃতত্ত্ববিদ জিওফ্রে ক্লার্ক ভালই বলেছিলেন, মানুষের বিবর্তনগাথা হলো তাসের ঘরের মতো। একটি তাস সরান, পুরো বিবর্তন-তাসের-ঘর ভেঙে পড়তে উদ্যত হবে। ফি-বছর বদলে যায় বিবর্তনের গল্প; শুধু বদলায় না বিবর্তনের মূলভিত্তি, আর তা হলো প্রকৃতিবাদের প্রতি আনুগত্য।

মূলছবি : টাইম ম্যাগাজিন

www.QuranerAlo.net

Contents

এই হ্যাবিলিস থেকে হোমো ইরেকটাস এবং তার থেকে নিয়েন্ডারথাল হয়ে হোমো স্যাপিয়েনস আবির্ভূত হয়েছে। (ড. নিশীথ কুমার পাল, ২০১৪) কিন্তু পরে জানা গেছে হ্যাবিলিস ও ইরেকটাস লক্ষ লক্ষ বছর সহাবস্থানে ছিল, তাই হ্যাবিলিসকে আর পূর্বপুরুষ গণ্য করা যাচ্ছে না। (শিথ বরেনস্টেইন, ২০০৭) অন্যদিকে সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে একদল ফসিলবিদ বলছেন—হোমো রুডলফেনসিস ও হ্যাবিলিস এরা আসলে হোমো ইরেকটাস-এর অন্তর্ভুক্ত! ভিন্ন প্রজাতি নয়! (সিড পার্কিনস, ২০১৩) অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে অস্ট্রালোপিথিকাস ও হোমো-এর মাঝে কোনো সংযোগকারী ফসিল নেই। এই বাস্তবতা বিবর্তনবাদীরাই স্বীকার করেছেন :

> অস্ট্রালোপিথিকাস ও হোমো গণের গোড়ার দিকের ফসিলের মাঝে বিশাল শূন্যস্থান দেখা যায়। দুইয়ের মাঝে সংযোগকারী কিছু নেই। (আর্নস্ট মায়ার, ২০০৪)

> গত পঞ্চাশ বছর ধরে সংগৃহীত ফসিল-প্রমাণ এবং বিশ্লেষণ-প্রযুক্তি কাজে লাগানোর পরও [অস্ট্রালোপিথ থেকে] কীভাবে হোমো আসলো—এই প্রশ্নের জবাব এখনও মেলেনি। (বার্নাড উড, ২০১৪)

হোমো নামের ফসিলগুলো আসলে মানুষের মতোই। রাস্তায় কোনো হোমো ইরেকটাস-এর সাথে দেখা হয়ে গেলে তুমি তাকে মানুষ থেকে আলাদাই করতে পারবে না! তা ছাড়া সাম্প্রতিক সময়ে দেখা যাচ্ছে, নিয়েন্ডারথালও আসলে আমাদের মতোই মানুষ। ইচ্ছে করে তাদের অবমূল্যায়ন করেছিল, অবমানব মনে করেছিল সাদা চামড়াওয়ালারা। (জো আলপার, ২০০৩) এইসব ফসিলাদি ঘেঁটে আমার কী মনে হয়েছে জানো? এরা সকলে আমাদের মতোই মানুষ, তারা বিবর্তনবাদীদের বলির শিকার হয়েছে মাত্র! বিবর্তনবাদী কুসংস্কারের জালে আটকা পড়ে উড়নচণ্ডী পূর্বপুরুষ হয়ে গেছে। এমনি এমনি বলছি না, প্রমাণ বিবেচনা করেই বলছি। (ড. জন স্যানফোর্ড ও ক্রিস্টফার রুপ, ২০১৯)

একটু খুলে বলি। গত শতক থেকে চলে আসা বিবর্তন-ধারণা অনুযায়ী, কোনো ফসিলকে হোমিনিড পূর্বপুরুষ হিসেবে গণ্য হতে হলে সেটার বয়স সর্বোচ্চ ৬০ লক্ষ থেকে ৭০ লক্ষ বছর পর্যন্ত হতে পারবে! (একে টেম্পোরাল বায়াস বলা হয় - বার্নাড উড, ২০০৫) আর আধুনিক মানুষ মোটামুটি ২০,০০০ থেকে ১ লক্ষ বছর আগে আবির্ভূত হয়েছে মনে করা হয়। যে প্রমাণই আসুক না কেন তারা চেষ্টা করে এই গল্পের মাঝে তাকে ঠেসে দিতে। (থিওরি লেডেনেনস) মানুষের মতো দেখতে কোনো ফসিল বা কোনো তৈজসপত্র যদি তাদের বেঁধে-দেওয়া সময়কে অতিক্রম করে তা হলে সেই প্রমাণগুলো হয় অগ্রাহ্য করা হয়, প্রবল বিরোধীতায় দমিয়ে রাখা হয় অথবা ব্যাখ্যার জালে ফাঁসিয়ে জনসম্মুখ থেকে সরিয়ে ফেলা হয়!

কিছুদিন আগে গ্রিসে প্রায় ৫৭ লক্ষ বছর পুরোনো পায়ের ছাপ পাওয়া গেছে যা

www.QuranerAlo.net

গ্রিসের ত্রাখিলোস-এ সাম্প্রতিক সময়ে খুঁজে পাওয়া মানব পদচিহ্ন।
ছবি : জেরাল্ড গিয়েরলেন্স্কি

পুরোই আধুনিক মানুষের পায়ের মতো! (জেরাল্ড গিয়েরলেন্স্কি এট এল., ২০১৭) কিন্তু বিবর্তনের ধারণা অনুযায়ী তা অসম্ভব! তাই অনেক জার্নাল তাদের আবিষ্কার ছাপতে চাইল না। উল্টো তাদের সাথে শত্রুতা শুরু করল। ব্যাখ্যার জালে ফাঁসিয়ে দিল আবিষ্কারকে! আবিষ্কারকদের একজনের ভাষায়, 'ওরা আমাদের টুঁটি চেপে ধরতে চাচ্ছিল!' (এমিলি শ্যাং, ২০১৮)

তানজানিয়ার লেতোলি-তে আরও পায়ের ছাপ পাওয়া গিয়েছিল যা আনুমানিক ৩৬ লক্ষ বছর পুরোনো। এই ছাপগুলো দেখতে প্রায় হুবহু আজকের মানুষের পায়ের ছাপের মতোই! (জেরি কোয়েন, ২০০৯) কিন্তু সেটি বিবর্তনের গল্পের সাথে মিলে না দেখে বলা হলো, এই ছাপ হয়তো অস্ট্রালোপিথিকাস অ্যাফারেনসিস-এর। (শ্যানা মন্টানারি, ২০১৬) কিন্তু ঝামেলা হলো, অ্যাফারেনসিস আদৌ দু-পায়ে হাঁটতে পারত কি না তা নিয়ে বিবর্তনবাদীদের মাঝে বিতর্ক আছে। সাম্প্রতিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে অ্যাফারেনসিস আজকের শিম্পাঞ্জি বা গরিলার মতোই চারপায়ে হাঁটত! (মার্ক কলার্ড ও লেসলি এইলো, ২০০০) যারা বলেছেন অ্যাফারেনসিস দু-পায়ে হাঁটতে পারত, তাদের

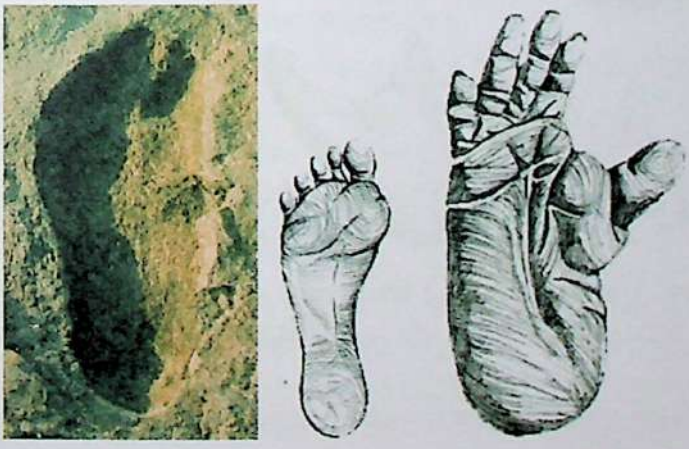

বামের ছবিটি লেতোলি-তে পাওয়া পায়ের ছাপ। ডানে মানুষ ও শিম্পাঞ্জি-জাতীয় প্রাণিদের পায়ের ছাপের গঠন। ছবি দেখে কারোই এটা বুঝতে কষ্ট হওয়ার কথা না যে লেতোলি'র পায়ের ছাপ আফ্রিকার মানুষের পায়ের মতো।

ছবি : ব্রিটানিকা

www.QuranerAlo.net

বক্তব্য হলো—এটি স্বল্প দূরত্ব দুই পায়ে ভর দিয়ে হাঁটতে পারত। (বার্নাড উড, ২০০৫) তাই যদি হয়, তা হলে ওদের পায়ের ছাপ আজকের মানুষের মতো হওয়ার কথা না। কারণ, এখনকার শিম্পাঞ্জিরাও কিছুদূর দুই পায়ে হাঁটতে বা দৌড়াতে পারে, তাই না? (বিজিএস ভিডিও, ইউটিউব) তাই বলে ওদের পা তো আর মানুষের মতো না।

এ ছাড়াও কিছুদিন আগে যুক্তরাজ্যে পায়ের ছাপের দেখা মিলেছে যা প্রায় ১০ লক্ষ বছরের পুরোনো। বিজ্ঞানীদের গবেষণা বলছে এই ছাপও আধুনিক মানুষের পায়ের মতো! (নিক এস্টন এট এল., ২০১৪) কিন্তু বিবর্তনের টেম্পোরাল বায়াস অনুযায়ী ১-২ লক্ষ বছর আগে মানুষের পায়ের ছাপ থাকা গ্রহণযোগ্য না। তাই বলা হলো এটা কোনো অজ্ঞাত হোমিনিন পূর্বপুরুষের ছাপ!

এগুলো ছাড়াও আরও অনেক ফসিল, পাথরের তৈরি তৈজসপত্র ও হাতিয়ার পাওয়া গেছে যা বহু প্রাচীন, বিবর্তনের গল্পের সাথে মিলে না। তাই তাদের নানাভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে। (মাইকেল ক্রেমো, ২০১৪)

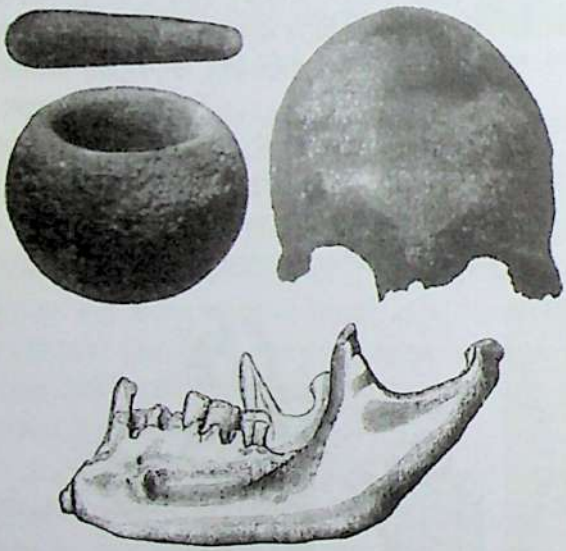

বাদ পড়া অজস্র ফসিলের মাঝে অল্পকিছু নমুনা। বামে থাকা মর্টার পেস্টল প্রায় তিন কোটি থেকে পাঁচ কোটি বছরের পুরানো। ডানে থাকা মাথার খুলি (বুয়েন্স আয়ার্স স্কাল) প্রায় ১৮ লক্ষ বছর পুরানো। নিচে থাকা চোয়ালের হাড় (ফক্সহল জ) পায় ত্রিশ লক্ষ বছর পুরোনো। বিবর্তনের গল্পের সাথে মিলে না বলে এমন অনেক ফসিলকে নানাভাবে জনসম্মুখ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ছবি: টকস অ্যাট গুগল

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে বিবর্তনের বিজ্ঞান মূলত প্রমাণ থেকে সিদ্ধান্তের দিকে যায় না; বরং আগে থেকেই সত্য বলে ধরে নেওয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রমাণ গ্রহণ বা বাতিল করে।

মুক্তচিন্তার দ্বার রুদ্ধ করে অনেক প্রমাণ সরিয়ে দিতে চায় মানসপটে থেকে।

www.QuranerAlo.net

দি মিথ অফ ১%

Any ape can reach for a banana, but
only humans can reach for the stars.
~V.S. Ramachandran

ফসিল দিয়ে মানুষের বিবর্তনের গাথা মেলানো সংশয়-সন্দেহে পূর্ণ ও নিশ্চয়তাহীন বলে কেউ কেউ ভাবলেন—আণবিক পর্যায়ে মিল দেখে কিছু বের করা যায় কি না! আণবিক জীববিদ্যার বিকাশের পর প্রোটিন, RNA বা DNA পর্যায়ে মিল খোঁজার চল শুরু হয়। এক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা শুরুতেই ধরে নিলেন যে সাধারণ-পূর্বপুরুষ প্রমাণিত! তারপর আণবিক সাদৃশ্য খুঁজতে লাগলেন! যেমন : ১৯৭৫ সালে মেরি-ক্লেয়ার কিং ও অ্যালান উইলসন মানুষ ও শিম্পাঞ্জির মাঝে আণবিক পর্যায়ে মিল খুঁজতে নামলেন। তখনও পর্যন্ত আধুনিক জিনপ্রযুক্তির উদ্ভব হয়নি। তাই তারা পরোক্ষভাবে প্রোটিন ও নিউক্লিয়িক এসিডকে ব্যবহার করে মিল খোঁজার চেষ্টা করলেন এবং জানালেন—আণবিক পর্যায়ে মানুষ ও শিম্পাঞ্জির মাঝে সম্ভাব্য মিল প্রায় ৯৯%! (কিং ও উইলসন, ১৯৭৫) প্রায় সাথে সাথেই এই কথা মিডিয়াতে চাউর হয়ে যায়; তাদের গবেষণাপত্রটি বিশ শতকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পেপারে পরিণত হয়!

তবে আফসোসের ব্যাপার হলো, সম্ভাব্য মিলকে মিডিয়াতে নিশ্চিত মিল বলে প্রচার করা হতে থাকে!

প্রচলিত বইপত্রে বলা হয় মানুষ আর শিম্পাঞ্জি একটি বানর-জাতীয় সাধারণ-পূর্বপুরুষ থেকে এসেছে সন্দেহ নেই; কারণ আণবিক পর্যায়ে এদের মাঝে সাদৃশ্য অনেক। এ-জাতীয় যুক্তির সমস্যা হোমোলজি নিয়ে আলোচনার সময় আমরা দেখেছি। পাশাপাশি, বিজ্ঞানের কর্মপদ্ধতি আলোচনার সময় আমরা দেখেছি—বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত অনেক ক্ষেত্রেই পরিসংখ্যান থেকে পাওয়া সম্ভাবনা মাত্র। পরিসংখ্যানগতভাবে এই ফল তাৎপর্যপূর্ণ ধরা হয় যদি কপাল ফেরে সেই ফল পাওয়ার সম্ভাবনা ১/২০ হয়। (P-value < 0.05) তার মানে এই না যে এই ফল সঠিক বা সত্য। তাই মিল পেলেই কারও সাধারণ পূর্বপুরুষ এক সন্দেহ নেই—এমন ভাবা দুর্বল চিন্তার লক্ষণ।

বিবর্তনবাদী বিজ্ঞান-দার্শনিকের মতে (এলিয়ট সোবার, ২০০৮) :

www.QuranerAlo.net

> মানুষ আর শিম্পাঞ্জি অবশ্যই সাধারণ পুর্বপুরুষ থেকে এসেছে, কারণ তাদের মাঝে অনেক মিল... এমন ভাবনা স্রেফ শিশুতোষ চিন্তা। বিজ্ঞানের সম্ভাবনামূলক কাঠামোর মাঝে 'নিশ্চিত' বলে কিছু নেই।

এক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার লক্ষণীয়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, বিজ্ঞানীরা একপাশে মানুষের সম্পূর্ণ জিনোম ও অন্যপাশে শিম্পাঞ্জির সম্পূর্ন জিনোম নিয়ে, চিরুনি-অভিযান চালিয়ে এই মিল খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু বাস্তবতা এই অনুমান থেকে বহুদূরে! তখন বিজ্ঞানীরা ভাবতেন DNA'র কাজ কেবলই প্রোটিন তৈরির সংকেত বহন করা। সুতরাং DNA'র যে অংশে প্রোটিন তৈরির সংকেত নেই তা স্রেফ আবর্জনা; এর কোনো কাজ নেই। তারা দেখলেন মানব জিনোমের মাত্র ১-২ শতাংশ হয়তো প্রোটিন তৈরির সংকেত বহন করে, বাকি ৯৮%ই মূলত নিষ্ক্রিয়। এই ৯৮%-কে তারা DNA-আবর্জনা বলে পাশ কাটিয়ে গেলেন। সেদিকে মন না দিয়ে পরোক্ষভাবে জিনোমের মাত্র ১-২ শতাংশের কিছু অংশকে পরোক্ষভাবে তুলনা করলেন। অর্থাৎ কিং ও উইলসন পুরো জিনোমের মাত্র ১% এর কিছু অংশকে তুলনা করে গাণিতিক সম্ভাব্যতা জানালেন মানুষ ও শিম্পাঞ্জির মাঝে প্রায় ৯৯% মিল মনে হচ্ছে! (জোনাথন মার্কস, ২০০২) অথচ ফলাও করে প্রচার করা হলো—মানুষ ও শিম্পাঞ্জির জিনোমের প্রায় ৯৯% একইরকম!

এরপরে আরও কিছু পরীক্ষা হয়েছে। বিভিন্ন গবেষণায় মানুষ ও শিম্পাঞ্জির মাঝে আণবিক পর্যায়ে সম্ভাবনামূলক সাদৃশ্য এসেছে ৭০-৯৮ % এর মতো। এক্ষেত্রে মূলত পরিসংখ্যান কাজে লাগিয়ে আণবিক পর্যায়ের অংশবিশেষকে তুলনা করা হয়েছে (হিমোগ্লোবিনের জিন, mtDNA ইত্যাদি), পুরো জিনোম নয়। এক্ষেত্রেও বিজ্ঞানীরা DNA'র যে অংশের কাজ ধরতে পারেননি, তাকে আবর্জনা বলে বাদ দিয়েছেন। (জোনাথন মার্কস, ২০০২) কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি, DNA আবর্জনা মূলত আবর্জনা নয়; বরং তথ্যের সাগর! (জর্জিও বেনার্ডি, ২০১৯) এই বিশাল অংশকে তুলনা করাই হয়নি, আগেই বলে দেওয়া হলো ৯৯% মিল!

অথচ সাম্প্রতিককালে গবেষকরা ভাবছেন এই জাংক-DNA'র কারণেই হয়তো মানুষ আর শিম্পাঞ্জিতে এত বেমিল! (সাইন্স ডেইলি, ২০১১)

প্রচলিত বিজ্ঞান বইতে স্রেফ সাদৃশ্যের জপমালাই শোনা যায়। (ড. জাফর ইকবাল, ২০১৮) পাঠ্যবইয়েরও একই হাল। উচ্চমাধ্যমিক পাঠ্যবইয়ের ভাষায়, 'মানুষের জিনোমের সাথে শিম্পাঞ্জির জিনোমের ৯৮ ভাগ এবং গরিলা জিনোমের ৯৭ ভাগ মিল রয়েছে।' (আবুল হাসান, জুন ২০১৯) কিন্তু মানুষ ও শিম্পাঞ্জির জিনোমের কোডিং এলাকাতেই যে প্রায় ৪ কোটি নিউক্লিওটাইডে কোনো মিল নেই, একথা শোনা যায় না! (ন্যাটালি ওয়ালকভার, ২০১১) DNA-তে এতই মিল থাকলে মানুষ ও শিম্পাঞ্জির প্রোটিনের গঠনও একই হওয়ার কথা, কারণ প্রচলিত ধারণায় DNA'র সংকেতই

www.QuranerAlo.net

তো প্রোটিনে পরিণত হয়। কিন্তু মানুষ ও শিম্পাঞ্জি উভয়েরই আছে এমন ১২৭টি প্রোটিনের গঠন তুলনা করে দেখা গেছে ৮০% ক্ষেত্রে কোনো মিল নেই! (জেরেমি টেইলর, ২০০৯)

মজার ব্যাপার হলো, মানুষ ও শিম্পাঞ্জির সাধারণ পূর্বপুরুষ ঠিক করার মানদণ্ড নিয়েও বিশাল ঝঞ্ঝাট দেখা যায়। জিনগত মিল দেখে অনুমান করা হয়—মানুষ ও শিম্পাঞ্জি হয়তো একই সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে এসেছে। কিন্তু ফসিলের মিল বিবেচনা করলে দেখা যায়, মানুষ ও শিম্পাঞ্জির সাধারণ-পূর্বপুরুষ এক নয়, বরং ভিন্ন! (ত্রিশা গুরা, ২০০০) অন্যদিকে মানুষ আর শিম্পাঞ্জির শারীরিক গঠন আমলে নিলে এতটাই ভিন্নতা পাওয়া যায় যে, এদের ভিন্ন বর্গে (order) বা গোত্রে (family) স্থান দেওয়া লাগে! এই গবেষণা বিখ্যাত অ্যালান উইলসনেরই করা! (জেরেমি টেইলর, ২০০৯)

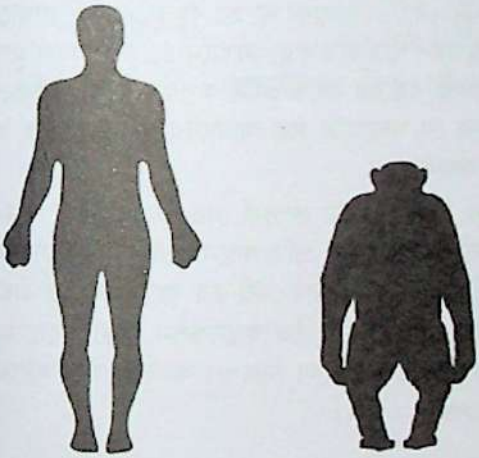

প্রচলিত ধারণায় অস্ট্রালোপিথিকাস থেকে হোমো গণ এসেছে প্রায় ৩৬ লক্ষ বছর আগে। কিন্তু মানুষের পপুলেশন সাইজ, মিউটেশনের হার ইত্যাদি হিসেব করে দেখা গেছে অস্ট্রালোপিথিকাস থেকে হোমো আসা সম্ভব না। কপালফেরে মাত্র ৮টা উপকারী মিউটেশন হয়ে পপুলেশনে স্থির হতে যে সময় লাগে তা মহাবিশ্বের বয়সের চেয়েও ৪০০ কোটি বছর বেশি! অথচ মানুষ ও শিম্পাঞ্জির জিনোমে শুধু কোডিং এলাকাতেই প্রায় ৪ কোটি নিউক্লিওটাইড ভিন্ন! জিনোমের বাকি ৯৮ ভাগ না-হয় বাদই দিলাম।

ছবি : উইকিপিডিয়া

আরেকটা ব্যাপার হলো, বিবর্তনের প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী, প্রায় ৩৬ লক্ষ বছর (3.6 my) আগে অস্ট্রালোপিথিকাস থেকে হোমো গণ এসেছে প্রচার করা হয়। আমরা বিবর্তনের প্রক্রিয়া আলোচনা করার সময় দেখেছি এলোপাথাড়ি জিনগত বদলকে জীবের মাঝে পরিবর্তন আসার কারণ হিসেবে ভাবা হয়। কালেভদ্রে পাওয়া সুবিধাজনক বদল জমে জমে অনেক কাল পরে এক প্রজাতি থেকে ভিন্ন প্রজাতি আসতে পারে এমন কল্পনা করা হয়। কিন্তু হিসেব-নিকেশ করে দেখা গেছে মানুষের ক্ষেত্রে (Hominin populatuion) কেবলমাত্র ২টি সুবিধাজনক মিউটেশন ঘটে সেটার ফিনোটাইপ পপুলেশনে স্থির হতে ৮.৪-১০ কোটি বছরেরও বেশি সময় (>84-100 my) লাগবে! (waiting time problem) ৩টি সুবিধাজনক মিউটেশন ঘটে পপুলেশনে স্থির হতে সময় লাগবে প্রায় ৩৭.৬ কোটি বছর (37.6 my)! ৮টি মিউটেশন ঘটে

www.QuranerAlo.net

কপাল ফেরে পাওয়া উপকারী মিউটেশন সংখ্যা	মিউট্যান্ট ফিনোটাইপ পপুলেশনে স্থির হতে প্রয়োজনীয় সময়
২	১৮.৪-১০ কোটি বছর
৩	৩৭.৬ কোটি বছর
৮	১৮০০ কোটি বছর

পপুলেশনে স্থির হতে সময় লাগবে প্রায় ১৮০০ কোটি বছর (18 by)! (জন স্যানফোর্ড ও ওয়েসলে ক্রয়ার এট এল., ২০১৫) অথচ মহাবিশ্বের অনুমিত বয়স হলো ১৪০০ কোটি বছর (14 by) ! পৃথিবীর অনুমিত বয়স হলো ৪৫০ কোটি বছর (4.5 by) !!

আমরা দেখেছি মানুষ ও শিম্পাঞ্জির জিনোমের শুধু কোডিং এলাকাতেই প্রায় ৪ কোটি নিউক্লিওটাইড ভিন্ন! ৯৮% নন-কোডিং এলাকা না হয় বাদই দিলাম! যেখানে মাত্র ৮টা মিউটেশন হতেই মহাবিশ্বের বয়স পার হয়ে যায়, সেখানে ৪ কোটি বদল এসে তা পপুলেশনে স্থির হবে মাত্র ৩৬ লক্ষ বছরের মাঝে এমন রূপকথা কোন যুক্তিতে মানুষ বিশ্বাস করে? মানব-বিবর্তনের যে সাদামাটা গল্প আমাদের শোনানো হয় তা যতটা না বিজ্ঞান, তারচেয়েও বেশি কল্পনা!

সাম্প্রতিককালে আণবিক সাদৃশ্য দিয়ে বিবর্তন সম্পর্ক বের করার চেষ্টা আরও বিপদের মুখে পড়েছে। সাইন্স জার্নালে প্রকাশিত প্রতিবেদনে প্রাণিবিদ প্যাসকেল বলেন, ১% পার্থক্য দিয়ে মানুষ ও শিম্পাঞ্জিকে বোঝার চেষ্টা করা বড়ো রকমের বাধা! হারানো DNA, অতিরিক্ত জিন, জিন নেটওয়ার্কে ভিন্ন কানেকশন, ক্রোমোসোমের স্বতন্ত্র গঠন—ইত্যাদি কারণে মানুষ-শিম্পাঞ্জি পার্থক্য নিরূপণ বানচাল হয়ে যাচ্ছে! জিনবিদ ভ্যান্তে পাভো বলেন (জন কোহেন, ২০০৭):

> আমার মনে হয় কোনোভাবেই এই মিল-অমিলের ব্যাপারে সংখ্যা নির্ধারণ সম্ভব না। সত্যি বলতে কী, এই পার্থক্যের বিষয়টা আসলে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যাপার।

তুমি নিজেই ভেবে দেখো, মানুষ যখন মহাকাশ থেকে ঘুরে আসছে, তখন শিম্পাঞ্জি গাছের ডালে ঝুলে উ-উ-আ-আ করে বুক চাপড়াচ্ছে। মানুষ রচনা করেছে মনোহর চিত্র, হৃদয়স্পর্শী কবিতা, কালজয়ী সাহিত্য; শিম্পাঞ্জি তখনও গাছে ঝুলে কলা খাওয়ায় লিপ্ত। মানুষের আছে ভাষা, জ্ঞান, স্বপ্ন, সাহিত্যসম্ভার, সভ্যতা, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি। মানুষের প্রতিনিধি চলে গেছে মঙ্গল গ্রহে। শিম্পাঞ্জি এখনও গাছে, চিড়িয়াখানায়। মানুষ বিশ্বব্যাপী হাজার হাজার লাইব্রেরি, বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলেছে। শিম্পাঞ্জি এখনও গাছে, চিড়িয়াখানায়।

তা ছাড়া বিজ্ঞানী পাভোর বক্তব্যের শেষ অংশটাও খেয়াল করার মতো। জিন

www.QuranerAlo.net

পর্যায়ে অন্যান্য প্রাণির সাথেও মানুষের সম্ভাব্য মিল পাওয়া গেছে। যেমন : বিড়ালের সাথে ৯০%, ইঁদুরের সাথে ৮৫%, গরুর সাথে ৮০%, মুরগির সাথে ৬০%, কলার সাথে ৬০%! কিন্তু এগুলো তেমন প্রচার পায়নি। এগুলো দেখতে এতই ভিন্ন যে, মানুষের সাথে বিড়াল বা ইঁদুরের সাধারণ পূর্বপুরুষ রয়েছে—এ ধরণের কথা সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করবে না। কিন্তু শিম্পাঞ্জির সাথে থাকা মিল বিশ্বাস করানো সহজ! তাই বিবর্তনের কাহিনি সত্য হতে হলে মানুষের সাথে শিম্পাঞ্জিকে জুড়ে দেওয়া একটি জোরালো হাতিয়ার। মানুষকে স্রেফ শিম্পাঞ্জির মতোই পশু প্রমাণ করতে পারলে মানুষেরা আলাদা মর্যাদা থাকবে না। অনেকে এই ব্যাপারটার ফায়দা এভাবে ওঠাতে পারে :

মানুষ এক তাৎপর্যহীন পশু। পশুর আবার ধর্ম কী! সুতরাং —

দুনিয়াটা মস্ত বড়
খাও দাও ফুর্তি কর
আগামীকাল বাঁচবে কী-না বলতে পারো!

www.QuranerAlo.net

রয়েছ নয়নে নয়নে

One may have good eyes and see nothing
~ Italian Proverb

যারা আড্ডা দিতে পছন্দ করেন তারা নিশ্চয়ই একটা জিনিস লক্ষ করেছেন— মানুষ সমালোচনা করতে ভারি পছন্দ করে। পৃথিবীর অনেক মানুষই হচ্ছেন কঠিন সমালোচক, তারা ভালো কিছুর প্রশংসা করা থেকে তার ভেতর থেকে খুঁত বের করে তার নিন্দা করার মাঝে অনেক বেশি আনন্দ খুঁজে পান। যারা খবরের কাগজে লেখালেখি করেন তাদের বেশিরভাগই ছিদ্রান্বেষী এবং নিন্দুক। যে-কোনো বিষয়ের দোষ খুঁজে বের করে তারা সেটা নিয়ে হা-হুতাশ করেন।

কথাগুলো এদেশের একজন জনপ্রিয় শিশুসাহিত্যিক ও ফিকশন লেখকের। তিনি মানবদেহে ডিজাইন-সমস্যার পক্ষে আলোচনা শুরু করেছেন মানুষের একটি চিরাচরিত স্বভাবের উল্লেখ করে। (ড. জাফর ইকবাল, ২০১৯) তোমরাও খেয়াল করলে দেখবে, মানুষের সমালোচনার অধিকাংশই মূলত জ্ঞান বা যুক্তিপ্রসূত হয় না; বরং নিজস্ব পছন্দ, আবেগ বা অহংকারপ্রসূত হয়ে থাকে। মানুষ অনেক সময়ই কগনিটিভ বায়াসে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। কোনো বিষয়কে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া অন্য কোনো আঙ্গিকে দেখতে চায় না। তার আঁতে ঘা লাগে। (স্টিভেন স্টসনি, ২০১৪)

বাংলা একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত এই লেখক বিজ্ঞান-বিষয়ক বইতে মানবদেহে ডিজাইন-সমস্যার কথা বলতে গিয়ে শুরুতেই উল্লেখ করেছেন মেয়েদের মাসিক ও গর্ভধারণের কষ্টের কথা। সত্যি বলতে কী, আমি এতে অবাকই হয়েছি! যে ব্যাপারকে তিনি ডিজাইন সমস্যা বললেন সেটা না থাকলে তার জন্মই হতো না, মানব-সভ্যতা থেমে যেত—এটা তো ভাবা উচিত ছিল! কথায় আছে না—No pain, No gain! নারীজাতির এই কষ্টের ফসল যে মানব-সভ্যতা, এটা অনুধাবন করে তো নারীদের মাথা উঁচু হয়ে যাওয়ার কথা! অথচ কোনো কোনো বুদ্ধিজীবীকে বলতে দেখা যায়, 'গর্ভবতী নারী দেখতে অনেকটা গর্ভবতী পশুরই মতো, দৃশ্য হিসেবে গর্ভবতী নারী শোভন নয়...।' আমি হতবাক হয়ে যাই! এই লেখক কি তার নিজের মা সম্পর্কেও এমন কথা বলবেন! নারী কি শুধুই এদের দর্শনের বস্তু!

যারা অনেক চেষ্টার পরও বাচ্চা নিতে পারছেন না তাদের জিজ্ঞেস করে দেখুন,

www.QuranerAlo.net

এই 'গর্ভযন্ত্রণা'র জন্য কতটা ব্যাকুল হয়ে আছেন। হাসপাতালের *গাইনি এন্ড অবস* বিভাগে কাজ করার সময় এমন অনেক পরিবারের আকুলতা আমি নিজের চোখে দেখেছি।

উপরের আলোচনার পরেই লেখক বিবর্তনবাদীদের খুব প্রিয় একটি দাবিকে সহজ করে লিখেছেন। তাদের দাবির সহজ সমীকরণ হলো—মানবদেহে ডিজাইনগত গোলমাল আছে। কোনো বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন স্রষ্টা এমন গুবলেট পাকাবেন না। সুতরাং মানুষ এলোপাথাড়ি-উদ্দেশ্যহীন বিবর্তনের ফলে আবির্ভূত হয়েছে। (রিচার্ড ডকিন্স, ১৯৮৬) দাবিটি সহজ বটে, তবে শিশুতোষ! এই দাবির পক্ষে মানুষের চোখকে নমুনা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। চলো দেখি লেখক কী বলেন (ড. জাফর ইকবাল, ২০১৯) :

"চোখের লেন্সের ভেতর দিয়ে আলো চোখের পিছনের রেটিনাতে এসে পড়ে। রেটিনার থেকে আলোর সংকেতগুলো নার্ভের ভেতর দিয়ে মস্তিষ্কে পৌঁছায়। বিজ্ঞানী না হয়েও সবাই অনুমান করতে পারবে যে রেটিনার মাঝে নিশ্চয়ই আলো সংবেদন কোষ রয়েছে। এই কোষ থেকে আলোর সংকেতগুলো মস্তিষ্কে নিয়ে যায় নার্ভ। এখন কথা হচ্ছে, আলো সংবেদন কোষগুলোর সাথে নার্ভের সংযোগটা কীভাবে হওয়া উচিত? আলো সংবেদন কোষগুলো থাকবে উপরে, তার নিচে থাকবে নার্ভ। নার্ভ যদি উপরে থাকে তা হলে সমস্যা দ্বিমুখী;

প্রথমত, কোষগুলোর উপর সেগুলো যদি ছড়িয়ে থাকে, তার ভেতর দিয়ে রক্তের প্রবাহ হয় তা হলে সেটা আলোর উপর প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবে, আলোকে এই নার্ভগুলো ভেদ করে আলো সংবেদন কোষে পৌঁছাতে হবে।

দ্বিতীয়ত, নার্ভগুলোকে একত্র করে সেটাকে রেটিনা ভেদ করে পিছনে পৌঁছাতে হবে। কাজেই কারও যদি চোখকে ভালো করে ডিজাইন করতে হয় তা হলে **অবশ্য অবশ্যই** তার আলো সংবেদন কোষগুলো রাখতে হবে উপরে, নার্ভগুলো রাখতে হবে নিচে।

কিন্তু অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, মানুষের চোখে রেটিনার নিচে নয় রেটিনার উপরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে নার্ভ। সেই নার্ভগুলো একত্র হয়ে একটা বিন্দুতে রেটিনাকে ভেদ করে পিছনে যায়। যে বিন্দুতে সেটা রেটিনাকে ভেদ করে তার নাম অন্ধবিন্দু, কারণ সেখানে আলো পড়লেও কিছু দেখা যায় না। ... মানুষের চোখের যে ডিজাইন সমস্যা আছে সেই সমস্যাটি কিন্তু কিছু কিছু প্রাণির চোখে সমাধান করা হয়েছে। যেমন অক্টোপাস বা স্কুইড তাদের চোখে কিন্তু আলো সংবেদন কোষ উপরে নার্ভগুলো নিচে—ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত ছিল।"

সহজ কথায় আলোক উদ্দীপনা যে কোষগুলো গ্রহণ করবে (রডকোষ আর কোণকোষ) তাদের থাকা উচিত আলোর মুখোমুখি। তাদের সাথে সংযোগ থাকা চক্ষুস্নায়ু পেছন দিক দিয়ে বেরিয়ে চলে যাবে মস্তিষ্কে। কিন্তু মানব-চোখে চক্ষুস্নায়ু-সহ

www.QuranerAlo.net

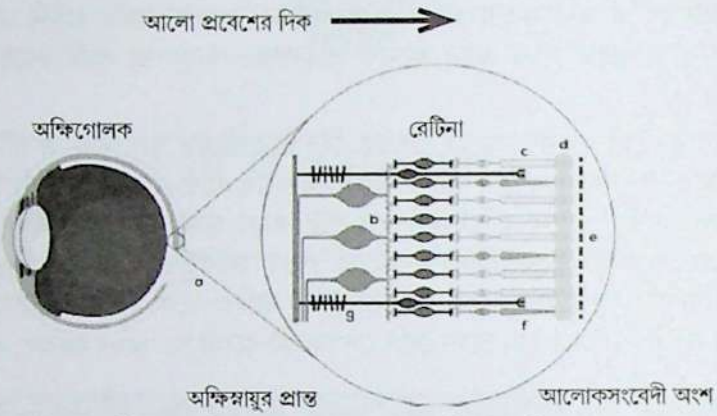

বিবর্তনবাদীদের দৃঢ়বিশ্বাস হলো, আলোকসংবেদী অংশ পিছে না থেকে সামনে থাকলেই নাকি মানব-চোখকে ডিজাইনড বলা যেত। তাদের এই দৃঢ়বিশ্বাসের বাস্তবতা অনুধাবনের জন্য রেটিনার গঠন বোঝা জরুরি।
ছবি : ব্রায়ান ও আংকা

আরও অনেক কোষ আলোক সংবেদী কোষের সামনে বসে আছে। এ কেমন কথা! বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি অক্টোপাসের চোখ-এ জীববিজ্ঞানী টুহাস, বিজ্ঞান একাডেমির মহাপরিচালক মহামান্য কিহিকে এই কথাই বলছিলেন—মানুষের চোখ ত্রুটিযুক্ত, অক্টোপাসের মতো সেফালোপডদের চোখ ঠিকঠাক আছে! (ড. জাফর ইকবাল, ২০১৬)

প্রায় ৬০০ মেগাপিক্সেলের যে চোখ দিয়ে আমরা বিশ্ব দেখি তা নিয়ে আমরা গভীরভাবে ভাবি না বললেই চলে। চিকিৎসক হওয়ার সুবাদে মানব-চোখ নিয়ে বিশদভাবে আমাকে পড়তে হয়েছে; এর বিভিন্ন অংশের গঠন, শারীরবৃত্তি, রোগ ইত্যাদি। চূড়ান্ত পেশাগত পরীক্ষায় সার্জারি ২য় পত্রের অর্ধেকটাই ছিল চোখবিদ্যা বা অপথালমোলজি। চোখের ডিজাইন ঠিক নেই—এমন শিশুতোষ-কথা চিকিৎসাবিদ্যার পাঠ্যবইতে আমি পাইনি। বরং যা পড়েছি তাতে চোখের সুনিপুণ গঠন আমাকে তখনও চমকিত করেছে, এখনও করে।

আমরা জানি মস্তিষ্ক খুব পেটুক টাইপের। এর ওজন দেহের ২% হলেও, দেহে থাকা অক্সিজেনের প্রায় ২০% সে গপগপ করে খেয়ে ফেলে। আর এই মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের মাঝে সবচেয়ে বেশি পেটুক হলো ভিজুয়াল সিস্টেম। ভিজুয়াল সিস্টেমের মাঝে সবচেয়ে বেশি পেটুক হলো রেটিনা, বিশেষ করে আলোকসংবেদী কোষগুলো। প্রতি চোখে রডকোষ থাকে প্রায় ১২ কোটি, আর কোণকোষ থাকে প্রায় ৭০ লক্ষ! এখানে বিপাক ক্রিয়ার হার অনেক বেশি। প্রতি গ্রাম হিসেবে দেখা যায়, মস্তিষ্কের চেয়েও বেশি অক্সিজেন খেয়ে ফেলে এই রেটিনা। (লুইস বাই এট এল., ২০১৩) তোমরা জানো অক্সিজেন, গ্লুকোজ এগুলো রক্ত বয়ে নিয়ে আসে। ফলে রেটিনার রক্ত সরবরাহও অনেক বেশি লাগে। এই রক্তপ্রবাহ সুগম করতে চমকপ্রদ কিছু ব্যবস্থা করা আছে

www.QuranerAlo.net

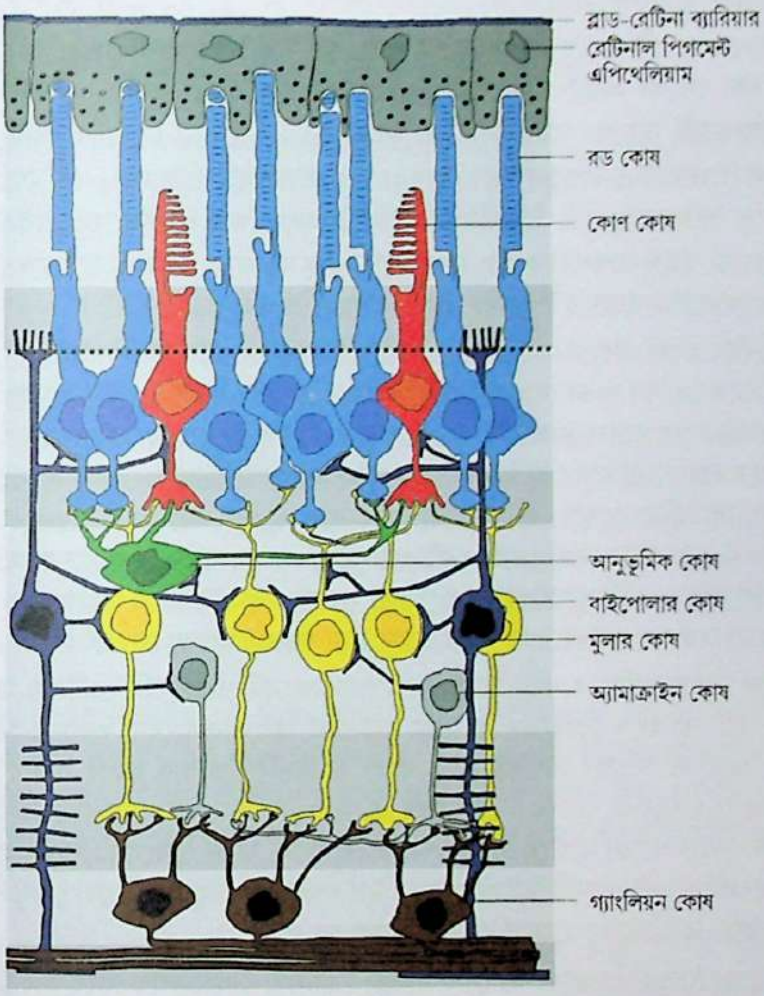

বিজ্ঞান বইপত্র, কল্পকাহিনি ইত্যাদিতে অনেক দিন থেকেই মানব-চোখকে ব্যাড ডিজাইনের নমুনা হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। এ-সকল বই যারা লিখেন তাদের প্রায় কেউই চিকিৎসক নন। ফলে পপুলার বিদেশী বইপত্রে যা পান, তাই চোখ বন্ধ করে ছেপে দেন। কিন্তু চিকিৎসকদের মানব-চোখ নিয়ে একাডমিকভাবে পড়তে হয়। ফলে বিবর্তনবাদীদের এইসব প্রলাপ তাদের কাছে মূল্যহীন। অনেক গবেষণাতেই বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন—মানব-চোখ আসলে ব্যাড ডিজাইন নয়, বরং এটি অপটিমাল ডিজাইনের দৃষ্টান্ত। ফলে প্রমাণ ও যুক্তির নিরিখে বিবর্তনবাদীদের দাবিই যে একটি ব্যাড আর্গুমেন্ট তা সহজেই বোঝা যায়।

ছবি : মার্ক গ্যাব্রিয়েল স্মিথ

www.QuranerAlo.net

চোখের রক্ত-বাহিকায়।

আলোকসংবেদী অংশে রক্ত সরবরাহ আসে রেটিনার পিছে থাকা কোরয়েড স্তরের রক্তবাহিকা থেকে। এগুলোকে কোরিওক্যাপিলারি বলা হয়। কোরিওক্যাপিলারি ও আলোকসংবেদী অংশের মাঝে নিয়ন্ত্রিত দরজা (blood-retinal barrier) তৈরি করে রেটিনাল পিগমেন্টেড এপিথেলিয়াম (RPE)। এর কাজ বহুবিধ। যেমন : এর মধ্য দিয়ে রেটিনাতে অক্সিজেন, পুষ্টি, ভিটামিন-A ইত্যাদি আসে, আর রেটিনাতে তৈরি হওয়া বর্জ, বিষাক্ত পদার্থ অপসারিত হয়; RPE রেটিনাকে ময়লা-আবর্জনা মুক্ত রাখে; গঠন বজায় রাখতে সাহায্য করে ইত্যাদি। (রাফায়েল সিমো এট এল.,২০১০)

কিডনির মতো এখানেও রক্তপ্রবাহে অটোরেগুলেশন ঘটে। পাশাপাশি রেটিনাতে প্রচুর নিউরোগ্লোবিন পাওয়া যায়; মস্তিষ্কের চেয়েও প্রায় ১০০গুণ বেশি নিউরোগ্লোবিন থাকে রেটিনাতে! আলোকসংবেদী কোষগুলোর পেটের মাঝে এরা জমজমাট আড্ডা দেয়। হিমোগ্লোবিনের মতো অক্সিজেন বহন করে এই নিউরোগ্লোবিন। পেটুক রেটিনার অক্সিজেনের চাহিদা পূরণে এটি সাহায্য করে বলে ধারণা করা হয়। (মারগারেট ওং-রিলে, ২০১০) তা ছাড়া দেখা গেছে, রেটিনার পুরুত্ব একদম সঠিক পরিমাণের, সামান্য কম-বেশি হলেও এটি অকার্যকর হয়ে পড়ত। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে আলোকসংবেদী অংশের ক্রিয়াকলাপ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

এখন বিবর্তনবাদীদের দাবি অনুযায়ী আলোকসংবেদী অংশ যদি রেটিনার উপরে থাকতে হয়, তা হলে কোরয়েড ও RPE দুটোকেই আলোকসংবেদী অংশের সামনে থাকতে হবে; যা সংবেদী অংশের বেঁচে থাকা ও উচ্চবিপাক হার বজায় রাখার জন্য আবশ্যিক। (ডেভিডসন, ২০১৮) কোরয়েড ও RPE তে অনেক আলো শোষণকারী মেলানিন রঞ্জক থাকে; এখানে প্রচুর রক্তচলাচল করে; ফলে পরিবেশ-থেকে-আগত আলোর অধিকাংশই সংবেদী অংশে পৌঁছুবে না। পক্ষান্তরে স্নায়ুকোষগুলো সে তুলনায় অধিক স্বচ্ছ। তাই আলো আসতে তেমন সমস্যা হয় না।

তা ছাড়া সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, রেটিনায় থাকা মুলার কোষ অপটিকাল ফাইবারের মতো কাজ করে! এটি রেটিনার মাঝে আলো বিক্ষিপ্ত হতে দেয় না এবং সংবেদী কোষে হাই ইনটেনসিটির আলো পৌঁছে দেয়! (স্টিফেন জুনেক, ২০১১) দেখা গেছে, মুলার কোষের উচ্চতা আর বেড় একদম সঠিক মাপের। (জোনাথন ওয়েব, ২০১৫) আরও প্রতীয়মান হচ্ছে, মুলার কোষ দৃশ্যমান আলোর প্রতি 'টিউন' করা, অন্যান্য আলো সে চোখে আসতে বাধা দেয়; আলোকে কেন্দ্রীভূত করে স্পষ্ট ছবি তৈরিতে কাজ করে। (কেট ম্যাকাল্পিন, ২০১০)

তাই সাম্প্রতিক গবেষণাপত্রের ভাষ্য অনুযায়ী (এ. লেবিন ও ই. রিবাক, ২০১০) :

> এখন বোঝা যাচ্ছে ছবির স্পষ্টতা ও প্রখরতা ভালোভাবে বোঝার জন্য রেটিনাকে সঠিকভাবেই 'ডিজাইন' করা হয়েছে।

www.QuranerAlo.net

আরেক গবেষণাপত্রের ভাষ্য (পাবলো আর্টাল এট এল.,২০০৬) :

> মানব-চোখ রোবাস্ট অপটিক্যাল ডিজাইন-এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

আরেকটি অভিযোগ শোনা যায়, চোখে থাকা অন্ধবিন্দু (Blind spot) নিয়ে। চক্ষুস্নায়ু যে স্থান দিয়ে চোখ থেকে বেরিয়ে পিছনে যায় সেখানে কোনো আলোকসংবেদী কোষ থাকে না। তাই সেখানে আলো পড়লেও কিছু দেখা যায় না। কেউ কেউ না বুঝেই এটাকে ডিজাইন-সমস্যা বানিয়ে ফেলে। আদতে এটা কোনো সমস্যাই না। প্রথমত অন্ধবিন্দু খুবই ছোটো, দ্বিতীয়ত দুই চোখের অন্ধবিন্দু ভিন্ন ভিন্ন স্থানে হওয়ায় দুই চোখে দেখতে কোনো সমস্যা হয় না। তা ছাড়া চোখের বেশকিছু রোগ নির্ণয়েও অন্ধবিন্দুকে কাজে লাগানো হয়। (কলিন ব্লেকমোর ও শেলিয়া জেনেট, ২০২০)

খোলামনে এতক্ষণের আলোচনা পড়লে চোখের ডিজাইন সহজেই বুঝে আসার কথা। তো বিবর্তনবাদীরা কী করবে? ডিজাইন মেনে নেবে? নাহ, ঘুনাক্ষরেও না! বিবর্তন তত্ত্ব এই অনুমান (assumption) নিয়ে যাত্রা শুরু করে, যে প্রকৃতিতে কোনো ডিজাইন বা উদ্দেশ্য নেই। জগৎ আর জীবন কেবলই দুর্ঘটনার ফল। তাই এইসব গবেষণাকে তারা পাত্তাই দেবে না। এ ব্যাপারে নোবেলজয়ী ফ্রান্সিস ক্রিক আগেই সতর্কবাণী শুনিয়ে দিয়েছেন (ফ্রান্সিস ক্রিক, ১৯৮৮) :

> জীববিজ্ঞানীদের সর্বদা এটা মাথায় রাখতেই হবে যে—জীবজগতে তারা যা দেখছে তা পরিকল্পিতভাবে সৃষ্ট নয় বরং বিবর্তনের ফল। তাই বলা যায়, জীববিজ্ঞানের গবেষণা পরিচালনায় বিবর্তনবাদী ধ্যানধারণা একটি বড়ো ভূমিকা রাখবে। কিন্তু ব্যাপারটা এত সহজ না। কারণ, বর্তমানে কী ঘটছে এর পর্যাপ্ত গবেষণা করা যেমন কঠিন; বিবর্তনের ইতিহাসে ঠিক কী ঘটেছিল তার সমাধান পাওয়া আরও কঠিন।

অর্থাৎ বিবর্তনবাদীদের চাপে পড়ে বিজ্ঞানীরা ডিজাইন নিয়ে চিন্তার স্বাধীনতাই হারিয়ে ফেলেছেন। তাদের মাঝে এক-দুইজন পাওয়া যাবে যারা বাস্তবতা স্বীকার করে মুখ খুলবেন। যেমন নিউরোসাইন্টিস্ট জন হেউইট বলেন (জন হেউইট, ২০১৪) :

> আলোকসংবেদী কোষগুলো রেটিনার পেছনের দিকে থাকা ডিজাইনের সীমাবদ্ধতা নয়, বরং এটি ডিজাইনের একটি ধরণ। মেরুদণ্ডী প্রাণির চোখ সেফালোপডদের মতো হলে ভালো হতো—এমন ধারণা করা মূর্খতার শামিল।

কিন্তু অধিকাংশ বিবর্তনভক্ত যখন দেখবে—আগের বাকওয়াজ আর কাজে খাটছে না, তখন বলবে—ওহ! চোখের বিন্যাস ঠিক আছে! আহা! বিবর্তনের কী কুদরত! ইভোলিউশন অফ দি গ্যাপস আর্গুমেন্ট নিয়েই তাদের রাতদিন কাটে!

www.QuranerAlo.net

আরেকটা মজার ব্যাপার হলো, যারা অক্টোপাসের চোখের পক্ষে ওকালতি করেন তারা কেউই বলেন না/জানেন না যে, অক্টোপাস ও অন্যান্য সেফালোপডরা **বর্ণান্ধ**! এরা রঙ চোখে দেখে না! (হেইলে বেনেট, ২০১৮) যাদের অক্টোপাসের চোখ এতই প্রিয়, তারা কি বর্ণিল দৃষ্টি থেকে বর্ণান্ধ হতে চান! কোনো কোনো বিজ্ঞান-লেখক তাই হয়তো চান। তাই কল্পনা করেন ভবিষ্যতে মানুষকে কৃত্রিমভাবে বদলে দিয়ে মানব-চোখের জায়গায় অক্টোপাসের চোখ, দুটি পায়ের বদলে চারটি পা ইত্যাদি বসানো হবে; মানুষের অনুমিত ডিজাইন দুর্বলতা কাটিয়ে মানুষ আরও 'পূর্ণাঙ্গ' হবে! কেমন পূর্ণাঙ্গ? লেখকের ভাষাতেই জানা যাক (ড. জাফর ইকবাল, ২০১৬):

"মহামান্য কিহি ঘাসের উপর পা দিয়ে সামনে হেঁটে যেতে থাকেন, তাকে একটা লোকালয়, একটা জনপদ খুঁজে বের করতে হবে। পৃথিবীর পূর্ণাঙ্গ মানুষকে নিজের চোখে দেখতে হবে। তার কৌতূহল আর বাধ মানতে চাইছে না। হঠাৎ মহামান্য কিহি একধরনের সতর্ক শব্দ শুনে মাথা ঘুরিয়ে তাকালেন—খানিকটা দূরে কয়েকটি চতুষ্পদ প্রাণি তাদের চারপায়ের ওপর ভর করে তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। কী বিচিত্র এই প্রাণিটি আর কী বিচিত্র তার দৃষ্টি, তার সময়ে কখনও তিনি এই ধরনের কোনো প্রাণি দেখেননি।

প্রাণিগুলো একধরনের হিংস্র শব্দ করতে করতে হঠাৎ চারপায়ে ভর করে তার দিকে এগিয়ে আসতে থাকে এবং হঠাৎ করে মহামান্য কিহি বুঝতে পারেন এগুলো আসলে মানুষ। ভয়াবহ আতংকের একটা শীতল স্রোত তার মেরুদণ্ড দিয়ে বয়ে যায়—তার ভবিষ্যতের মানুষের এটি কোন ধরনের পরিণাম? মানুষগুলো একটু কাছে এলে তিনি বুঝতে পারেন মা'দের সন্তান জন্ম দেবার কষ্ট লাঘব করার জন্যে এদের মাথা ছোটো করে দেওয়া হয়েছিল, সেজন্যে মস্তিষ্কের আকারও ছোটো হয়েছে এখন তারা আর বুদ্ধি দীপ্ত মানুষ নয় তারা এখন বুদ্ধিবৃত্তিহীন পশু। তারা সবাই উলঙ্গ, কাপড় পরার প্রয়োজনিয়তাটুকু পর্যন্ত অনুভব করে না। শরীরের ওজন সঠিকভাবে ছড়িয়ে দেবার জন্যে তারা এখন চার হাত পায়ে ছোটোছুটি করে। বিবর্তনে মানুষ একবার দুই পায়ে দাঁড়িয়েছিল এখন উল্টো বিবর্তনে আবার তারা চার পায়ে ফিরে গেছে। মহামান্য কিহি এই মানুষগুলোর দিকে বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকেন। তাদের ভেতরে আরও অনেক সূক্ষ্ম পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু সেগুলো বোঝার আগেই মানুষগুলো তাকে ধরে ফেলল—তারা তাদের হাতগুলো এখনও ব্যবহার করতে পারে। শক্ত হাতে তাকে ধরে ফেলে হিংস্র শব্দ করতে করতে মানুষগুলো দাঁত দিয়ে কামড়ে তার কণ্ঠনালী ছিড়ে ফেলল।

মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তিনি তাদের চোখের দিকে একবার তাকাতে পেরেছিলেন, বোধহীন পশুর হিংস্র চোখ, কিন্তু সেগুলো ছিল নিখুঁত অক্টোপাসের চোখ।"

মানুষ পুরোপুরি পশু হয়ে গেলেই কি বিবর্তনবাদীরা খুশি হবে?!

www.QuranerAlo.net

এপেন্ডিক্স সরগরম

Fools rush in where angels fear to tread

এক বিবর্তনবাদী জীববিদের বক্তব্য অনুযায়ী—জীববিজ্ঞান হলো এমনসব জটিল জিনিস নিয়ে মাথা খাটানোর প্রচেষ্টা, যেগুলোকে দেখলে মনে হয় এদের কোনো-না-কোনো উদ্দেশ্যে ডিজাইন করা হয়েছে। (রিচার্ড ডকিন্স, ১৯৮৬) তিনি আরও বলেছেন, '...আপনি যদি খুঁটিয়ে খেয়াল করেন... আমাদের রসায়ন, মলিকুলার বায়োলজি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন, তা হলে কোনো এক ডিজাইনারের ছাপ পেতে পারেন...' (রিচার্ড ডকিন্স, ২০০৮) কিন্তু বিবর্তন সত্য হতে গেলে ডিজাইন থাকা যাবে না। তাই স্পষ্ট চোখে দেখা সত্ত্বেও ডিজাইনকে বাতিল করার আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালায় বিবর্তনবাদীরা। অর্থাৎ বিবর্তনের বিশ্বাস অনুযায়ী প্রাণের গল্প সাজাতে গেলে এমন কিছু ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে হবে যা ডিজাইনকে বাতিল করে বা ধন্দে ফেলে দেয়।

এ লক্ষ্যে বিবর্তনের স্বপক্ষে ভেস্টিজিয়াল অর্গান বা নিষ্ক্রিয় অঙ্গসমূহকে প্রমাণ হিসেবে আনা হয়। জনপ্রিয় এক বিজ্ঞান-লেখকের কলমে জানা যায় (ড. জাফর ইকবাল ২০১৯) :

> প্রচলিত বিশ্বাস যে সবকিছুই এসেছে বিবর্তনের ভেতর দিয়ে। একটা নির্দিষ্ট পরিবেশে টিকে থাকার জন্যে বিবর্তনের ভেতর দিয়ে প্রাণিজগৎ নিজেদের পরিবর্তন করে নিয়েছে কিংবা নিচ্ছে। অনেক জায়গাতেই আমরা রয়েছি পরিবর্তন প্রক্রিয়ার ঠিক মাঝখানে, তাই দেখতে পাচ্ছি আমাদের হিসেব মিলছে না। অনেক সময়েই পরিবেশের সাথে টিকে থাকার জন্যে কোনো একটা সমাধান বলতে গেলে জোর করে চলে এসেছে যেটাকে এখন মনে হয় থাপছাড়া বা অগোছালো।

চিন্তাযাত্রার শুরুটাই বিবর্তন দিয়ে করার কারণে মানবদেহের কিছু জিনিসকে অগোছালো বলার চল শুরু হয়। উচ্চমাধ্যমিক পাঠ্যবইয়ের সংজ্ঞা অনুযায়ী, 'প্রচলিত ধারণায়, যেসব অঙ্গ একসময় পূর্বপুরুষের দেহে সুগঠিত ও কার্যক্ষম ছিল, কিন্তু পরবর্তী বংশধরের দেহে গুরুত্বহীন, অগঠিত ও অকার্যকর অবস্থায় রয়েছে সে গুলোকে নিষ্ক্রিয় অঙ্গ বলে।... পরিবেশগত কারণে মানুষে এসব অঙ্গ কোনো প্রয়োজনে না আসায় বিবর্তনের মাধ্যমে নিষ্ক্রিয় অঙ্গে রূপান্তরিত হয়েছে।' (গাজী আজমল ও গাজী আসমত, ২০১৯; ড. নিশীথ কুমার পাল, ২০১৪) ডারউইন এই ধারণা প্রস্তাব করেন তার অরিজিন

www.QuranerAlo.net

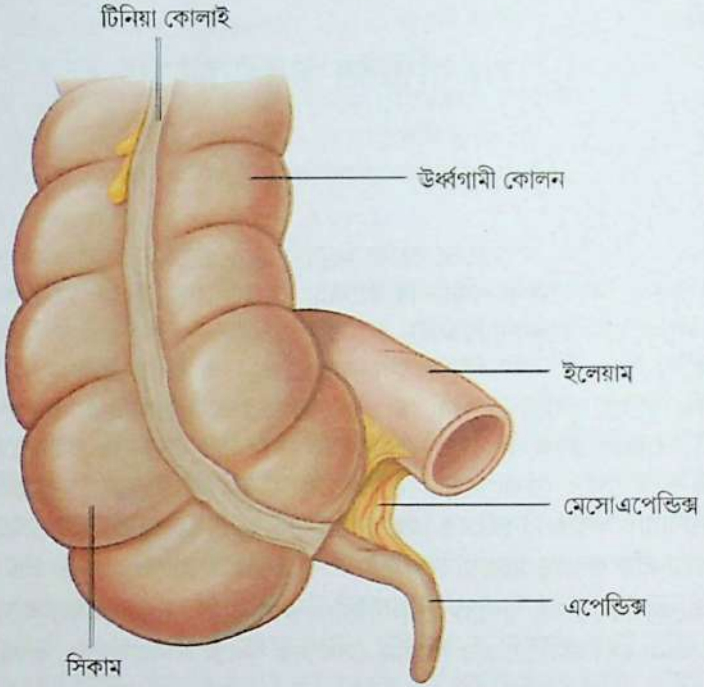

আমাদের বৃহদন্ত্রের সিকামের সাথে সংলগ্ন থাকে এপেন্ডিক্স। ডারউইনের সময় থেকেই একে নিষ্ক্রিয় বলে প্রচার করা হচ্ছে; ফলাও করে প্রচার করা হচ্ছে—এটি কাজ তো করেই না, উল্টো এপেন্ডিসাইটিস হয়ে অপারেশন টেবিলে নিয়ে যায় মানুষকে। পাঠ্যবইতেও একই অবস্থা। বিবর্তনবাদীদের গোঁড়ামির কারণে এপেনডিক্স নিয়ে গবেষণাকে আগে পাত্তাই দেওয়া হতো না। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে এসে দেখা যাচ্ছে, এতদিন ধরে আমাদের মিথ্যে শিখিয়েছে তারা। এপেন্ডিক্সের বহুবিধ ভূমিকার কারণে এখন গবেষকদের থেকেই দাবি উঠছে—এপেন্ডিক্সকে নিষ্ক্রিয় বলা বন্ধ করো। তাই বলে কি বিবর্তনবাদীরা থেমে যাবে? নাহ, গোঁড়ামি চালিয়েই যাবে!

ছবি : গ্রে'জ এনাটমি ফর স্টুডেন্টস

অফ স্পিসিস বইতে। কিন্তু এখানে সমস্যা হলো—বিবর্তন-সম্পর্ক দিয়ে ভেস্টিজিয়াল অঙ্গের সংজ্ঞা দিলে একে আর বিবর্তনের প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। কারণ সেক্ষেত্রে এটি কুযুক্তিতে পরিণত হবে! (সার্কুলার রিজনিং) একই সমস্যা আমরা হোমোলজি আলোচনার সময় দেখেছি।

প্রস্তাবিত বিভিন্ন ভেস্টিজিয়াল অঙ্গের মাঝে এপেন্ডিক্স বহুল প্রচলিত বলা যায়।

www.QuranerAlo.net

ডারউইন খেদের সাথে বলেছিলেন, '[এপেন্ডিক্স] যে শুধু বেহুদা তাই নয়, মাঝে মধ্যে এটি মৃত্যুও ডেকে আনে।' (ডারউইন, ১৮৭১) বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত বিজ্ঞান-লেখক এপেন্ডিক্স সম্পর্কে বলেন, '... ছোটো একটা টিউবের মতো এই অংশটার মানুষের শরীরে কোনো কাজই নেই।' (ড. জাফর ইকবাল, ২০১৯)

ডারউইন ও তার অনুসারীরা কাজ খুঁজে পাননি বা খুঁজতে চাননি দেখে অবুঝের মতো বলে দিয়েছেন—কোনো কাজ নেই! উচ্চমাধ্যমিক পাঠ্যবই অনুযায়ী তাদের ধারণা হলো, উঁচু জাতের প্রাইমেটে খ্যাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন হওয়ায় সিকামের ব্যবহার হ্রাস পায় ও কার্যকারিতা ধীরে ধীরে লোপ পায়। ফলে আকার পরিবর্তিত হয়ে লুপ্তপ্রায় এপেন্ডিক্স হিসেবে বিদ্যমান আছে। (ড. মোঃ আবদুল আলীম, ২০১৯) কিন্তু তাদের এই অনুমানগুলো ভুল প্রমাণিত হয়েছে! (সাইন্সডেইলি, ২০১৭) এমনকি এক বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানসাইট এপেন্ডিক্সকে 'স্বর্ণ' বলে আখ্যায়িত করছে! (ক্রিস্টোফার ওয়ানজেক, ২০০৬)

ফিটাস ও প্রাপ্তবয়স্ক—উভয়ের ক্ষেত্রেই এপেন্ডিক্সের কাজ খুঁজে পাওয়া গেছে। ফিটাল এপেন্ডিক্সে থাকা এন্ডোক্রাইন কোষ দেহের হোমিওস্ট্যাসিস বজায় রাখতে সাহায্য করে। জন্মের পর-পরই এপেন্ডিক্সে প্রতিরক্ষা-কোষ আসা শুরু হয়; এদের লিম্ফয়েড টিস্যু বলা হয়। প্রচুর পরিমাণে লিম্ফয়েড কোষ থাকায় এপেন্ডিক্স অ্যাবডোমিনাল টনসিল নামেও পরিচিত। (এ.কে. দত্ত, ২০১৮) অর্থাৎ এপেন্ডিক্স প্রতিরক্ষা অঙ্গ হিসেবে কাজ করে। এখানে B-লিম্ফোসাইট পরিপক্ক হয় এবং ইমিউনোগ্লোবিউলিন IgA তৈরি হয়; দেহের বিভিন্ন অংশে লিম্ফোসাইট পাঠাতেও এপেন্ডিক্স সাহায্য করে। দেহের প্রতিরক্ষাব্যবস্থার সাথে পরিপাকতন্ত্রের যোগাযোগ বজায় রাখতে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। (লরেন মার্টিন, ১৯৯৯) এপেনডিক্স যে দেহের প্রতিরক্ষায় ভূমিকা রাখে এটা শতবছর আগেই জানা গেছে। ব্রিটিশ জীববিদ লরেন মার্টিন সেই ১৯০০ সালেই বলেছিলেন, এপেনডিক্সকে ভেস্টিজিয়াল বা নিষ্ক্রিয় বলা ঠিক না। (রিচার্ড বেরি, ১৯০০)

এপেন্ডিক্সের প্রস্থচ্ছেদ। ছবিতে থাকা বেগুনি রঙা অংশটুকুতে ভরপুর লিম্ফয়েড ফলিকল থাকে।
ছবি : কনকর্ডিয়াল কলেজ ল্যাব

প্রাপ্তবয়স্কদের এপেন্ডিক্স প্রচুর উপকারী ব্যাকটেরিয়ার বাংলো হিসেবে কাজ করে। এখানে তারা হেসেখেলে বড়ো হয়। ডায়রিয়া রোগে অনেক উপকারী ব্যাকটেরিয়াও শরীর থেকে বের হয়ে যায়। এপেন্ডিক্স তখন পরিপাকতন্ত্রে উপকারী ব্যাকটেরিয়ার

www.QuranerAlo.net

জোগান দেয়। তাই কোনো কোনো গবেষণায় দেখা গেছে, এপেন্ডিক্স কেটে ফেলার পর অন্ত্রে ইনফেকশনের ঝুঁকি বাড়ে। (এমান্ডা ম্যাকমিলান, ২০১৭) এক গবেষণায় দেখা গেছে যাদের এপেন্ডিক্স কেটে ফেলা হয় তাদের সিউডোমেমব্রেনাস কোলাইটিস-নামক মারাত্মক রোগের ঝুঁকি প্রায় চারগুণ বাড়ে! (রব ডান, ২০১২; জিন এট এল., ২০১১)

তা ছাড়া বিভিন্ন রকম রিকন্সট্রাক্টিভ সার্জারিতেও এপেন্ডিক্সকে কাজে লাগানো হয়। যেমন : মূত্রথলি, ইউরেটার ইত্যাদির বিশেষ অপারেশন। সুতরাং স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে এপেন্ডিক্সকে 'গুরুত্বহীন, অগঠিত ও অকার্যকর' বলা যুক্তি ও প্রমাণের বিপরীত। কিন্তু এরপরও এক জনপ্রিয় বিজ্ঞান-লেখককে বলতে দেখা যায়, *'যে জিনিসটার কোনোই ব্যবহার নেই—যার একমাত্র কাজ হচ্ছে হঠাৎ করে ইনফেকশন হয়ে মানুষের জীবনে একটা বিপদ ঘটানো, সেটাকে পেটের ভেতর রেখে দেওয়ার যুক্তি কোথায়?'* (ড. জাফর ইকবাল, ২০১৯)

এখন তো বিবর্তনবাদী গবেষকরাই এপেনডিক্সকে অকাজের জিনিস বলার বিপক্ষে মত দিচ্ছেন। কেইট জনসন বলেন, 'আমার মনে হয়, এপেন্ডিক্সকে নিষ্ক্রিয় অঙ্গ বলা বন্ধ করার সময় এসেছে। মানবদেহে এর ভূমিকা নিয়ে আরও গবেষণা চালিয়ে যাওয়া উচিত।' (কেইট জনসন, ২০১৯) সাম্প্রতিক এক গবেষণাপত্রে কতিপয় বিবর্তনবাদী গবেষকরা জোরের সাথে বলেছেন (স্মিথ হেদার, ২০১৭):

> এপেন্ডিক্স একটি নিষ্ক্রিয় অঙ্গ—এমন অনুকল্পকে আমরা নিশ্চিতরূপে প্রত্যাখ্যান করলাম।

মেডিকেল পড়ুয়াদের জন্য এগুলো নতুন কিছু না। মেডিকেলের ১ম বর্ষে মানবদেহের এনাটমি পড়ার সময়েই একজন শিক্ষার্থী পাঠ্যবই থেকে জানতে পারে, *'এপেন্ডিক্সের গঠনই বলে দেয় এটা কোনো নিষ্ক্রিয় অঙ্গ নয়, বরং বিশেষ অঙ্গ।'* (এ.কে. দত্ত, ২০১৮) আসলে বিবর্তনবাদীদের হাতসাফাই ধরা ডাক্তারদের জন্য কঠিন না। (জোসেফ কুন, ২০১২) বিবর্তনবাদীদের প্ররোচনায় পড়ে পাঠ্যবইতে বেশকিছু অঙ্গকে নিষ্ক্রিয় বলা হয়েছে, যা দেখলে যে-কোনো ডাক্তার হাসবেন। যেমন: উচ্চমাধ্যমিক পাঠ্যবইতে থাইমাস গ্রন্থি, টনসিল, পিনিয়াল গ্রন্থি, কক্সিক্স/ককসিক্স ইত্যাদিকেও নিষ্ক্রিয় বলা হয়েছে। (ড. মোঃ আবদুল আলীম, ২০১৯)

অথচ দেহের প্রধান লিম্ফয়েড অঙ্গের একটি হলো থাইমাস, আরেকটি অস্থিমজ্জা। দেহের প্রতীরক্ষা কাজে নিয়োজিত কোষের উৎপত্তি ও পরিপক্কতার কাজে নিয়োজিত থাকে এরা। অস্থিমজ্জা থেকে রক্তের প্রতিরক্ষা কোষ T-লিম্ফোসাইট থাইমাসে এসে পরিপক্ক হয় ও টলারেন্স অর্জন করে—ফলে দেহকোষ থেকে বাইরের কোষ পার্থক্য করতে শেখে। (গাইটন ও হল, ২০১৫) জন্ম থেকে কারও থাইমাস না থাকলে সে মারাত্মক প্রতীরক্ষা ঘাটতিতে ভোগে! বারবার সংক্রমণের শিকার হয়। (ডেভিডসন, ২০১৮) টনসিলও প্রতীক্ষার কাজ করে। (Mucosa-associated lymphoid tissue) এরা

www.QuranerAlo.net

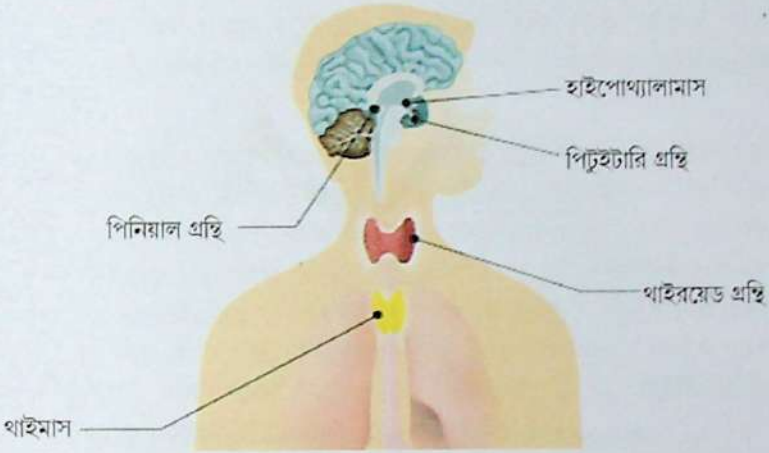

Contents

মুখগলবিলে প্রহরী হিসেবে বসে থাকে। এই পথে জীবাণু ঢুকলে নিজে যুদ্ধ করে, পাশাপাশি দেহকে জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রস্তুত হতে সাহায্য করে। (পি.এল. খিংরা, ২০১৪) দেখা গেছে টনসিলাইটিস-এর কারণে টনসিল কেটে ফেলা হলে পরে শ্বাসনালীর সংক্রমণ, এলার্জি রোগ ইত্যাদির ঝুঁকি বেড়ে যায়। (শন বায়ার্স, ২০১৮)

পিনিয়াল গ্রন্থির ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। যতই দিন যাচ্ছে এর গুরুত্ব ও কাজ চোখে পড়ছে। (রবার্ট সার্গিস, ২০১৪) পিনিয়াল গ্রন্থি থেকে মেলাটোনিন হরমোন নিঃসৃত হয়। মেলাটোনিন সারকাডিয়ান রিদমে ভূমিকা রাখে, দেহের ভেতরের অঙ্গগুলোর মাঝে সমন্বয় বজায় রাখে। এ ছাড়াও এটি শক্তিশালী এন্টি-অক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে মস্তিষ্ক ও অন্যান্য টিস্যুকে ক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করে; বুড়িয়ে যাওয়াকে মন্থর করে ইত্যাদি! (লরা স্পিনি, ২০০৮)

প্রায়ই শোনা যায় মানুষের মেরুদণ্ডের শেষপ্রান্তে থাকা ককসিক্স একটি নিষ্ক্রিয় অঙ্গ। পাঠ্যবইয়ের ভাষায়, 'মানুষের দেহে লেজ নেই, তবু মেরুদণ্ডের শেষ প্রান্তে ককসিক্স-নামক লুপ্তপ্রায় অঙ্গ রয়েছে। এই ককসিক্স মানুষের পূর্বপুরুষে সুগঠিত ছিল।' (বিজ্ঞান। নবম-দশম শ্রেণি, ২০১৯; ড. নিশীথ কুমার পাল, ২০১৪) ককসিক্স নিষ্ক্রিয় এমন কথা মেডিকেলে পড়ার সময় আমি পাইনি। বরং ডাক্তাররা জানেন, ককসিক্সের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে। এখানে বিভিন্ন পেশি, লিগামেন্ট ও টেনডন যুক্ত থাকে। শ্রোণিদেশের (pelvic region) বিভিন্ন অঙ্গ যে পেলভিক ফ্লোরের উপর বসে থাকে, তার একাংশ গঠিত হয় ককসিক্সের সাথে যুক্ত পেশি-লিগামেন্ট দিয়ে। মলদ্বারের অবস্থানকে সাপোর্ট দেওয়া ও মলত্যাগের ঐচ্ছিক নিয়ন্ত্রণে ককসিক্স ও এতে যুক্ত পেশি-লিগামেন্ট সাহায্য করে। বসে থাকা অবস্থায় ভার বহন ও স্থিতিরক্ষায় ককসিক্স কাজ করে। (জেমি স্মলউড এট এল., ২০১৪)

www.QuranerAlo.net

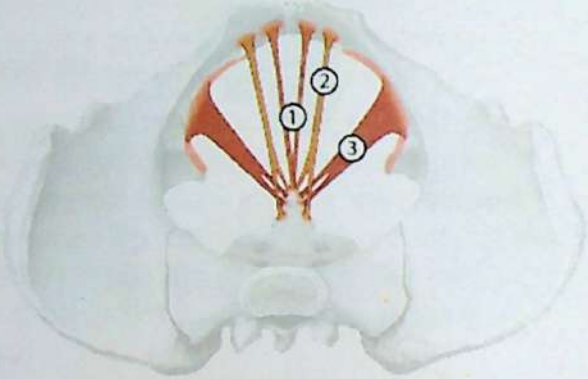

ককসিক্সের সাথে যে-সব পেশী যুক্ত হয় তার কিছু নমুনা। এছাড়াও আরো লিগামেন্ট যুক্ত থাকে এতে। পেলভিক ফ্লোর গঠনে এই পেশী-লিগামেন্ট ভূমিকা রাখে।

ছবি: গিলরয় অ্যাটলাস অফ এনাটমি

কদাচিৎ কিছু ঘটনায় দেখা গেছে, কোনো শিশু জন্মের সময় মেরুদণ্ডের নিচের অংশ থেকে বর্ধিত একটি অংশ নিয়ে জন্মেছে। ব্যস, বিবর্তনবাদীদের খুশি আর দেখে কে! মহানন্দে তারা একে বিবর্তনের প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করতে লাগল। কিন্তু ঝামেলা হলো এগুলো ছিল মূলত জন্মগত-সমস্যা (Neuroectodermal appendage), কোনো লেজ নয়। কারণ, প্রকৃত লেজে হাড় থাকে, তথাকথিত মানব লেজে তা পাওয়া যায়নি; বরং এতে চামড়া দিয়ে ঘেরা অবস্থায় চর্বি, অল্পকিছু রক্তনালী, স্নায়ু ও পেশি দেখা গেছে। তা ছাড়া এমন বর্ধিত অংশ দেহের অন্যান্য জায়গা থেকেও বের হতে দেখা গেছে। (সারাহ গ্যাসকেল ও আর্থার মারলিন, ২০১৪)

ভ্রূণবিকাশের সময় ভ্রূণের মাথার দিককে (cranial end) বলা হয় হেড (Head), আর বিপরীত/পায়ের দিককে (caudal end) বলা হয় টেইল (Tail)। বিবর্তনবাদীরা তা না বুঝে একে আসল টেইল/লেজ ভেবে আত্মহারা! অথচ গবেষণায় দেখা গেছে মানব-ভ্রূণে স্থায়ী লেজ তো দূরের কথা, 'অস্থায়ী লেজও তৈরি হয় না'! তাই মানব-ভ্রূণে মেরুদণ্ডের বর্ধিত অংশকে টেইল-বাড বলাও ঠিক না। (ফ্যাবিওলা. মুলার এবং রোনান ও-রাহিলি, ২০০৪) আরে ক্রিকেট খেলার শুরুতে কয়েন নিয়ে যখন টস করা হয়, তখন একদল হেড নেয়, অন্যদল টেইল। এই টেইলকে যদি এখন কেউ লেজ মনে করে তা হলে চিন্তাশীল মানুষ হতাশ হবে না হতবাক হবে সেটা দেখার বিষয়!

সুতরাং কয়েকটি উদাহরণ থেকেই বোঝা যাচ্ছে, দেহের কোনো অঙ্গকে নিষ্ক্রিয় বলার প্রবণতা খণ্ডজ্ঞানভিত্তিক ও দুর্বলচিন্তা-প্রসূত অভ্যাস। আজকের জ্ঞানে কাজ

www.QuranerAlo.net

Contents

বোঝা যাচ্ছে না, তাই বলে কোনো কাজ থাকতেই পারে না—এমন বলা সুস্থচিন্তার পরিপন্থী। তাই কেউ কেউ প্রস্তাব করেছেন, এই 'নিষ্ক্রিয় অঙ্গ' শব্দটা বাতিল হওয়া উচিত। তো এখন গোঁড়া বিবর্তনবাদীরা কী করবে? এই প্রমাণ মেনে নিয়ে ভেস্টিজিয়াল বলা বন্ধ করবে?

নাহ! এতদিন ধরে চলে আসা আইকন কি এত সহজে ছেড়ে দেওয়া যায়! তারা তো ভাবে, *'নিষ্ক্রিয় অঙ্গগুলোর উপস্থিতি বিবর্তনের একটি চরম সত্য নির্দেশ করে।'* (ড. নিশীথ কুমার পাল, ২০১৪) বিবর্তন টিকে থাকার জন্য ভেস্টিজিয়াল অঙ্গ দেখানো জরুরি। তাই তারা ভেস্টিজিয়াল-এর ধারণা টিকিয়ে রাখতে মরিয়া হয়ে এর সংজ্ঞাটাই বদলে দিল! তারা বলল—ভেস্টিজিয়াল বা নিষ্ক্রিয় অঙ্গ হলো এমন অঙ্গ, যা পূর্বপুরুষের দেহে যে কাজ করত সে কাজ এখন আর তা করে না। এদের কিছু কাজ হয়তো থাকতে পারে বা নতুন ছোটোখাটো কাজও দেখা যেতে পারে। (লরা স্পিনি, ২০০৮) অর্থাৎ সক্রিয় হলেও সেটাকে নিষ্ক্রিয় বলতে হবে, বিবর্তনকে বাঁচানোর জন্য!

কিন্তু তারা খেয়াল করল না এই সংজ্ঞার দ্বারা তার নিজেরাই গর্তে পড়েছে। এই সংজ্ঞা মেনে নিলে মানুষের অগ্রবাহুও ভেস্টিজিয়াল বা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়! কারণ বিবর্তনের ধারণা অনুযায়ী মানুষ চতুষ্পদী স্তন্যপায়ী প্রাণি থেকে কালক্রমে আবির্ভূত হয়েছে। (ড. জাফর ইকবাল, ২০১৮) সেক্ষেত্রে তাদের সামনের পা বিবর্তিত হয়ে মানুষের অগ্রবাহু হওয়ার কথা। মানুষের অগ্রবাহু তো আর পূর্বপুরুষের মতো হাঁটার কাজে ব্যবহার হয় না! তাই নতুন সংজ্ঞা অনুযায়ী মানুষের অগ্রবাহুও ভেস্টিজিয়াল হয় যায়! কিন্তু বিবর্তনবাদীদের কেউই অগ্রবাহুকে ভেস্টিজিয়াল বলতে চাইবে না।

আসল কথা হলো, নিজের সীমিত জ্ঞান নিয়ে খোদার উপর খোদাগিরি করা তাদের চিরাচরিত অভ্যাস। তারা খোলামনে ভাবলে নিজেদের দুর্বলতা বুঝতে পারত। প্রখ্যাত শিশুসাহিত্যিক মানব-ডিজাইনে সমস্যার কথা ফলাও করেছেন ঠিকই, পাশাপাশি তিনি ভিন্ন আঙ্গিকও উল্লেখ করেছেন (ড. জাফর ইকবাল, ২০১৯) :

> ... সব সমালোচনাই বিজ্ঞানীরা যে মেনে নিয়েছেন তা কিন্তু নয়। তাদের অনেকেই যুক্তি দেখান যে একটা ডিজাইনকে এত সহজে খারাপ বা ভুল ডিজাইন বলা ঠিক নয়। যেটাকে আপাতদৃষ্টিতে বিচিত্র বা উদ্ভট মনে হয় সেটা কিন্তু কার্যক্ষেত্রে বিচিত্র বা উদ্ভট নাও হতে পারে। যেমন যে মানুষটি জীবনে কখনও বাইসাইকেল দেখেনি তাকে যদি একটা ছোটো বাচ্চাদের ট্রাইসাইকেল আর সত্যিকারের বাইসাইকেল দেখিয়ে জিজ্ঞেস করা হয় কোন ডিজাইনটা ভালো। একেবারে গ্যারান্টি দিয়ে বলা যায় যে তারা ছোটো বাচ্চাদের ট্রাইসাইকেলের ডিজাইনটাকে বেছে নেবে, তারা কল্পনাও করতে পারবে না যে আসলে দুই চাকার বাইসাইকেল অনেক দক্ষ এবং সুশৃঙ্খল যন্ত্র। কাজেই কখনোই একটা ডিজাইনকে এত সহজে খারাপ ডিজাইন বলার আগে সেটাকে আরও অনেক খুঁটিয়ে দেখা দরকার।

www.QuranerAlo.net

কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, লেখক এই যৌক্তিক অবস্থান উল্লেখ করার পরও নিজেই তা আমলে নিতে পারেননি। উল্টো ধার্মিকদের একহাত নিয়ে আনন্দের সাথে বলেন (ড. জাফর ইকবাল, ২০১৯) :

> ধার্মিকরা কিন্তু মানুষের শরীরে ডিজাইন ত্রুটির বিষয়টি মানতেই চান না, তাদের ধারণা সেটা মেনে নিল ধর্মকে খাটো করে দেখা হয়। তাই তারা এই বিষয় নিয়ে ক্রমাগত টেঁচামেচি করে যাচ্ছেন...

আফসোস! লেখক নিজেই খুঁটিয়ে দেখলেন না। লেখার শুরুতে যাদের তিনি সমালোচনা করলেন, অজ্ঞাতসারে নিজেই তাদের কাতারে শামিল হয়ে গেলেন! আমার মনে হয় এতক্ষণের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে আমরা জনপ্রিয় লেখকের উক্তিকে একটু ভিন্নভাবে বিন্যস্ত করতে পারি :

> বিবর্তনবাদীরা মানুষের শরীরে ডিজাইন থাকার বিষয়টি মানতেই চান না, তাদের ধারণা সেটা মেনে নিল বিবর্তনকে খাটো করে দেখা হয়। তাই তারা এই বিষয় নিয়ে ক্রমাগত টেঁচামেচি করে যাচ্ছেন...

এবার তোমরাই বিচার করো।

www.QuranerAlo.net

www.QuranerAlo.net

দি ডিসেপশন পয়েন্ট

Any sufficiently advanced technology
is indistinguishable from magic
~Arthur C. Clarke

মানুষ কল্পনাপ্রবণ। অজানাকে জানা ও অলৌকিক কিছুর ছোঁয়া পাওয়ার তাড়নাকে সে লুকিয়ে রাখতে পারে না। মনের আকাশে রঙ ছড়িয়ে নানা রকম কল্পনা করতে তার ভালো লাগে। মনের খোরাক খুঁজে পায় সে। শিল্প-সাহিত্যের বিশাল ভাণ্ডারের অনেকটাই দাঁড়িয়ে আছে মানব-মনের উচ্চাভিলাষী কল্পনার উপর। পরম-স্রষ্টা-প্রেরিত ধর্মের মৌলিক বাণী থেকে সরে গিয়ে, নানা কল্পনায় ভর করে কালক্রমে সে তৈরি করেছে নানাবিধ ধর্ম। (রাফান আহমেদ, ২০১৯) পৃথিবীর দৃশ্যমান প্রাণের মাঝে মানুষই বোধ হয় একমাত্র প্রাণি যে তার কল্পনাকে বিমূর্ত ভাষায় ফুটিয়ে তোলে, তা নিয়ে আলোচনায় মেতে ওঠে, কাড়ি-কাড়ি টাকা ঢালে। তার এই কল্পনাকে প্রভাবিত করে তার সমাজের চল। তার সময়ের বিজয়ী সাম্রাজ্যের চিন্তাধারাও তার কল্পনাযাত্রার পথে বাঁক আনে।

আমরা আগেই দেখেছি বিশ শতকের পর থেকে বিজ্ঞানের বস্তুগত লাভে মজে, মানুষ বিজ্ঞান নিয়ে ফ্যান্টাসিতে ভুগতে শুরু করে। (হেনরি গী, ২০১৩) এই ফ্যান্টাসি থেকে জন্ম নেয় নতুন মিথ! পৃথিবীর ইতিহাসে সিংহভাগ মানুষ ধর্মের সাহায্যে অজানাকে জানার পিপাসা মিটিয়েছে। কিন্তু বিশ শতক ও তার পরবর্তী জগৎমুখী (secular) সমাজের মানুষ বিজ্ঞানের নাম করে সেই পিপাসা মেটাচ্ছে। (জেমস হেরিক, ২০০৮) আগে কল্পনা করা হতো—ডাইনি বুড়ি ছু-মন্তর জাদু করে বেড়াচ্ছে, এক জায়গা থেকে হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়ে অন্য জায়গায় হাজির হচ্ছে। এখনও সেই গল্পই আছে, তবে তাকে আর ডাইনি বুড়ি বলা হয় না—বলা হয় মিউট্যান্ট! আগে গালিচায় করে বা কিছু ছাড়াই জাদুকর গগনে উড়ে বেড়াত, এখন ভিনগ্রহ থেকে স্পেসশিপে-করে-আসা প্রাণি প্যান্টের উপর আন্ডারওয়্যার পড়ে, লাল-চাদর কাঁধে চাপিয়ে আকাশে উড়ে বেড়ায়। তার সম্পর্কে বলা হয় - He is a god among us!

অনেক সেক্যুলার পশ্চিমা গবেষক, বিজ্ঞানী, দার্শনিকও এমন বিশ্বাস করেন যে, ভিনগ্রহের বুদ্ধিমাণ প্রাণি থাকার সম্ভাবনা খুব বেশি। কিছুদিন আগে ব্রিটেনের প্রথম নারী নভোচারী ড. হেলেনা শেরম্যান প্রত্যয়ের সাথে বলেছেন (বিবিসি, ২০২০) :

www.QuranerAlo.net

Contents

শিল্পীর কল্পনায় অ্যালিয়েন। মানুষের কল্পনার সীমা আছে, সে যা জানে-চিনে তার উপর ভর করেই কল্পনার ডানা মেলে। তাই দেখা যায়, অ্যালিয়েন হলেও তারা মাথা-হাত-পা বিশিষ্ট।
ছবি : শাটার স্টক

> অ্যালিয়েনের অস্তিত্ব নিশ্চিত। এ ব্যাপারে কোনো সম্ভাবনা- অসম্ভাবনার দোলাচল নেই। এমনও হতে পারে, তারা আমাদের মাঝেই ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু আমরা তাদের দেখতে পারছি না।

তো কেমন হতে পারে এই অ্যালিয়েনের স্বরূপ? অনেকেই মনে করেন এরা হবে অত্যন্ত উন্নত প্রযুক্তির অধিকারী! এতই উন্নত যে, মানুষ তাকে খোদা মনে করবে (মাইকেল শার্মার, ২০১৬) :

> যে-কোনো অতি উন্নত ভিনগ্রহী বুদ্ধিমত্তাকে মানুষ খোদা মনে করবে।

আরেক বিজ্ঞান প্রচারকের ভাষ্যে পাওয়া যায় (রিচার্ড ডকিন্স, ২০০৬) :

> ভিনগ্রহের কোথাও অতিমানবিক সভ্যতা থাকার সম্ভাবনা খুবই বেশি। এদের হয়তো এমন ঐশ্বরিক মনে হবে, যা ধর্মবিদেরা কল্পনাই করতে পারবে না। তাদের প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ আমাদের চোখে তাদের খোদাতুল্য করে তুলবে। অন্ধকার যুগের কোনো চাষিকে আজকের ল্যাপটপ, মুঠোফোন, হাইড্রোজেন বোমা বা জেট প্লেন দেখাতে পারলে আমাদেরকে সে যেমন খোদায়ী মনে করবে, অতিমানবিক সেই অ্যালিয়েন দেখে আমাদেরও তাই মনে হবে।

www.QuranerAlo.net

এদের অনেকে স্বপ্ন দেখছেন, মহাবিশ্বের অন্য কোথাও এই উন্নত বুদ্ধির প্রাণির (alien) আবাস রয়েছে ও তাদের সাথে মানুষের সংযোগের দ্বারা আমরা উৎকর্ষ (Extraterrestrial Enlightenment) লাভ করব! কেউ আবার ভাবছে—নাহ! ওরা আমাদের উপর কর্তৃত্ব করতে, এই ধরণি দখল করতে আসবে। বিখ্যাত স্টিফেন হকিং তাই বলেছেন ওদের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করা অনুচিত। তার মতে ক্রিস্টফার কলাম্বাস আমেরিকার খোঁজ পাওয়ার পর, সেখানকার আদিবাসীদের উপর যেমন ন্যাক্কারজনক গণহত্যা চালিয়েছিল, অ্যালিয়েনরা আমাদের ধরণিতে এলে তাই করবে! তিনি আশঙ্কার-সুরে বলেছেন (হাফপোস্ট, ২০১১) :

> আমার কল্পনায় আমি তাদের বিশালাকার নভোযানে অবস্থান করতে দেখি। নিজেদের গ্রহের সবকিছু নিঃশেষ করে তারা যেন যাযাবরের মতো মহাকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যে গ্রহেই খোঁজ পাবে, সেটাকেই কব্জা করে নতুন আবাস বানানোর ধান্দায় আছে তারা।

তাদের হরেক রকম বিশ্বাসকে কাগজে ছেপে দেদারসে প্রচার করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, জনসাধারণকে ভিনগ্রহের প্রাণিতে বিশ্বাস করানোর জন্য শত-শত চলচ্চিত্র, টিভি সিরিজ বানানো হয়েছে, এখনও হচ্ছে। বক্স অফিসে গেল বছরের সবচেয়ে সফল চলচ্চিত্রটি ছিল মানুষ আর ভিনগ্রহের প্রাণির মাঝে টিকে থাকার দ্বন্দ্ব নিয়ে। এই ছবির টিকিট পেতে বাঙালির একাংশ যে সার্কাস দেখিয়েছে তা মনে হয় তোমাদের কারো অজানা নয় (প্রথম আলো, ২০১৯)! এর আগে আরও অনেক চলচ্চিত্রে ভিনগ্রহের প্রাণিদের নিয়ে নানাগল্প দেখানো হয়েছে। দেখানো হয়েছে অত্যন্ত উন্নত অ্যালিয়েনরা পৃথিবীকে রক্ষার উদ্দেশ্যে মানুষদের খতম করতে এসেছে। মানুষের কারণে সব ভারসাম্য চুলোয় গেছে। তাই মানুষকে সাফ করে ভারসাম্য আনবে। দেখানো হয়েছে অতি উন্নত অ্যালিয়েন এসে মানুষকে অদ্ভুত ভাষা শেখাচ্ছে। এর দ্বারা মানুষ স্থান-কালের বাধা অতিক্রম করতে পারবে—জানতে পারবে ভূতভবিষ্যৎ! আরও দেখানো হয়েছে এক খ্যাপাটে মহাকাশচারী ঘর-সংসার ছেড়ে নেপচুনে গিয়ে বসে আছে বহু বছর ধরে। অ্যালিয়েন খুঁজে তার সাথে কোলাকুলি করার জন্য সে পাগল। তার সহকর্মীরা নেপচুনে থাকতে থাকতে প্রবল একঘেয়েমির প্রকোপে পড়ে পৃথিবীতে ফিরে আসতে চাইলে সে বাধা দেয়। তার কথা না শোনার কারণে সহকর্মীদের সবাইকে ঠান্ডা মাথায় মেরে ফেলে। মানুষ মরলে মরুক, অ্যালিয়েনের সাথে মোলাকাত করতেই হবে!

অ্যালিয়েন নিয়ে পশ্চিমাদের আবেগ-উৎসাহ-ঘোর চোখে পড়ার মতো! ১৯৫০ এর দিকে বিভিন্ন শাখার কয়েকজন বিজ্ঞানী পশ্চিম ভার্জিনিয়ার গ্রামস্থ একটি মানমন্দিরে (Observatory) গোপন বৈঠকে বসেন। তাদের সাংকেতিক নাম ছিল ডলফিন সঙ্ঘ (The Order of the Dolphin)! তারা মনঃস্থির করেন, অ্যালিয়েনের খোঁজে তারা মাঠে নামবেন। তখনও বিজ্ঞানীদের মাঝে এ নিয়ে তেমন আগ্রহ ছিল না। কিন্তু এই ডলফিন সঙ্ঘ গোপনে চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে। ১৯৬০ সালের দিকে মাঠ পর্যায়ে

www.QuranerAlo.net

এই প্রচেষ্টাকে নিয়ে আসেন ডলফিন সঙ্ঘের একজন সদস্য, হার্ভাড গ্রাজুয়েট ফ্র্যাংক ড্রেইক। প্রোজেক্ট ওযমা (Project Ozma)-নামক গোপন প্রজেক্টের দ্বারা ভিনগ্রহে বুদ্ধিমত্তার অনুসন্ধান (Search for Extraterrestrial Intelligence-SETI) শুরু করেন তিনি। অ্যালিয়েনদের নিয়ে ড্রেইক বরাবরই অত্যুৎসাহী। ভিনগ্রহের বুদ্ধিমান প্রাণির খোঁজ চালানোর পিছে ড্রেইকের আরেকটি সুপ্ত প্রেরণা ছিল। আর তা হলো—খোদার সাহায্য ছাড়াই সেই অ্যালিয়েনের হাত ধরে অমরত্ব লাভের বাসনা! (ফ্র্যাংক ড্রেইক ও ডেইভ সোবেল, ১৯৯২)

কালক্রমে এই খোঁজের সংবাদ জনসমক্ষে আসে। সেই থেকে প্রায় ৬০ বছর ধরে ভিনগ্রহের বুদ্ধিমান প্রাণির খোঁজে বিজ্ঞানীরা মহাকাশ চষে বেড়াচ্ছেন। নাসাও এককালে ভিনগ্রহের বুদ্ধিমান প্রাণি খোঁজার প্রোজেক্টে অংশ নিয়েছিল। তবে ১৯৯৩ সালে নাসা এই প্রজেক্ট থেকে সরে আসে। এরপর থেকে ব্যক্তিগত উদ্যোগে অ্যালিয়েনের খোঁজ চলছে। (এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, ২০১৫) বুদ্ধিমান প্রাণির খোঁজকারী ক্যালিফোর্নিয়ার সেটি ইন্সটিটিউট-এর বাৎসরিক ব্যয়ের পরিমাণ ৭০ লক্ষ ডলার! মাইক্রোসফট-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা পল অ্যালেন ভিনগ্রহের প্রাণি-খোঁজার এক প্রজেক্টে অনুদান প্রদান করেছিলেন ১৬ লক্ষ পাউন্ড! রাশিয়ার ধনকুবের ইউরি মিলনার ১০ কোটি ডলার মূল্যের প্রজেক্ট হাতে নিয়েছেন, যার নাম দেওয়া হয়েছে 'শোনো' (Listen project)। অ্যালিয়েনের দূষণ থেকে পৃথিবীকে রক্ষার জন্য কিছুদিন আগে নাসা অফিসার নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত জানিয়েছে, যার বেসিক বেতন হবে ফি-বছর প্রায় ১ লক্ষ ৯০ হাজার ডলার! (রেইচেল রিভেজ, ২০১৭)

এত বছর ধরে এমন হুলুস্থুল কাণ্ড করে, অগণিত অর্থ ব্যয় করে ফলাফলটা কী? নিশ্চয়ই কাড়ি-কাড়ি অ্যালিয়েন খুঁজে পাওয়া গেছে, তাই না? সে আশায় গুড়ে বালি! পেনসিলভানিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির জ্যোতির্বিদ জেসন রাইট নেতৃত্বে একদল গবেষক প্রায় এক লক্ষ বড়োসড়ো গ্যালাক্সি চুলচেরা অনুসন্ধান করেও কোনো এলিয়েনের অস্তিত্ব খুঁজে পাননি। (লি বিলিংস, ২০১৫) সাম্প্রতিক নানা গবেষণা অ্যালিয়েনভক্তদের সুখনিদ্রায় পানি ঢেলে দিয়েছে। (জিম আল খলিলি, ২০১৮) এর নানাবিধ কারণ রয়েছে। যেমন—বিজ্ঞানীদের মতে, মহাকাশে যোগাযোগের সর্বোচ্চ গতিবেগ হলো আলোর বেগ। হিসেব-নিকেশ করে দেখা গেছে, কল্পিত অ্যালিয়েনদের থেকে আমাদের পৃথিবিতে যদি আলোর বেগে সংকেত আসতে হয়, সেক্ষেত্রে তাকে মোটামুটি ১২৫০ আলোকবর্ষের মধ্যে থাকতে হবে। এই সীমার মাঝে আনুমানিক ২-৩ কোটি নক্ষত্র থাকতে পারে। এই সংখ্যা শুনে তোমার মনে হতে পারে, এত নক্ষত্রের চারিদিকে দৌড়ে বেড়ানো আবাসযোগ্য গ্রহের সংখ্যা নেহায়েতই কম নয় হয়তো! কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। আমরা ফাইন টিউনিং প্রসঙ্গে আলোচনার সময় দেখেছি কোনো গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব ও বিকাশের জন্য অকল্পনীয় সুনিপুণ সমন্বয় দরকার। (গিয়েরমো গঞ্জালেস, ২০১৪) সে বিচারে পৃথিবীর মতো একটি আবাসযোগ্য গ্রহ পাওয়ার প্রস্তাবিত সম্ভাবনা ৭ লক্ষ-কোটির মাঝে একটি! পরিসংখ্যান বিচারে যা পাওয়ার কথা না!

www.QuranerAlo.net

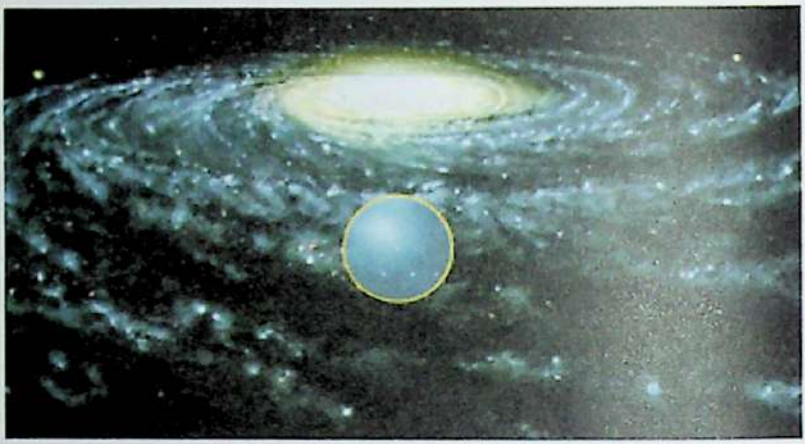

প্রতীকী-চিত্রে হলুদ বর্ডার বিশিষ্ট বৃত্তের কেন্দ্রে আমাদের সৌরজগতের অবস্থান। বৃত্তের ব্যাস ১২৫০ আলোকবর্ষ সমান দূরত্ব নির্দেশ করে। এই সীমার ভেতরের অংশ থেকে আমাদের কাছে কোনো সংকেত আসতে অন্তত ২৫,০০০ বছর লাগবে! আর এর বাইরে থেকে কোনো সংকেত বা আলো আমাদের দিকে এলে আমরা কখনোই সেটা পাবো না। মহাবিশ্বের ক্রমপ্রসারণের ফলে সেই আলো বা সংকেত আমাদের নিকট পৌঁছাবে না।

ছবি: অ্যামেরিকান সাইন্টিস্ট

তা ছাড়া আমরা আগেই আলোচনা করেছি, মহাবিশ্ব ক্রমপ্রসারণশীল। গ্যালাক্সিগুলো একে অন্য থেকে ক্রমবর্ধমান বেগে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে। মহাবিশ্ব প্রসারিত না হলে আগে হোক বা পরে হোক, এর যে-কোনো প্রান্ত থেকে আলোর বেগে পাঠানো সংকেত আমাদের নিকট পৌঁছাত। কিন্তু মহাবিশ্ব যেহেতু দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে তাই একটা নির্দিষ্ট দূরত্বের বাইরে থাকলে সেখান থেকে কোনো সংকেত বা আলো আমাদের নিকট পৌঁছাবে না। তাই তাদের সাথে আমাদের যোগাযোগ বা পৃথিবীতে তাদের আবির্ভাব সম্ভব না। তাই, 'বছরের-পর-বছর ধরে অনুসন্ধান করার পরও কোনো সংকেত আমরা পাইনি। এমনকি সামান্যতম আলামতও নেই। বিজ্ঞানী ফার্মি ঠিকই বলেছিলেন, অ্যালিয়েনরা অনুপস্থিত।' (হাওয়ার্ড স্মিথ, ২০১১) একডেমিয়াতে বহুল আলোচিত এক বইতে গবেষক স্টিফেন ওয়েব ৭৫টি কারণ সবিস্তারে আলোচনা করে দেখিয়েছেন বুদ্ধিমান অ্যালিয়েনের অস্তিত্ব ও তাদের সাথে যোগাযোগের আশা নিছক স্বপ্ন বলা যায়। বইয়ের ভূমিকাতে রয়াল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট, ব্রিটেনের শীর্ষ বিজ্ঞানী প্রফেসর স্যার মার্টিন রিস বলেন (স্টিফেন ওয়েব, ২০১৫) :

> আমার আশা, হয়তো একদিন আমরা অ্যালিয়েনের খোঁজ পাব। তবে এই খোঁজ কেন ব্যর্থ হতে পারে—এমন ৭৫টি কারণ বক্ষ্যমান বইতে আলোচনা করা হয়েছে।

তাও মার্টিন রিস বিশ্বাস করেন, অ্যালিয়েনের অস্তিত্ব খুবই সম্ভব। কেন? তিনি বলেছেন (জন ব্রকম্যান, ২০০৬) :

www.QuranerAlo.net

> বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন প্রাণ একমাত্র আমাদের পৃথিবীরই এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। তারপরও আমি বিশ্বাস করি এটি পুরো গ্যালাক্সি-জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে পারে... আমার এই বিশ্বাস হয়তো বিলিয়ন বছরেও প্রমাণিত হবে না। তার আগেই হয়তো ভুল প্রমাণিত হয়ে যেতে পারে... এটা আসলে ধর্মীয় বিশ্বাসের বিকল্প এবং আমি আশা করি এটা সত্য।

প্রফেসর রিস গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় স্বীকার করেছেন। সেটা হলো—অ্যালিয়েনের অস্তিত্বে বিশ্বাস ধর্মীয় বিশ্বাসের বিকল্প! প্রত্যেক মানুষের ভেতরেই নিজের চেয়ে বড়ো-উচ্চ কিছুর প্রতি অনুরাগ ও আকুলতা প্রকাশ করার সুপ্ত অনুভূতি বিরাজ করে। প্রতিটি ধর্মের একটি মৌলিক অংশ হলো, নিজের চেয়ে উর্ধ্বের কোনো সত্তার কাছে নিজেকে সঁপে দেওয়া, প্রার্থনা করা। ভিনগ্রহে উচ্চ বুদ্ধিমত্তার খোঁজ তাই এক অর্থে ধর্মীয় বিশ্বাসের বিকল্প। নিজ সভ্যতার চেয়ে অনেক উন্নত কোনো প্রাণির কাছে নিজেকে সঁপে দিয়ে উৎকর্ষ লাভ করার বাসনা। এক প্রথম সারির গবেষকের ভাষায় (স্টিফেন ডিক, ২০০১) :

> ... ভিনগ্রহে উচ্চবুদ্ধিমত্তার খোঁজে করা তোড়জোড়কে ধর্মীয় আচারের সাথে তুলনা করা যায়... তাই SETI প্রজেক্ট হয়তো নবধর্মের খোঁজে থাকা বিজ্ঞানের একটি শাখা। তাদের ধর্মের সাথে আমাদের বিজ্ঞানের ছড়ান্ত মেলবন্ধনের দ্বারা এক মহাজাগতিক ধর্মের (Astrotheology) গোড়াপত্তন হবে।

ভবিষ্যতের কোনো একদিনের কথা কল্পনা করো। সকালে মুঠোফোনের ইমার্জেন্সি এলার্মের শব্দে তোমার ঘুম ভাঙল। ঘুমজড়ানো চোখে ফোন খুলে দেখলে ইউটিউব ব্রেকিং নিউজ দেখাচ্ছে, বলছে—অদ্ভুত এক অ্যালিয়েন হাজির হয়েছে আরব ভূখণ্ডে।

BREAKING NEWS

আরব ভূখণ্ডে অদ্ভুত এক অ্যালিয়েন আবির্ভূত হয়েছে

তাকে অনুসরণ করছে সুসজ্জিত ৭০,০০০ মানুষের দল। ক্রমেই তার অনুসারী বাড়ছে। প্রাণিটা কিছুটা কুঁজো হয়ে হাঁটে, মাথার চুল কোঁকড়ানো, দেহ আরক্তিম। তার ডান চোখ অন্ধ, বাম চোখের কোনা থেকে মাংস বেড়ে মাঝের দিকে গেছে। এই অদ্ভুত প্রাণিটি খুব দ্রুত চলাচল করতে পারে, মেঘ যেমন বাতাসের তোড়ে ধায়—তেমনই দ্রুতগতি তার! মুঠোফোনের পর্দার দিকে তাকিয়ে তুমি শঙ্কায় বিহ্বল হয়ে দেখতে পেলে সে ইশারা দেওয়ার সাথে সাথে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি হচ্ছে, বিরাণ ভূমির দিকে ইঙ্গিত করতেই সবুজে শ্যামলে হেসে উঠছে জমিন। তার অনুসারীরা আনন্দ ও প্রাচুর্যে ভাসছে। যারা তার দাবি মানছে না তাদের নাস্তানাবুদ করে ছাড়ছে; ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে। তারা দুর্ভিক্ষে পতিত হচ্ছে, তাদের সম্পদের কিছুই থাকছে না। তারা নিঃস্ব হয়ে পড়ছে।

www.QuranerAlo.net

(ইসলাম কিউএ, ২০০০)

বিজ্ঞানবাদী চেতনার মানুষগুলো মূলত বস্তুবাদী ও ভোগবাদী হয়ে থাকে। জগতকেন্দ্রিক ধ্যানধারণা ও দুনিয়া ভোগের আকাঙ্ক্ষা তাদের চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করে। হোমো স্যাপিয়েনস-এর বিশ্বে বহুকাল ধরে জগতকেন্দ্রিক ও ভোগবাদী মানসিকতা সয়লাব হয়ে আছে। এমন সময়ে সেই প্রাণির আগমনে মানুষ কী করবে? যারা মহাজাগতিক ধর্মের খোঁজে ভিনগ্রহের বুদ্ধিমত্তা খুঁজে বেড়াচ্ছে আকুল হয়ে, তারা উল্লসিত হবে। এই উচ্চক্ষমতার প্রাণির অলৌকিক কাজ তাদের কাছে অতি উন্নত প্রযুক্তি মনে হবে; যা মানুষের ক্ষুদ্র দৃষ্টির চোখে জাদু মনে হয়! তারা উৎকর্ষ লাভের পিপাসায় সেই প্রাণির পিছু নেবে। হাল আমলের বিজ্ঞান জগতকেন্দ্রিক চেতনায় ডুবে আছে। তারাও দেখবে ওই প্রাণির তুলনায় মানুষের প্রযুক্তির স্রেফ নস্যি! তারাও পিছু নেবে। দুনিয়ার জীবনই যাদের একমাত্র ধ্যানজ্ঞান তারাও ঝামেলা না বাড়িয়ে পিছু নেবে।

তুমি ভাবছ আমি গল্প বলছি? ভুল ভাবছ! ওই প্রাণির আগমনের সংবাদ এমন এক ব্যক্তি দিয়ে গেছেন যিনি সত্যবাদী ও সত্যপরায়ণ হিসেবে বিশ্বব্যাপী সুপরিচিত। তাঁর করা কোনো ভবিষ্যদ্‌বাণী বিফলে যায়নি! (আবূ যাকারিয়্যা, ২০১৯)

সে যদিও অ্যালিয়েন নয়, কিন্তু তার জাদু দেখে প্রায় সবাই তাকে খোদা মেনে তার ধর্মে দীক্ষিত হবে!

তুমি কী করবে?

www.QuranerAlo.net

পরিশিষ্ট ১

আত্মঘাতী বিবর্তনবাদ

নব্য-নাস্তিকতাবাদের অন্যতম পুরোধা দার্শনিক ডেনিয়েল ডেনেট বলেছিলেন, ডারউইনবাদ হলো এক "ইউনিভার্সাল এসিড"। এটি এমন এক সর্বগ্রাসী এসিড যা প্রচলিত ধর্ম, ধ্যানধারণা, প্রথা সবকিছুকে গলিয়ে ফেলে। তার ভাষায় (ড্যানিয়েল ডেনেট, ১৯৯৬) :

> [Darwinism is an] universal acid… [It's a] liquid so corrosive it will eat through anything… it eats through just about every traditional concept and leaves in its wake a revolutionized world-view.

কিন্তু ডেনেট খেয়াল করেননি, এলোপাথাড়ি বিবর্তন দিয়েই যদি প্রাণের বিকাশ ঘটে থাকে, তা হলে এই সর্বগ্রাসী এসিড বিবর্তনকেও গলিয়ে দেবে; গলিয়ে দেবে সত্য খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা, যুক্তির যথার্থতা এবং সর্বোপরি বিজ্ঞানকেও! দার্শনিক হোয়াইটলে কফম্যান ঠিকই বিশ্লেষণ করেছেন (হোয়াইটলে কফম্যান, ২০১৭) :

> Dennett's choice of metaphor is unfortunate, in the implication that Darwinists are selling fraudulent goods. However, it may be quite accurate in another respect that Darwinism threatens to destroy its own "container," the very ideas of truth, reason, and science, thus destroying even itself—an idea Dennett himself surprisingly seems to embrace, paradoxically suggesting that evolutionary theory applies "even to itself."

ব্যাপারটা সহজ করে বলা যাক। মানুষ যদি লক্ষ্যহীন, উদ্দেশ্যহীন, এলোপাথাড়ি বিবর্তনের ফলেই আবির্ভূত হয়ে থাকে তা হলে, মানুষের যৌক্তিক চিন্তার উপর নির্ভর করার কোনো ভিত্তি থাকবে না। যুক্তি দিয়ে জগতকে বুঝব, এর বাস্তবতা জান—এই আশায় গুঁড়ে বালি! কারণ, বিবর্তনের ফলে মগজ গঠিত হয়েছে স্রেফ বেঁচে থাকার সংগ্রামে টিকে থাকার জন্য, সত্য বা জগতের প্রকৃত রূপ জানা বা বোঝার জন্য না।

www.QuranerAlo.net

বিখ্যাত (নাস্তিক) বিজ্ঞানী ফ্রান্সিস ক্রিক স্বীকার করেছেন (ফ্রান্সিস ক্রিক, ১৯৯৪) :

> সর্বোপরি আমাদের অত্যন্ত বিকশিত মস্তিষ্ক বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কারের জন্য বিবর্তিত হয়নি। বরং কেবলই বেঁচে থাকা ও বংশধর রেখে যাওয়ার জন্য আমাদের যথেষ্ট দক্ষ করে তুলতে বিবর্তিত হয়েছে।

আরও অবাক করার মতো ব্যাপার হলো, সত্যিই যদি বিবর্তন ঘটে থাকে তা হলে, মানুষ কখনোই জগতের প্রকৃত রূপ জানতে পারবে না। কারণ এটি জগতের বাস্তবতাকে চোখের সামনে থেকে সরিয়ে দিয়ে, বেঁচে থাকা, বংশবৃদ্ধি করার জন্য যে পরিবেশ দরকার তা মানুষের সামনে তুলে ধরবে। (নাস্তিক) পদার্থবিদ ম্যাক্স টেগমার্ক বলেন (ম্যাক্স টেগমার্ক, ২০১৪) :

> Evolution endowed us with intuition only for those aspects of physics that had survival value for our distant ancestors, such as the parabolic orbits of flying rocks (explaining our penchant for baseball). A cavewoman thinking too hard about what matter is ultimately made of might fail to notice the tiger sneaking up behind and get cleaned right out of the gene pool.

সুতরাং জগতের বাস্তবতা জানার কোনো সুযোগ নেই মানুষের! (ডোনাল্ড হফম্যান, ২০১৭) তাই বিবর্তন সত্য এটাও ভাবার অবকাশ নেই। ফলে যে যুক্তি নির্ভরতা আর সত্যকে, জগতের বাস্তবতাকে খোঁজার আকাঙ্ক্ষাকে ভিত্তি ধরে বিবর্তনবাদ দাঁড়িয়ে আছে, তার কোনো অস্তিত্বই থাকবে না।

ভেঙে যাবে পুরো বিবর্তন-চিন্তার মূর্তি!

বিবর্তনকে প্রত্যাখ্যান করার কারণ—বিবর্তন নিজেই।

www.QuranerAlo.net

Contents

পরিশিষ্ট ২

বিজ্ঞান ও নাস্তিকতা

নাস্তিকতার প্রচারে মূলত বিজ্ঞানকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে দেখা যায়। বিশ শতকের পশ্চিমা মহলে এই অপচেষ্টার ব্যাপকতা লক্ষ করা যায়। প্রভাবশালী সাম্রাজ্যের কূটনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের স্রোতে আমার প্রিয় বাংলাতেও নাস্তিকতা প্রচারে বিজ্ঞানকেই হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। 'বিজ্ঞানের গান' গেয়েই তারা নাস্তিকতা প্রচারে অগ্রণী হয়। কিন্তু আসলেই কি নাস্তিকতা বৈজ্ঞানিক? কখনোই নয়! কেন?

এর কারণ বুঝতে হলে প্রথমে বুঝতে হবে—নাস্তিকতা কাকে বলে। সোজা কথায় বলা যায় : স্রষ্টার অস্তিত্বে অবিশ্বাস করা। তবে ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে, নাস্তিককে দার্শনিক প্রকৃতিবাদ (Philosophical/Metaphysical Naturalism) বা বস্তুবাদে **বিশ্বাসী** বলা যায়। নব্য নাস্তিক্যবাদের অন্যতম পুরোধা নাস্তিকদের পরিচয় দিয়েছেন (রিচার্ড ডকিন্স ২০০৮) :

> নাস্তিক হলো এমন ব্যক্তি, যে বিশ্বাস করে পার্থিব-ভৌত জগতের বাইরে কিছুই নেই। কোনো স্রষ্টা নেই যিনি দৃশ্যমান এই মহাবিশ্বের পিছনে চুপিসারে কলকাঠি নাড়ছেন। আত্মার কোনো অস্তিত্ব নেই যা মৃত্যুর পরও বেঁচে থাকে, নেই অলৌকিক বলে কোনো কিছু। কেবলই রয়েছে জাগতিক ঘটনাবলী, যা আমরা এখনও বুঝে উঠতে পারিনি।

তোমরা কি একটা বিষয় খেয়াল করলে? আমি বলেছি, নাস্তিকেরা বস্তুবাদে **'বিশ্বাসী'**? অর্থাৎ দার্শনিক প্রকৃতিবাদ তথা বস্তুবাদ একটি বিশ্বাসগত (Belief) অবস্থান! দর্শনের একেবারে বেসিক জ্ঞান এটা (ফিলসফি ব্যাসিকস.কম)। নাস্তিক দার্শনিক থেকেও স্বীকারোক্তি পাওয়া যায় (মাইকেল রুজের স্বীকারোক্তি; রবার্ট স্টুয়ার্ড, ২০০৭) :

> আপনি যদি স্বীকারোক্তি চান তবে শুনুন, আমি সব সময় স্বীকার করেছি বস্তুবাদ হলো স্রেফ বিশ্বাসগত অবস্থান ...

অধিকাংশ নাস্তিক এটা জানে না। যারা জানে তারা এ ব্যাপারে চুপ থাকে। কারণ, ধর্মকে তারা স্রেফ অন্ধবিশ্বাস বলে সমালোচনা করে; তারা নিজেরাও যে আরেক বিশ্বাস প্রচার করে এটা মানুষ জানলে তাদের অবস্থানকে উত্তম ভাববে না। তাই, নাস্তিকেরা তাদের বিশ্বাসকে বিজ্ঞান দিয়ে মুড়িয়ে ফেরি করে। কিন্তু কেন?

www.QuranerAlo.net

আমরা আলোচনা করেছি বিজ্ঞান পদ্ধতিগত প্রকৃতিবাদকে (Methodological Naturalism) খুঁটি হিসেবে ধরে জগৎ বোঝার প্রয়াস চালায়। যার লক্ষ্য হলো চোখের-সামনে-থাকা এই অবাক বিশ্বের কোনো ঘটনা ব্যাখ্যার সময় কেবল জাগতিক ব্যাখ্যাই দেওয়া হবে। স্রষ্টা আছে কি নেই, সে বিষয়ে কথা বলা হবে না। কারণ এই প্রশ্ন বিজ্ঞানের চৌহদ্দির বাইরে। আমরা আমেরিকার ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব সাইন্সেস-এর বিবৃতি দেখেছি :

> বিজ্ঞান হলো প্রাকৃতিক জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের একটি উপায়। প্রাকৃতিক জগৎ সম্পর্কে জাগতিক ব্যাখ্যা প্রদানেই এটি সীমাবদ্ধ। অতিপ্রাকৃত কিছু আছে কি না, সে বিষয়ে বিজ্ঞান কিছুই বলতে পারে না। স্রষ্টা আছেন নাকি নেই—এ প্রশ্নের ব্যাপারে বিজ্ঞান নীরব।

অধিকাংশ মানুষ বস্তুবাদ আর প্রকৃতিবাদের মাঝে পার্থক্য জানে না। তারা ভুল ভেবে বসে—যেহেতু বিজ্ঞান খুঁজে পায়নি, তার মানে সেটার অস্তিত্ব নেই! যেমন আমাদের দেশে নাস্তিকতা প্রচারকারীদের বুক ফুলিয়ে বলতে শোনা যায় (রায়হান আবির ও অভিজিৎ রায়, ২০১৬) :

> ... আধুনিক বিজ্ঞান এখন যে জায়গায় পৌঁছে গেছে ঈশ্বর বলে কিছু থেকে থাকলে কোনো-না-কোনোভাবে বিজ্ঞানের চোখে ধরা পড়ার কথা ছিল ...

এ ধরণের মানসিকতার সাথে বিজ্ঞানের কোনো সম্পর্ক নেই, বরং কেবল বিজ্ঞানবাদীতায় আক্রান্ত হলে মানুষ এমন বোকাসোকা কথা বলে বসে। সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না যে—এই ধরণের বক্তব্য স্রেফ কুযুক্তি (সার্কুলার রিজনিং ফ্যালাসি)! কাউকে আগেই ঘর থেকে বের করে দেওয়ার পর যদি তুমি বলো, কই? ও তো ঘরে নেই! তা হলে ব্যাপারটা কেমন দাঁড়ায়? বিজ্ঞান জগৎ ব্যাখ্যা করার আগেই প্রতিজ্ঞা করে নেয়—স্রষ্টার হস্তক্ষেপ বিবেচনা করা ব্যতীতই জগৎ ব্যাখ্যা করা হবে। তাই এর ব্যাখ্যা কেবলই জগতকেন্দ্রিক হবে। তাই স্রষ্টা থাকা না-থাকার প্রশ্নে আজকের বিজ্ঞান নীরব হয়ে বসে থাকে। একজন নামকরা মহাকাশবিদকে স্বীকার করতে দেখা যায় (অ্যালেক্স ফিলিপ্পেনকো'র বক্তব্য; আরটি নিউজ, ২০১২) :

> ... আমি মহাবিশ্বকে একজন বিজ্ঞানীর দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করতে চাই... কোনো অতিমানবিক বা স্বকীয় স্রষ্টা আছেন নাকি নেই অথবা এই মহাবিশ্বের কোনো

> "যেহেতু বিজ্ঞানের চোখে ধরা পড়েনি, তাই এর কোনো অস্তিত্ব নেই—এমন মানসিকতার সাথে বিজ্ঞানের কোনো সম্পর্ক নেই। বরং এমন কথা তারাই বলে যারা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে সর্বশক্তিমান বানিয়ে ফেলেছে। এটা বিজ্ঞানবাদী আচরণ।"
>
> - রেমন্ড ট্যালিস
> (নাস্তিক) নিউরোসাইন্টিস্ট

www.QuranerAlo.net

Contents

> উদ্দেশ্য আছে নাকি নেই, সে বিষয়ে আমি কিছু বলব না। কারণ, এই প্রশ্নগুলোর উত্তর বিজ্ঞানীরা দিতে পারে না।

কিন্তু তরুণরা এতসব সহজে বুঝতে পারে না/চায় না। একে তো জ্ঞান কম থাকে, তার ওপর প্রবৃত্তির টান—দুয়ে মিলে তারা বিবেক-জ্ঞান দ্বারা কম, বরং আবেগ দ্বারাই বেশি তাড়িত হয়। এর অপব্যবহার করে কিছু সুযোগ-সন্ধানী-মানুষ! স্বনামখ্যাত পদার্থবিদ প্রফেসর এম. এ. হারুন অর রশিদ নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলেছিলেন (এম. এ. হারুন অর রশিদ এর বক্তব্য; রায়হান আবির ও অভিজিৎ রায়, ২০১৬) :

> ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব বিজ্ঞানের বিষয় নয়, এটা বুঝতে তরুণ মনের সময় লাগে অনেক...

আমি চাই না তোমাদের সেই সময়টা নষ্ট হোক। আমার বড়ো আশা, তোমরা তরুণেরা এই ভুল কাজ করবে না। চিন্তার সুস্থধারা সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে তোমরাই। বিজ্ঞানের অ্যাকাডেমিক অনুধাবন তোমাদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়াই আমার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। যখন বিজ্ঞানকে ঠিকভাবে বুঝতে পারবে তখন নিজেই এসব ভুলভাল থেকে নিজেকে ও অন্যকে দূরে রাখার চেষ্টা করতে পারবে। অমন বোকাসোকা কথা কেউ বলতে আসলে, তাকে আদর করে অ্যাকাডেমিক অনুধাবন বুঝিয়ে বলতে পারবে (হি গাউচ, ২০১২):

> প্রকৃতিবাদ বিজ্ঞানের আগ্রহ ও ব্যাখ্যার পরিসীমাকে নানাবিধ প্রাকৃতিক ব্যাপার ও ঘটনাবলীর মাঝে সীমাবদ্ধ করে দেয়। স্রষ্টা বা ফেরেশতা ইত্যাদি অতিপ্রাকৃতিক কোনো কিছুকে ব্যাখ্যাস্বরূপ টেনে আনে না।... এখন প্রকৃতিবাদের সাথে বস্তুবাদের পার্থক্যটি ভালোভাবে লক্ষ করুন। বস্তুবাদ অনুসারে প্রাকৃতিক নানাবিধ বস্তুর অস্তিত্ব রয়েছে বটে, তবে অতিপ্রাকৃত কোনো কিছুরই অস্তিত্ব নেই। নাস্তিকরা এমনই দাবি করে থাকেন। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, বিজ্ঞানের প্রকৃতিবাদ অতিপ্রাকৃত কোনো কিছুর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে না। বরং বলে—অতিপ্রাকৃত ব্যাপার-স্যাপার বিজ্ঞানের আওতার বাইরে। দুঃখজনক হলেও সত্য, প্রকৃতিবাদকে প্রায়ই বস্তুবাদের সাথে গুলিয়ে ফেলা হয়। তাই কেউ যদি এমন ধারণায় অটল থাকে যে—বিজ্ঞান প্রকৃতিবাদ মেনে চলে এবং এটি নাস্তিক্যবাদ অথা বস্তুবাদকেও সমর্থন করে; তবে এরকম প্রবল উৎসাহপূর্ণ কথার জন্য তাকে বেশি নাম্বার দেওয়া হলেও, যুক্তির খাতায় তার নাম্বার হবে কম।

তাদের আত্মবিশ্বাসের সাথে বুঝিয়ে দেবে, নাস্তিকতা কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাপার নয়, বরং এটা বিশ্বাসগত অবস্থান। এর সাথে বিজ্ঞানের সন্ধি নেই (লি বিলিংস, ২০১৯)। তারা দুষ্টুমি শুরু করলে, বিশ শতকের অন্যতম প্রভাবশালী ও খ্যাতনামা বিবর্তনবিদ কার্ল উওস-এর কথা শুনিয়ে দিতে পারো (সুজান মাজুর, ২০১৩) :

www.QuranerAlo.net

... মানুষ বলে—নাস্তিকতা নাকি বিজ্ঞান-নির্ভর। এই কথা আমার মোটেও পছন্দ হয় না। কারণ, কথাটা ভুল। আদতে নাস্তিকতাকে তুলনা করা যায় ভিনগ্রহের প্রাণির সাথে; যে বিজ্ঞানের উপর আক্রমণ চালিয়ে তা দখল করে নেওয়ার পাঁয়তারা করছে।

এরপরও দেখবে তাদের একাংশ সত্যকে মানতে চাইবে না। তাদের তুমি বলবে—সালাম! কেন বলবে জানো তো? (আল-কুরআন ২৫ : ৬৩) তাদের পিছে আর সময় নষ্ট না করে তুমি হাঁটতে শুরু করবে দিগন্ত-পানে। নরম রোদ এসে ছুঁয়ে যাবে তোমার শরীর। তোমার মনে পড়বে, যারা বিজ্ঞান সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান রাখে না তারাই বিজ্ঞানের উপর ভর করে নাস্তিকতার পথ বেছে নেয়; নিজের ক্ষতি করতে চায়। হয়তো মনে পড়বে, মুঠোফোনে এক নাস্তিককে কলম ফসকে লিখতে দেখেছিলে (তসলিমা নাসরিন, ২০১৯) :

সায়েন্স পড় সায়েন্স পড় বলে বলে মানুষকে র‍্যাশনাল হওয়ার উৎসাহ দিয়েছি জীবনভর। লাভ হয়নি। সায়েন্সে পড়া মানুষগুলো, মানে ওই ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারগুলো, ফিজিক্স কেমেস্ট্রির পণ্ডিতগুলো, বেশিরভাগই দেখি ধর্মের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে। ধর্মের আজগুবি গপ্প নিয়ে সন্দেহ করে, প্রশ্ন করে, বা ধর্ম থেকে সরে আসে যারা, তারা অধিকাংশই আর্টসের সাব্জেক্ট নিয়ে লেখাপড়া করেছে, সাহিত্য বা দর্শন পড়েছে, আর্ট কলেজে পড়েছে, ফিল্ম নিয়ে পড়েছে। তা হলে বিজ্ঞানমনস্ক হওয়ার জন্য বিজ্ঞান মুখস্ত করার দরকার হয় না, বিজ্ঞান পরীক্ষায় ভালো নম্বর পাওয়ারও দরকার হয় না।

তুমি জানো তারা বিজ্ঞান বুঝে না, তুমি জানো তারা নিজেদের ক্ষতি করছে। কিন্তু তুমি তাদের আঁধারে নেই আর। আকাশের লাল-নীলের সাথে তুমি মিলেমিশে একাকার। তুমি হাঁটতে থাকবে, মিষ্টি হাওয়া এসে তোমার সাথে কানে কানে কথা বলবে। হয়তো তোমার মনে হবে পায়ের নিচে অনেকগুলো নরম ডানা! তুমি পা ওঠাতে গেলে সেখান থেকে কী যেন ঝিকিমিকি করে ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে! দিগন্তে তুমি দেখছ নিশানা, নিজের মাঝেও খুঁজে পেয়েছ সেই ডাক!

তুমি হাঁটছ।

অনন্তের পথে যাত্রায়।

ভেসে থাক আলোর বানে
যত আঁধার-কালো,
আলোকে মুক্ত করো
অমল-নির্মল আলো॥

www.QuranerAlo.net

Contents

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার

Whoever is not grateful to the people, he is not grateful to Allah

বই লেখার সময় পরামর্শ ও তথ্যের দ্বারা সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছেন ডা. মাহদি ইসলাম। তার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। ধন্যবাদ দিতে চাই ডা. আবদুল্লাহ সাইদ খান ভাইকে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রক্রিয়ার সাথে অনেকদিন থেকে তিনি জড়িত; তার গবেষণাপত্র আন্তর্জাতিক জার্নালেও প্রকাশিত হয়েছে। অনেক দিন থেকে বিবর্তন, দর্শন, পরিসংখ্যান ইত্যাদি নিয়ে নিজ আগ্রহে পড়াশোনা করছেন। নাজমুল সরদার আশিক ভাইকেও ধন্যবাদ দিতে চাই। কসমোলজি নিয়ে অনেকদিন থেকেই উনি পড়াশোনা করছেন। মহাকাশবিদ্যার বিষয়ে থাকা আলোচনার শুদ্ধতা যাচাই ও তথ্যসূত্র সংযোজনে উনি আগ্রহী হয়ে সাহায্য করেছেন। আরও কৃতজ্ঞতা জানাই - সবুর আহমাদ (লন্ডন), আব্দুর রহমান (ইউকে), জাউর গুশেল (রাশিয়া), শোয়েব মালিক (দুবাই), শাহবাজ নজরুল (ইউএসএ), রেজাউল করিম ভুঁইয়া (ইউএসএ), রইসুদ্দিন রাকিব প্রমুখ ভাইদের। তাদের সাথে আলোচনা, তাদের পরামর্শ নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছে।

ইসমাইল হোসেন ভাই ও আহমাদ রোকন উদ্দিন ভাইকে ধন্যবাদ দিতে চাই। সমর্পণ প্রকাশনীর সাথে আমার দ্বীনি অনুরাগ সেই সূচনা থেকে। রাফান আর সমর্পণ যাত্রা শুরু করেছিল একসাথে। একদিন রাফান ধুলো হয়ে যাবে, কিন্তু দুআ করি দ্বীনের খেদমতে সমর্পণ এগিয়ে যাক।

আমার প্রিয় মা-কে ধন্যবাদ দিতে চাই। আমাকে লেখালেখির অবকাশ দিয়েছেন তিনি। ভালোবেসে দুআ করেছেন। এই সাদাসিধা-ত্যাগপরায়ণ মহীয়সী আমাকে গর্ভে ধারণ করেছেন, আগলে রেখে বড়ো করেছেন, বিক্ষুব্ধ ঝড়-ঝঞ্ঝাট সহ্য করে আমাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছেন। ভালোবাসার সংজ্ঞা শিখিয়েছেন। অথচ আমি তার জন্য কিছুই করতে পারিনি। আমার সুপারহিরো আমার প্রিয় মা। একই সাথে অন্তর থেকে কৃতজ্ঞতা জানাই আমার বাবা ও পরিবারের সবার প্রতি।

সর্বোপরি, সমস্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আমার সৃষ্টিকর্তার তরে। মনের কোণে আশা রাখি একদিন তাঁকে আমি দেখব। সেই আশা নিয়ে বেঁচে আছি।

পাণ্ডুলিপি সমাপ্ত : ১৩ জানুয়ারি ২০২০

www.QuranerAlo.net

Contents

তথ্যসূত্র ও কিছু কথা

চিন্তা মুক্ত নয়, সুস্থ হোক

রাফান আহমেদ

হোমো স্যাপিয়েনস: রিটেলিং আওয়ার স্টোরি আমার তৃতীয় বই। এই বইতে রেফারেন্স উল্লেখের ধরণ বদলেছি। অ্যাকাডেমিক বইপুস্তকে থাকা একটি প্যাটার্ন ব্যবহার করেছি। বন্ধনির মাঝে প্রথম লেখকের/গবেষকের নাম দেয়া হয়েছে, পাশে সেই রচনার সাল উল্লেখ করা হয়েছে। কোনো গবেষণাপত্র/বই-এর রচয়িতা একাধিক হলে ১-২ জনের নাম উল্লেখ করে পাশে et al./এট এল. লেখা হয়েছে; এর অর্থ সহযোগী লেখকগণ। মূল আলোচনায় থাকা ক্রমানুসারে এই অংশে তথ্যসূত্র সাজানো হয়েছে। একই তথ্যসূত্র থেকে পরপর একাধিকবার তথ্য নেয়া হলে রেফারেন্স দেয়ার ক্ষেত্রে ২য় বার থেকে পুরো নাম না লিখে ibid./প্রাগুক্ত লেখা হয়েছে। কিছু কিছু জায়গায় Million years কে সংক্ষেপে my, Billion years কে সংক্ষেপে by লেখা হয়েছে। বইতে প্রচুর ছবি ব্যবহার করা হয়েছে। ছবিগুলো ইসলামের মুলনীতি মাথায় রেখে চয়ন করা হয়েছে।

এই বইটিকে মূলত বিজ্ঞানের দর্শন, মহাকাশবিদ্যা, বিবর্তনের উপর একটি ইনট্রোডাকশন হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। আলোচনায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ের একডেমিক/গবেষককে রেফার করা হয়েছে। বইতে বিবর্তনবাদি বলতে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসেবে বিবর্তনের সমর্থক বোঝানো হয়েছে। তবে যারা বিবর্তনকে নিজের জায়গা থেকে টেনে-হিঁচড়ে ধর্ম বানিয়ে ফেলেছেন তাদের ক্ষেত্রেও বিবর্তনবাদি শব্দটিই ব্যবহার করা হয়েছে। একাডেমিয়াতে দুটোকে আলাদা শব্দে অভিহিত করতে দেখিনি। বিবর্তনের স্বাক্ষ্য আলোচনায় মূলত পাঠ্যপুস্তকে থাকা উপাত্তগুলোকে যাচাই করা হয়েছে। যেহেতু বিবর্তনের সপক্ষে আনা উপাত্তগুলো মূলত সাদৃশ্য বা হোমোলজি নির্ভর, তাই শুরুতে হোমোলজি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এরপর উল্লেখযোগ্য কিছু প্রস্তাবিত স্বাক্ষ্য আলোকপাত করা হয়েছে।

বিবর্তন অংশের আলোচনায় মূলত বিবর্তনবাদি গবেষক, জার্নালকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। কিছু মানুষ খোলামনে ভাবতে পারেন না, কোনো বক্তব্যের যৌক্তিকতা বিচার করার আগেই কুযুক্তিতে জড়িয়ে যান। এজন্য, বিবর্তনসংক্রান্ত আলোচনায় আস্তিক বিজ্ঞানীদের উদ্ধৃত করা যথাসাধ্য এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। উদ্ধৃত করলেও পিয়ার রিভিউড উৎস থেকেই উল্লেখ করা হয়েছে। খোলামনের বৈশিষ্ট্য হলো উভয়দিকের মতই নিরপেক্ষভাবে পড়া। তাই আমি দুইদিকের মতই উল্লেখ করেছি। অত্যন্ত শঙ্কা ও দুঃখের ব্যাপার হলো যারা মুখে মুক্তচিন্তার বুলি ছোটান তাদের অধিকাংশই কার্যত খুব সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি লালন করেন। তারা এই বইয়ের উদ্দেশ্য নয়, বরং যার চিন্তাজগত এখনো প্রবৃত্তি ও সাম্রাজ্যের প্রভাব দ্বারা দূষিত হয় নি, সে এই বই থেকে যথেষ্ট খোরাক পাবে আশা করি। মানুষের কোনো কাজ ভুলমুক্ত নয়। এই বইতেও ভুল থাকা স্বাভাবিক। সচেতন পাঠকদের চোখে ভুল ধরা পড়লে প্রমাণসহ আমাকে জানাবেন। আমি যাচাই করে তা ঠিক করে নিবো।

www.QuranerAlo.net

সতর্কতা

বক্ষ্যমাণ বইতে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার সময় বাংলাদেশের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের জনপ্রিয় পাঠ্যপুস্তকের বক্তব্যকে যাচাই করা হয়েছে বিভিন্ন জার্নাল, গবেষণাপত্র ও অ্যাকাডেমিক বইপত্র দিয়ে। এই সকল বইয়ের শ্রদ্ধেয় ও বরেণ্য লেখক/লেখিকার প্রতি কোনোরূপ অসম্মান বা তাদের ব্যক্তিগত বিশ্বাস/অবিশ্বাস নিয়ে চর্চা করার জন্য পাঠ্যবইগুলোকে রেফারেন্স হিসেবে আনা হয় নি। শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত কারিকুলাম অনুযায়ীই তাদের বই লিখতে হয়। তাই পাঠকদের প্রতি অনুরোধ, শ্রদ্ধেয় লেখকদের নিয়ে মন্তব্য বা পরচর্চা না করে এই বইতে ভালো যা পেলেন তা নিয়েই আলোচনায় মুখরিত হউন। জ্ঞান বিনিময় করুন। জ্ঞানের বিকাশে অগ্রণী হউন।

পাঠ্যপুস্তকের তালিকা

- বিজ্ঞান। অষ্টম শ্রেণি (NCTB, ২০১৯ শিক্ষাবর্ষ)
- জীববিজ্ঞান। নবম-দশম শ্রেণী (NCTB, ২০১৯ শিক্ষাবর্ষ)
- বিজ্ঞান। নবম-দশম শ্রেণী (NCTB, ২০১৯ শিক্ষাবর্ষ)
- পদার্থবিজ্ঞান। নবম-দশম শ্রেণি (NCTB, ২০১৭ শিক্ষাবর্ষ)
- ড. মোহাম্মদ আবুল হাসান (২০১৯), জীববিজ্ঞান প্রথম পত্র। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি (ঢাকা: হাসান বুক হাউস)
- গাজী আজমল ও গাজী আসমত (২০১৯), জীববিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি (ঢাকা: গাজী পাবলিশার্স, ষষ্ঠ রঙিন সংস্করণ)
- ড. মোঃ আবদুল আলীম (২০১৯), জীববিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি (ঢাকা: [illegible] পাবলিকেশনস, ষষ্ঠ সংস্করণ)
- প্রফেসর ড. নূর-ই-পারভীন খানম ও অন্যান্য (২০১১), জীববিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র। একাদশ-দ্বাদশ [illegible] (ঢাকা: অক্ষরপত্র প্রকাশন, ৫ম সংস্করণ)
- মাজেদা বেগম ও অন্যান্য (২০১৯), জীববিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি (ঢাকা: কাজল ব্রাদার্স লিমিটেড, চতুর্থ প্রকাশ)

নক্ষত্রের কোরাস

- Lindsay Brooke (2017), A universe of 2 trillion galaxies. *Phys.org*
- বিজ্ঞান। অষ্টম শ্রেণি (২০১৯) পৃ. ১২১
- Elizabeth Howell (2017), What is Space? Space.com
- Bruce Sheiman, An Atheist Defends Religion: Why Humanity is Better Off with Religion than Without It (Alpha Books, 2009) p. 117-118

‘The militant atheists lament that religion is the foremost source of the world's violence is contradicted by three realities: Most religious organizations do not foster violence; many nonreligious groups do engage in violence; and many religious moral precepts encourage nonviolence. Indeed, we can confidently assert that if religion was the sole or primary force behind wars, then secular ideologies should be relatively benign by comparison, which history teaches us has not been the case. Revealingly, in his *Encyclopedia of Wars*, Charles Phillips chronicled a total of 1,763 conflicts throughout history, of which just 123 were categorized as religious. And it is important to note further that over the last century the most brutality has been perpetrated by nonreligious cult figures (Hitler, Stalin, Kim Jong-Il, Mao Zedong, Saddam Hussein, Pol Pot, Idi Amin, Fidel Castro, Slobodan Milosevic, Robert Mugabe—you get the picture). Thus to attribute the impetus behind violence mainly to religious sentiments is a highly simplistic

www.QuranerAlo.net

interpretation of history.

ঝরণার কথা

- Adam Smith (1869), The Essays of Adam Smith; p. 353 (London)
- Firas Alkhateeb (2017), Lost Islamic History: Reclaiming Muslim Civilisation from the Past (UK: Hurst & Co., Revised-Updated Edition) p. 75
- Jonathan Lyons (2010), The House of Wisdom: How the Arabs Transformed Western Civilization; p. 81-83 (Bloomsbury Publishing)
- ডা. লরেন্স ব্রাউন (২০১১), স্রষ্টার সর্বশেষ প্রত্যাদেশ আল কুরআন (বঙ্গানুবাদ-ঢাকা: তাওহীদ পাবলিকেশনস)
- Jim Al-Khalili (2009), The 'First True Scientist'. BBC
- Jim Al-Khalili (2012), The House of Wisdom : How Arabic Science Saved Ancient Knowledge and Gave Us the Renaissance (Penguin Books) chapter 11
- M.S. Alias & M.S. Hanapi (2015), Ibn Al-Haytham's Philosophy on Scientific Research Applied in Islamic Research Methodology: Analysis from Tasawwur, Epistemology and Ontology Perspectives. International Journal of Business, Humanities and Technology, 5:1, p. 83-93
- Jacalyn Kelly et al. (2014), Peer Review in Scientific Publications: Benefits, Critiques, & A Survival Guide. EJIFCC. Vol. 25, Issue 3, p. 227–243
- পদার্থবিজ্ঞান। নবম-দশম শ্রেণি (২০১৭ শিক্ষাবর্ষ), NCTB, পৃ. ০৩
- Robert Briffault, The Making of Humanity; p. 188 (London, George Allen & Unwin Ltd., 1st published 1919); আরও দেখুন: George Saliba, Islamic Science and the Making of the European Renaissance (MIT Press, 2007)
- IslamQA (2014), Consensus that the Earth is round https://islamqa.info/en/answers/118698/consensus-that-the-earth-is-round
- Salim T.S. Al-Hassani [Edt.] (2012), 1001 Inventions: The Enduring Legacy of Muslim Civilization (National Geographic, 3rd edition) p. 264-292

মহাকাশে নৃত্য

- Steven E. Jones (2011), A Brief Survey of Sir Isaac Newton's Views on Religion in Converging Paths to Truth (Brigham Young University, Deseret Book) p. 61–78.
- Ethan Siegel (2016), When Did Isaac Newton Finally Fail? Forbes
- Amanda Gefter (2010), Newton's apple: The real story. NewScientist

মহাবিস্ফোরণ এবং অতঃপর

- Yujin Nagasawa (2011), The Existence of God: A Philosophical Introduction (Routledge), p. 128-149
- Helge Kragh (1996), Cosmology and Cotroversy (Princeton University Press) p.30
- আহমাদ মোস্তফা কামাল (২০১৯), আমাদের মহাজাগতিক পরিচয় (ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন) পৃ. ৯৮
- রাফান আহমেদ (২০১৯), অবিশ্বাসী কাঠগড়ায় (ঢাকা: সমর্পন প্রকাশন, ২য় সংস্করণ) পৃ. ২৪০-২৪১
- Paul J. Steinhardt (2011), The Inflation Debate: Is the theory at the heart of

www.QuranerAlo.net

Contents

modern cosmology deeply flawed? *Scientific American*
- What is gravity? NASA, StarChild Question of the Month for February 2001
- Astrophysicist Prof. Aleksey Filippenko quoted in RT News (2012), Scientists only understand 4% of universe.
- David Merritt (2017), Cosmology and convention. Studies in History and Philosophy of Modern Physics, 57:41–52
- ড. জাফর ইকবাল (২০১৮), বিগ ব্যাং থেকে হোমো স্যাপিয়েন্স (ঢাকা: জ্ঞানকোষ প্রকাশনী) পৃ. ২৫-২৬
- ScienceDaily (2017), Dark matter and dark energy: Do they really exist? Université de Genève
- Juri Smirnov (2019), Dark matter may not actually exist – and our alternative theory can be put to the test. The Conversation
- Pallab Ghosh (2019), Telescope tracks 35 million galaxies in Dark Energy hunt. BBC
- New evidence shows that the key assumption made in the discovery of dark energy is in error (2020). Phy.org [arxiv.org/abs/1912.04903]
- Stuart Clark (2017), Cosmic uncertainty: Is the speed of light really constant? NewScientist; Abigail Beall (2016), Was Einstein wrong? Controversial theory claims the speed of light is not a constant. WIRED
- Jeremy Deaton (2019), Einstein showed Newton was wrong about gravi Now scientists are coming for Einstein. NBC News
- ড. জাফর ইকবাল (২০১৫), কোয়ান্টাম মেকানিক্স (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ৪র্থ মুদ্রণ) পৃ. ৪৯
- Sean Carroll (2019), Even Physicists Don't Understand Quantum Mechanic Newyork Times
- Lisa Grossman (2012), Why physicists can't avoid a creation event. NewScientist
- Ekrem Aydiner (2018), Chaotic universe model. Nature 8:721
- Helge Kragh (2019), Alternative cosmological theories in The Oxford Handbook of the History of Modern Cosmology (Oxford: Oxford University Press)
- John Bowker (2014), God: A very short introduction (Oxford: Oxford University Press) p. 32

বিনি সুতোর মালা

- Deborah Kelemen (2004), Are Children 'Intuitive Theists?: Reasoning about Purpose and Design in Nature; *Journal of Psychological Science*, Vol. 15, No. 05, p. 295-301
- Martin Beckford (2008), Children are born believers in God, academic claims. The Telegraph
- Paul Bloom (2007), Religion is natural. Journal of Developmental Science 10:1, p. 147-151
- Dr. Justine L. Barrett (2012), The God Issue: We are all Born Believers; NewScientist
- Deborah Kelemen (2015), The Divided Mind of a Disbeliever: Intuitive

www.QuranerAlo.net

Beliefs About Nature as Purposefully Created Among Different Groups of Non-Religious Adults. Cognition Vol 140, p. 72-88.
- Paul Davis (2006), God and the New Physics; Chapter 13: Black holes and cosmic chaos (Penguin Books Ltd.)
- Stephen Hawking (1988), A Brief History of Time (New York : Bantam Books) p. 127
- Paul Davis (2008), The Goldilocks Enigma: Why the Universe is Just Right for Life (Mariner Books, reprint edition) Chapter 7: A Universe Fit for Life
- Stephen Hawking (1988), A Brief History of Time; p. 125
- Geraint F. Lewis and Luke A. Barnes (2016), A fortunate universe : life in a finely-tuned cosmos (Cambridge University Press)
- P. D. Ward & D. Brownlee (2003), Rare Earth: Why Complex Life Is Uncommon in the Universe (New York: Springer Copernicus Books) p. 15-35
- Howard A. Smith (2011), Alone in the Universe. American Scientist, Vol. 99, p. 320-327
- Ward & Brownlee (2003), Rare Earth: Why Complex Life Is Uncommon in the Universe, p. 222-229
- Jeannie Allen (2001), Ultraviolate Radiation: How it affects life on earth. Earth Observatory, NASA
- Tim Sharp (2017), Earth's Atmosphere: Composition, Climate & Weather. Space.com
Lee Smolin (1997), The Life of the Cosmos (Oxford: Oxford University Press) p. 45, 72, 325
- Nathaniel Scharping (2016), Earth May Be a 1-in-700-Quintillion Kind of Place. Discover Magazine
- Brian & Deborah Charlesworth (2017), Evolution: A very short introduction (Oxford University Press, Revised impression) p. 9
- Jason Waller (2020), Cosmological fne-tuning arguments : what (if anything) should we infer from the fne-tuning of our universe for life? (Routledge)

বিজ্ঞানের গান

- ড. জাফর ইকবাল (২০১৫), কোয়ান্টাম মেকানিক্স (মাওলা ব্রাদার্স) পৃ. ৪৯
- ড. জাফর ইকবাল (২০১৯), আরো একটুখানি বিজ্ঞান (কাকলী প্রকাশনী), পৃ. ১৭
- Bertrand Russel quoted in Samir Okasha (2016), Philosophy of Science: A Very Short Introduction (Oxford: Oxford University Press, 2nd edition) p. 115
- দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (২০১৮), যে গল্পের শেষ নেই (ঢাকা: মাটিগন্ধা, ১ম সংস্করণ) পৃ. ৫-৬
- ড্যান ব্রাউন (২০১৮), অরিজিন (বঙ্গানুবাদ-ঢাকা: বাতিঘর প্রকাশনী, ৪র্থ সংস্করণ) পৃ. ১১৫
- ড. জাফর ইকবাল (২০১৯), একটুখানি বিজ্ঞান (কাকলী প্রকাশনী), পৃ. ২৩
- Brian & Deborah Charlesworth (2017), Evolution: A very short introduction (Oxford University Press, Revised impression) p. 3
- ড. জাফর ইকবাল (২০১৫), কোয়ান্টাম মেকানিক্স, পৃ. ০৯
- James Ladyman (2002), Understanding philosophy of science (New York:

www.QuranerAlo.net

Routledge) p. 04
- Samir Okasha (2016), Philosophy of Science: A Very Short Introduction (Oxford: Oxford University Press, 2nd edition) p. 15
- Hugh G. Gauch Jr. (2003), Scientific Method in Practice (Cambridge: Cambridge University Press) p. 131
- ড. জাফর ইকবাল (২০১৯), একটুখানি বিজ্ঞান, পৃ. ১৩
- Christof Koch (2004), Thinking About the Conscious Mind. Science, Vol. 306, p. 979
- Jim Baggott (2019), Post-empirical science is an oxymoron, and it's dangerous. Aeon

> It turns out to be impossible even to formulate a scientific theory without metaphysics, without first assuming some things we can't actually prove, such as the existence of an objective reality and the invisible entities we believe to exist in it. This is a bit awkward because it's difficult, if not impossible, to gather empirical facts without first having some theoretical understanding of what we think we're doing...

- Albert Einstein quoted in Glen Borchardt (2004), The Ten Assumptions of Science: Toward a New Scientific Worldview (iUniverse, Inc.) p. 15
- Daniel C. Dennett (1996), Darwin's Dangerous Idea: Evolution and the Meanings of Life (England: Penguin Books) p. 21
- Margaret Wertheim quoted in John Brockman (etd., 2006), What We Beli but Cannot Prove (Perfectbound) p. 176
- Peter Harrison (2019), Introduction in Science without God?: Rethink the History of Scientifc Naturalism (Oxford: Oxford University Press) p. 1-
- Jonathan Marks (2009), Why I Am Not a Scientist (Berkeley: University o California Press) p. 05

> Science is different, and began to emerge only with a strange idea of the Enlightenment: that the physical world—the world of perceptions and sensations and measurability—was somehow different and separate from the spiritual and moral worlds. Nature was amenable to certain forms of knowledge production of a different order than the kinds of knowledge one could obtain from the spiritual realm. This was not to say that God or heaven did not exist, only that they were separate and distinct from the physical world. This bracketing off of nature from supernature became the signature of science.

- National Academy of Sciences (1998), Teaching About Evolution and The Nature of Science (Washington, DC: National Academy Press) p. 58
- John Horgan (2017), Why String Theory Is Still Not Even Wrong. Scientific American

> Many ideas that are "not even wrong", in the sense of having no way to test them... The problem with such things as string-theory multiverse theories is that "the multiverse did it" is not just untestable, but an excuse for failure. Instead of opening up scientific progress in a new direction, such theories are designed to shut down scientific progress by justifying a failed research program.

- ড. জাফর ইকবাল (২০১৮), বিগ ব্যাং থেকে হোমো স্যাপিয়েনস (জ্ঞানকোষ প্রকাশনী) পৃ. ১৬-১৭

www.QuranerAlo.net

Contents

- G.F.R Ellis et.al. (2004), Multiverses and Physical Cosmology. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 347:03, p. 921-936
- ড. জাফর ইকবাল (২০১৮), বিগ ব্যাং থেকে হোমো স্যাপিয়েনস, পৃ. ১৭
- Lee Smolin (2015), You think there's a multiverse? Get real. NewScientist, 225(3004), 24–25

> 'These other universes are unobservable and because chance dictates the random distribution of properties across universes, positing the existence of a multiverse does not let us deduce anything about our universe beyond what we already know. As attractive as the idea may seem, it is basically a sleight of hand, which converts an explanatory failure into an apparent explanatory success... the multiverse fails as a scientific hypothesis

- Yujin Nagasawa (2011), The Existence of God: A Philosophical Introduction (Routledge), p. 15
- Alison Gopnik (2014), See Jane Evolve: Picture Books Explain Darwin. Wall Street Journal
- Richard Lewontin (1997), Billions and Billions of Demons. Review of The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark (Carl Sagan). New York Review of Books
- Dr. Jerry Bergman PhD (2011), Slaughter of the Dissidents (Leafcutter Press)
- Jonathan Marks (2009), Why I Am Not a Scientist, p. 3

> 'The act of discovery hinges on what is constituted by a scientist's being "suitably primed." Being ready for a discovery implies a context of the right social environment, the means, and the intellectual precursors that allow the discovery to be rendered sensible. It is unlikely that natural selection could have been discoverable outside the context of competitive, industrial Victorian England. At any rate, it had never been discovered before and was recognized separately by Charles Darwin, Alfred Russel Wallace, and Herbert Spencer at about the same time.

- Jonathan Marks (2002), What It Means to Be 98% Chimpanzee: Apes, People, and Their Genes (University of California Press), p. 236

> 'The great paradox of modern science is that scientists are not trained to think about science; they are trained to do it, to carry it out.'

- Richard Dawkins quoted in Thomas Sutcliffe (2001), Richard Dawkins: The prophet of reason. Independent

ল্যাবরেটরির অন্তঃপুর

- Stephen Hawking (1988), A Brief History of Time, p. 10 (New York : Bantam Books)

> 'Any physical theory is always provisional, in the sense that it is only a hypothesis: you can never prove it. No matter how many times the results of experiments agree with some theory, you can never be sure that the next time the result will not contradict the theory.

- James Ladyman (2002), Understanding philosophy of science (New York:

www.QuranerAlo.net

Routledge) p. 162-194
- Henry Gee (2013), Science: the religion that must not be questioned. The Guardian
- Kenneth J. Locey & Jay T. Lennon (2016), Scaling laws predict global microbial diversity. PNAS 113 (21): 5970-5975
- Lee Sweetlove (2011), Number of species on Earth tagged at 8.7 million. Nature | News
- Charles Darwin, The Origin of Species, P. 22 (P F Collier & Son, New York, 1909)

‘... I am well aware that scarcely a single point is discussed in this volume on which facts cannot be adduced, often apparently leading to conclusions directly opposite to those at which I have arrived...

- Nicolas Rasmussen (1993), Review of The Eclipse of Darwinism. Anti-Darwinian Evolution Theories in the Decades Around 1900. The Quarterly Review of Biology, 68:4, p. 564
- Richard Dawkins (2004), A Devil's Chaplain: Reflections on Hope, Lies, Science, and Love (Houghton Mifflin Harcourt) p. 81
- Philippe Huneman & Denis M. Walsh (2017), Challenging The Modern Synthesis (Oxford: Oxford University Press)
- Ethan Siegel (2017), Scientific Proof Is A Myth. Forbes

‘You've heard of our greatest scientific theories: the theory of evolution, the Big Bang theory, the theory of gravity. You've also heard of the concept of a proof, and the claims that certain pieces of evidence prove the validities of these theories. Fossils, genetic inheritance, and DNA prove the theory of evolution. The Hubble expansion of the Universe, the evolution of stars, galaxies, and heavy elements, and the existence of the cosmic microwave background prove the Big Bang theory. And falling objects, GPS clocks, planetary motion, and the deflection of starlight prove the theory of gravity. Except that's a complete lie. While they provide very strong evidence for those theories, they aren't proof. In fact, when it comes to science, proving anything is an impossibility... it's completely impossible to prove anything in science... And that's why everything we do in science, no matter how well it gets tested, is always preliminary.

- Elliott Sober (2008), Evidence and Evolution: The Logic behind the Science (Cambridge University Press), p. 97
- Samir Okasha (2016), Philosophy of Science: A Very Short Introduction (Oxford: Oxford University Press, 2nd edition) p. 60
- Peter Pruzan (2016), Research Methodology: The Aims, Practices and Ethics of Science (Switzerland: Springer International Publishing) p. 44-48

‘Science based on a set of presuppositions or beliefs that cannot be proved by logic or firmly established by evidence... There are certainly a number of what we might be tempted to call common sense propositions underlying science. For example that the physical world exists, that it is orderly, that our sense perceptions are generally reliable, and that rational thought can synthesize the ordered reality of the physical world and the observations of our senses into true and reliable

www.QuranerAlo.net

knowledge—in other words, that the physical world is comprehensible.

- Science has limits: A few things that science does not do. Understanding Science by UC Museum of Paleontology of the University of California, Berkeley. Retrieved from : http://tinyurl.com/y2j8p2qv

- এই তালিকায় আছেন - স্যাম হ্যারিস, রিচার্ড ডকিন্স, নীল ডিগ্রাসি টাইসন, স্টিফেন হকিং, স্টিফেন ওয়ানবার্গ, এডওয়ার্ড উইলসন প্রমুখ পরিচিত (নাস্তিক) বিজ্ঞানীগণ। তাদের নিজেদের পরিমণ্ডলের লোকই তাদের বিজ্ঞানবাদিতা প্রচারের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। দেখুন : Massimo Pigliucci (2018), The Problem with Scientism. American Philosophical Association Blog. See also: Massimo Pigliucci (2019), The Variety of Scientisms & the Limits of Science. Center for Inquiry. Youtube https://youtu.be/Xbu3634j0MA

- Gregory R. Peterson (2003), Demarcation and The Scientistic Fallacy. *Journal of Religion & Science*, 8:4, p. 751-761

- John P. A. Ioannidis (2011), An Epidemic of False Claims. *Scientific American*

- Richard Smith (2006), Peer review: A Flawed Process at The Heart of Science and Journals. Journal of the Royal Society of Medicine 99(4): 178–182

- Nobel Prize-winning scientist Frances Arnold retracts paper. BBC, 3 January 2020. https://www.bbc.com/news/world-us-canada-50989423

- Lee Smolin (2017), The Trouble with Physics: The Rise of String Theory, the Fall of a Science, and What Comes Next (Mariner Books, 1st Edition) chapter 16

- John Horgan (2019), Jeffrey Epstein and the Decadence of Science. Scientific American

- Andrew Grey quoted in Kai Kupferschmidt (2018), Researcher at the center of an epic fraud remains an enigma to those who exposed him. *Science* | News

- M. Castillo (2014), The Fraud and Retraction Epidemic. *American Journal of Neuroradiology* 35 (9) 1653-1654

- Paul D. Thacker (2018), How A Flood of Corporate Funding Can Distort NIH Research. The Washington Post

- Kim Kyung-Hoon (2015), Coca-Cola 'trying to manipulate public' on sugar-obesity link. RT News

- Phoebe Weston (2019), Ethnic minority academics less likely to get funding than white researchers. Independent

- John Horgan (2019), How Can We Curb the Spread of Scientific Racism? *Scientific American*

- Angela Saini (2019), Superior: The Return of Race Science (Beacon Press books)

- Elaine H. Ecklund et al. (2016), Religion among Scientists in International Context: A New Study of Scientists in Eight Regions. *Socius*, Vol. 2, p. 1-9

- Henry Gee (2013), Science: The religion that must not be questioned. The Gurdian

- John Horgan (2019), Was Darwin Wrong?: A journalist recounts the epic story of modern challenges to evolutionary dogma. *Scientific American*

www.QuranerAlo.net

- ড. জাফর ইকবাল (২০১৯), একটুখানি বিজ্ঞান (কাকলী প্রকাশনী) পৃ. ১৪
- Hamza Andreas Tzortzis (2019), The Divine Reality: God, Islam & The Mirage of Atheism (Lion Lock Publishing, Revised Edition)

বিবর্তনের ইতিবৃত্ত

- William Darwin quoted in John Durant (ed., 1985), Darwinism and Divinity: Essays on Evolution and Religious Belief (New York: Basil Blackwell), p. 18
- পিপারড মথ পরীক্ষা নিয়ে বক্তব্য: Jerry A. Coyne (1998), Not black and white. Nature vol. 396, p. 35–36
- Jonathan Howard (2001), Darwin: A very short introduction (Oxford: Oxford University Press) p. 8-9
- জীববিজ্ঞান। নবম-দশম শ্রেণী (২০১৯) পৃ. ২৭৩
- Michael Ruse (2019), Removing God from Biology in Science without God?: Rethinking the History of Scientifc Naturalism (Oxford: Oxford University Press) p. 130-147
- Michael Ruse (2011), Is Darwinism a Religion? Huffpost
- Neal C. Gillespie (1979), Charles Darwin and the Problem of Creation (Chicago: University of Chicago Press) p. 147

> It is sometimes said that Darwin converted the scientific world to evolution by showing them the process by which it had occurred. Yet the uneasy reservations about natural selection among Darwin's contemporaries and the widespread rejection of it from the 1890s to the 1930s suggest that this is too simple a view of the matter. It was more Darwin's insistence on totally natural explanations than on natural selection that won their adherence.

- দ্বিজেন শর্মা (২০১৬), চার্লস ডারউইন ও প্রজাতির উৎপত্তি (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ৩য় মুদ্রণ) ভূমিকা
- Michael A. Flannery (2018), Nature's Prophet: Alfred Russel Wallace and His Evolution from Natural Selection to Natural Theology (Alabama: The University of Alabama Press)
- Peter J. Bowler (1989), Evolution: The History of an Idea (University of California Press) p. 246
- Peter J. Bowler (2003), Evolution: The History of an Idea, p. 338
- Michael Ruse (2003), Is Evolution a Secular Religion? *Science*, 299:5612, p. 1523-1524
- Michael Ruse (2011), Is Darwinism a Religion? Huffpost
- John M. Lynch (2005), The Secular Religion of Evolution(Ism). *Nature Cell Biology*, 7:12, p. 1150
- Anton Szandor LaVey, The Satanic Bible; Introduction by Burton H. Wolfe

> Satanism is a blatantly selfish, brutal religion. It is based on the belief that man is inherently a selfish, violent creature, that life is a Darwinian struggle for survival of the fittest, that the earth will be ruled by those who fight to win the ceaseless competition that exists in all jungles — including that of urban societies. On that score, the Church of Satan may be justly criticized, although even its critics will have to admit that its philosophy is based on logic and real

www.QuranerAlo.net

conditions that exist in the world.

- Jerry Fodor & Piattelli-Palmarini Massimo (2010), What Darwin Got Wrong (New York: Farrar, Straus and Giroux) p. xiii
- Michael Ruse (2017), Darwinism as religion: What literature tells us about evolution (Oxford: Oxford University Press)
- Michael Ruse (2011), Is Darwinism a Religion? Huffpost
- জীববিজ্ঞান। নবম-দশম শ্রেণী (২০১৯) পৃ. ২৭৬
- Michael R Rose & Todd H Oakley (2007), The new biology: beyond the Modern Synthesis. *Biol Direct* 2:30
- Denis Noble (2013), Physiology is rocking the foundations of evolutionary biology. *Experimental Physiology*, 98:8, p. 1235-1243
- Suzan Mazur (2009), Eugene Koonin: The New Evolutionary Biology. Huffpost
- Gerd Muller et.al. (2015), The extended evolutionary synthesis: its structure, assumptions and predictions. *Proc. R. Soc. B* 282:20151019
- Pete Gunter (2006), Darwinism: Six Scientific Alternatives. *The Pluralist*, Vol. 1, No. 1, p. 13-30
- Carl Zimmer (2016), The Biologists Who Want to Overhaul Evolution. The Atlantic
- Henry Gee (2013), Science: The religion that must not be questioned. The Gurdian

বিবর্তনচিন্তার কাঠামো

- Kostas Kampourakis (2014), Understanding Evolution (Cambridge: Cambridge University Press) p. XVII
- Whitley R.P. Kaufman (2016), Human Nature and the Limits of Darwinism (New York: Springer Nature) p. 173-196

প্রাণের ইতিহাস

- Peter J. Bowler (2003), Evolution: The History of an Idea (University of California Press) p. 49-50, 66-67
- ibid p. 125
- ibid p. 229
- Bernard Wood (2005), Human evolution: A Very Short Introduction (Oxford University Press), p. 15
- W. Ford Doolittle & Tyler D. P. Brunet (2016), What Is the Tree of Life? PLOS Genetics

> The … agreement of molecular and organismal trees is not really a disproof of the theistic explanation Darwin wanted to supplant. Any sensible creator would surely use similar genes to make similar organisms.

- S. Andrew Inkpen & W. Ford Doolittle (2016), Molecular Phylogenetics and the Perennial Problem of Homology. J. Mol. Evol. 83 (5-6) : 184-192

www.QuranerAlo.net

Contents

- Ernst Mayr (2002), What Evolution Is (Phoenix Books) p. 17-19
- Richard Dawkins (2009), The Greatest Show on Earth (New York: Simon and Schuster) p. 313

"If we want to use homology as evidence for the fact of evolution, we can't use evolution to define it. ... therefore, it is convenient to revert to the pre-evolutionary definition of homology.

- Ronald Brady (1985), On the Independence of Systematics. Cladistics, vol. 1, issue 2, p. 113-126

"Pre-Darwinian systematics did not profess an evolutionary explanation for homology ... [later definition] clearly confuses the condition to be explained with the explanation ... By making our explanation into the definition of the condition to be explained, we express not scientific hypothesis but belief. We are so convinced that our explanation is true that we no longer see any need to distinguish it from the situation we were trying to explain. Dogmatic endeavors of this kind must eventually leave the realm of science.

- Inkpen & Doolittle. (2016), Molecular Phylogenetics and the Perennial Problem of Homology. J. Mol. Evol. 83(5-6):184-192
- Trisha Gura (2000), Bones, molecules…or both? Nature, 406:230–233
- Liliana M. Davalos (2016), Understanding phylogenetic incongruence: lessons from phyllostomid bats. Biol. Rev. 87: 991–1024
- Ernst Mayr (2002), What Evolution Is, p. 19
- Inkpen & Doolittle (2016), Molecular Phylogenetics and the Perennial Problem of Homology. J. Mol. Evol. 83 (5-6) : 184-192
- Ernst Mayr (2002), What Evolution Is, p. 29
- W. Ford Doolittle (2000), Uprooting the Tree of Life. Scientific Americ 282 (2) : 90-5
- Rachael Moeller (2002), New Theory of Cell Evolution Rejects Singl Ancestor Doctrine. Scientific American
- Graham Lawton (2009), Uprooting Darwin's tree. NewScientist
- W. Ford Doolittle & Tyler D. P. Brunet (2016), What Is the Tree of Life? PLOS Genetics
- Ian Sample (2009), Evolution: Charles Darwin was wrong about the tree of life. The Guardian

ক্রমবিবর্তনের প্রক্রিয়া

- জীববিজ্ঞান। নবম-দশম শ্রেণি (২০১৯) পৃ. ২৭৫; বিজ্ঞান। নবম-দশম শ্রেণি (২০১৯) পৃ. ১১২
- গাজী আজমল ও গাজী আসমত (২০১৯), জীববিজ্ঞান। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি; পৃ. ৩৪৩
- প্রাগুক্ত; ড. নূর-ই-পারভীন খানম ও অন্যান্য (২০১৯), জীববিজ্ঞান। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি; পৃ. ৪০৬
- Denis Nobel (2017), Dance to the Tune of Life: Biological Relativity (Cambridge University Press), p. 126-128
- দ্বিজেন শর্মা (২০১৬), চার্লস ডারউইন ও প্রজাতির উৎপত্তি (সাহিত্য প্রকাশ) পৃ. ২৩
- Brian & Deborah Charlesworth (2017), Evolution: A very short introduction (Oxford University Press, Revised impression) p. 6

www.QuranerAlo.net

- Theodosius Dobzhansky (1982), Genetics and the Origin of Species (Columbia University Press) p. xxviii, 12
- M.A. Surani (2016), Breaking the germ line-soma barrier. *Nature Reviews Molecular Cell Biology, Journal club.*
- MY Stoeckle & DS Thaler (2018), Why should mitochondria define species? *Hum Evol.* 33:1–30
- David J. Depew & Bruce H. Weber (2011), The Fate of Darwinism: Evolution After the Modern Synthesis. Biol Theory 6:89–102
- Denis Nobel (2013), Physiology is rocking the foundations of evolutionary biology; *Journal of Experimental Physiology*, Vol. 98, Issue 8, p. 1235
- John S. Wilkins (2009), Defining Species: A Sourcebook from Antiquity to Today (Peter Lang Inc., International Academic Publishers) section 11
- Nancy Lofholm (2007), Mule's foal fools genetics with "impossible" birth. The Denver Post
- Michael J. Behe (2019), Darwin Devolves: The New Science about DNA That Challenges Evolution (HarperOne)
- Scott F. Gilbert et al.(1996), Resynthesizing Evolutionary and Developmental Biology. *Developmental Biology* 173, 357–372
- Suzan Mazur (2010), The Altenberg 16: An Exposé of the Evolution Industry (California: North Atlantic Books) p. 20
- James A. Shapiro (2011), Evolution: A View from the 21st Century (FT Press) p. 121
জীববিজ্ঞান। নবম-দশম শ্রেণি (২০১৯) পৃ. ৭-৮
Lynn Margulis (1974), Five-Kingdom Classification and the Origin and Evolution of Cells in: Dobzhansky T., Hecht M.K., Steere W.C. (eds), Evolutionary Biology (Boston: Springer)
- Dick Teresi (2011), Lynn Margulis Says She's Not Controversial, She's Right. Discover Magazine
- Helge Kragh (2019), *Alternative cosmological theories* in The Oxford Handbook of the History of Modern Cosmology (Oxford: Oxford University Press)

> It is worth keeping in mind that concepts such as standard, orthodox, mainstream, and consensus are purely sociological, and that a standard theory is not necessarily more correct or truer than an alternative and more heterodox theory. Moreover, what is accepted as a standard theory naturally changes over time and for this reason labels such as "standard," "orthodox," and "alternative" may be reversed as science progresses.

- Richard Lewontin (1997), Billions and Billions of Demons. Review of The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark (Carl Sagan). New York Review of Books

> But when scientists transgress the bounds of their own specialty they have no choice but to accept the claims of authority, even though they do not know how solid the grounds of those claims may be.... given the immense extent,

www.QuranerAlo.net

inherent complexity, and counterintuitive nature of scientific knowledge, it is impossible for anyone, including non-specialist scientists, to retrace the intellectual paths that lead to scientific conclusions about nature. In the end we must trust the experts and they, in turn, exploit their authority as experts and their rhetorical skills to secure our attention and our belief in things that we do not really understand.

- Dr. Jon C. Sanford & Christopher Rupe (2019), Contested Bones (FMS Publications, 2nd print) introduction
- David Gelernter (2019), Giving Up Darwin. Claremont Review of Books.
- David Gelernter quoted in Jennifer Kabbany (2019), Famed Yale computer science professor quits believing Darwin's theories. The CollegeFix
- বিজ্ঞান। নবম-দশম শ্রেণি (২০১৯), পৃ. ১১২

বুদবুদ রহস্য

- Charles Darwin (1871), Letter to J. D. Hooker
- ড. মোহাম্মদ আবুল হাসান (২০১৯), জীববিজ্ঞান প্রথম পত্র। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি, পৃ. ২
- Peter J. Bowler (2003), Evolution: The History of an Idea (University of California Press) p. 339-340
- জীববিজ্ঞান। নবম-দশম শ্রেণি (২০১৯) পৃ. ২৭১-২৭২; বিজ্ঞান। নবম-দশম শ্রেণি (২০১৯) পৃ. ১০২; প্রফেসর ড. নিশীথ কুমার পাল (২০১৪), বিবর্তনবিদ্যা (ঢাকা: আলেয়া বুক ডিপো, ১ম প্রকাশ) পৃ. ১৮
- Kevin Zahnle et.al. (2010), Earth's Earliest Atmospheres. *Cold Spring Harb Perspect Biol* 2:a004895
- ড. জাফর ইকবাল (২০১৮), বিগ ব্যাং থেকে হোমো স্যাপিয়েন্স (জ্ঞানকোষ প্রকাশনী) পৃ. ৩৪
- ScienceDaily (2016), Oxygen was present in the atmosphere much earl than previously assumed. Faculty of Science - University of Copenhagen.

> 'It is generally believed that the Early Earth was a completely anoxic, but our study shows that the surface of the Earth was exposed to a low oxygen atmosphere already this time. This has far reaching implications for how we investigate the pace of evolution of life and its biodiversity on our planet.'

- Harry Clemmey & Nick Badham (1982), Oxygen in the Precambrian Atmosphere: An Evaluation of the Geological Evidence. Geology, Vol. 10, p. 141-146
- Uwe Brand quoted in Shayla Love (2016), Encased in Salt a New Clue to the Evolution of Life on Earth. The Washington Post
- Stanley L. Miller & Gordon Schlesinger (1983), Prebiotic synthesis in atmospheres containing CH4, CO, and CO2. I. Amino acids. Journal of Molecular Evolution 19:376–382.
- Jon Cohen (1995), Novel Center Seeks to Add Spark to Origins of Life. Science, 270:1925-1926
- Freeman Dyson (2004), Origins of Life (Cambridge: Cambridge University Press, Revised edition) p. 33
- প্রফেসর ড. নিশীথ কুমার পাল (২০১৪), বিবর্তনবিদ্যা, পৃ. ২০-২১
- জীববিজ্ঞান। নবম-দশম শ্রেণি (২০১৯) পৃ. ২৭২-২৭৩

www.QuranerAlo.net

Contents

- ড. জাফর ইকবাল (২০১৮), বিগ ব্যাং থেকে হোমো স্যাপিয়েন্স, পৃ. ৩২
- Norio Kitadai & Shigenori Maruyama (2018), Origins of building blocks of life: A review. Geoscience Frontiers 9:1117-1153
- Laura F. Landweber and Laura A. Katz (1998), Evolution: Lost Worlds. Trends in Ecology and Evolution, 13:93-94
- Bruce Alberts (1998), The Cell as a Collection of Protein Machines: Preparing the Next Generation of Molecular Biologists. Cell, 92:291
- BioVisions (2011), The Inner Life of the Cell. Harvard University https://youtu.be/wJyUtbn0O5Y
- ScienceDaily (1999), Scientists Find Smallest Number Of Genes Needed For Organism's Survival. University Of North Carolina At Chapel Hill.
- Stephen C. Meyer (2009), Signature in The Cell: DNA and the Evidence for Intelligent Design (HarperCollins e-books) chapter 9
- David Abel (2009). The universal plausibility metric (UPM) & principle (UPP). Theor Biol Med Model 6(1):1–10.
- Francis Crick (1981), Life Itself: Its Origin and Nature (New York: Simon & Schuster) p. 88
- Michael P Robertson and Gerald F Joyce (2012), The Origins of the RNA World. Cold Spring Harb Perspect Biol 4(5): a003608.
- Harold S Bernhardt (2012), The RNA world hypothesis: the worst theory of the early evolution of life. Biol Direct 7: 23

প্রাণের গান

- Dr. Jay W. Shin, PhD (2018), More to our Junk DNA than meets the eye. TEDx Talks. https://youtu.be/WXqjacxw8zg
- ড. আবুল হাসান (২০১৯), জীববিজ্ঞান প্রথম পত্র। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি, পৃ. ৬০
- Stephen S. Hall (2012), Hidden Treasures in Junk DNA. Scientific American
- Alok Jha (2012), Breakthrough study overturns theory of 'junk DNA' in genome. The Gurdian
- Nessa Carey (2015), Junk DNA: A Journey through the Dark Matter of the Genome (New York, Columbia University Press)
- Robin McKie (2013), Scientists attacked over claim that 'junk DNA' is vital to life. The Gurdian
- Dan Graur (2012), How to Assemble a Human Genome? Slide 16
- Erika Check Hayden (2011), Cells May Stray from 'Central Dogma'. Nature | News, doi:10.1038/news.2011.304
- Adam P. Lothrop et.al (2013), Deciphering post-translational modification codes. FEBS Letters, 587: 1247–1257
- Richard Dawkins (2009), The Greatest Show on Earth: The Evidence for Evolution (Simon and Schuster) p. 409-410
- Richard Dawkins (1986), The Blind Watchmaker (New York: W.W. Norton) p. 270

www.QuranerAlo.net

- ScienceDaily (2019), Re-cracking the genetic code. Molecular Biology and Evolution (Oxford University Press)
- Sarah Everts (2017), Protein folding: Much more intricate than we thought. Chemical & Engineering News, Vol. 95, Issue 31, p. 32-38
- Eugene V Koonin (2012), Does the central dogma still stand? Biol Direct 7, 27
- ড. আবুল হাসান (২০১৯), জীববিজ্ঞান প্রথম পত্র। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি, পৃ. ৬৩
- Anjay Elzanowski & Jim Ostell (2019), The Genetic Codes. NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Utils/wprintgc.cgi
- Antony Flew (2006), There is a God: How the world's most notorious atheist changed his mind (New York, HarperCollins) p. 128
- Tin Yau Panga & Sergei Maslova (2013), Universal distribution of component frequencies in biological and technological systems. Proceedings of the National Academy of Sciences, 201217795.
- Encyclopædia Britannica, Life On Earth. Last Update November 2019. https://www.britannica.com/science/life
- J.T. Trevors & D.L. Abel (2004), Chance and necessity do not explain the origin of life. Cell Biology International, Vol. 28, p. 729-739
- Vladimir I. shCherbak & Maxim A. Makukovb (2013), The "Wow! Signal" of the terrestrial genetic code. Icarus, Vol. 224, Issue 1, p. 228-242
- George Wald (1954), The Origin of Life; Scientific American, 191:46
- Hubert P.Yockey (1977), A Calculation Of The Probability Of Spontanec Biogenesis By Information Theory. Journal of Theoretical Biology, Volu 67, Issue 3, p. 377-398
- _______ (2002), Information theory, evolution and the origin of li Information Sciences 141:219–225
- Scott C. Todd (1999), A view from Kansas on that evolution debate; Nature, vol. 401, p. 423

হেকেলের ভণ্ডামো

- Charles Darwin (1860), Letter to Asa Gray, September 10
- Charles Darwin (1859), On the Origin of Species by Means of Natural Selection (London: John Murray, 1st ed.) p. 442, 449
- গাজী আজমল ও গাজী আসমত (২০১৯), জীববিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি; পৃ. ৩৪৭
- Peter J. Bowler (2003), Evolution: The History of an Idea (University of California Press) p. 124-126
- Alexander Vucinich (1988). Darwin in Russian Thought (Berkeley: University of California Press) p. 93
- গাজী আজমল ও গাজী আসমত (২০১৯), জীববিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি; পৃ. ৩৪৭
- মাজেদা বেগম ও অন্যান্য (২০১৯), জীববিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি; পৃ. ৪৮৩
- গাজী আজমল ও গাজী আসমত (২০১৯), জীববিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি; পৃ. ৩৪৭

www.QuranerAlo.net

Contents

6 যেমন বেয়ারের মত উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়েছে, «একটি শিশু প্রাণীকে তার নিম্নস্তরের প্রাণিগোষ্ঠীর পূর্ণাঙ্গ দশার মতো নয় বরং [ঐ প্রাণীরই] শিশু বা ভ্রূণীয় দশার মতো দেখায়।» থমাস হাক্সলি এভাবে বলেছিলেন, «The embryo of a higher form never resembles any other form, but only its embryo.» ‡ অথচ হেকেলের দাবি ছিলো পুরো উল্টো—জীবের ভ্রূণের পরিস্ফুটনের সময় তার পূর্বপুরুষের ক্রমবিকাশের ঘটনাবলি পুনরাবৃত্তি হয়।

‡ Thomas Henry & Henfrey, Arthur (ed., 1853). Scientific memoirs, selected from the transactions of foreign academies of science, and from foreign journals; p. 214

- বিজ্ঞান। নবম-দশম শ্রেণি (২০১৯) পৃ. ১০৬
- Nicolas Rasmussen (1991), The Decline of Recapitulationism in Early Twentieth-century Biology: Disciplinary conflict and consensus on the battleground of theory. *Journal of the History of Biology* vol. 24, p. 51–89
- S. Andrew Inkpen & W. Ford Doolittle (2016), Molecular Phylogenetics and the Perennial Problem of Homology. *J. Mol. Evol.* 83 (5-6) : 184-192
- Andres Collazo (2000), Developmental Variation, Homology, and the Pharyngula Stage. *Sytematic Biology* 49(1): 3–18
- Jonathan Wells (1999), Haeckel's Embryos & Evolution: Setting the Record Straight. *The American Biology Teacher* 61: 5, pp. 345-349 (Published by: University of California Press)
- Matthew Cobb (2015), How fudged embryo illustrations led to drawnout lies. *NewScientist*, Issue 3004
- Elizabeth Pennisi (1997), Haeckel's Embryos: Fraud Rediscovered. *Science*, Vol. 277, Issue 5331, p. 1435
- পাঠ্যবইয়ে স্টিফেন হকিংয়ের বদলে নায়কের ছবি! দৈনিক শিক্ষা, ১০ অক্টোবর ২০১৭
- Michael K. Richardson (1998), Haeckel, Embryos and Evolution. Science 280 (5366):983-984 [মাইকেল রিচার্ডসন বুঝতে পারেন নি হেকেলকে নিয়ে তার কড়া বক্তব্য এতোটা প্রচার পাবে। প্রিন্টমিডিয়া, টেলিভিশন, অ্যাকাডেমিক মহলে তার আগের পেপার এতই উল্লেখ করা হতে থাকে যে উনি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যান। বিবর্তনবাদিদের থেকে তোপের মুখে পড়েন। তার ফলেই হয়তো সাইন্স-এ এই চিঠি পাঠিয়েছেন। চিঠিতে তিনি হেকেলের ভুলের কথা বলেছেন ঠিকই, কিন্তু এর দ্বারা ডারউইন ভুল প্রমাণিত হয় না – এই বক্তব্য রেখেছেন। এই পেপারে তিনি মেরুদণ্ডী প্রাণিদের মধ্যবর্তী ভ্রূণাবস্থার যে ছবি দিয়েছেন তাতে বৈসাদৃশ্য স্পষ্ট।]
- Scott F. Gilbert (2003, 2010), Developmental Biology (7th & 9th Edition, Sinauer Associates, Inc.) [লেখক আগের সংস্করণ গুলোতে নব্য-ডারউইনবাদের ভিত্তিগুলোর ভ্রান্তি জোরের সাথে দেখিয়েছেন। প্রাকৃতিক নির্বাচনের ব্যার্থতা আলোচনা করেছেন। কিন্তু নবম সংস্করণে সুর নরম করে ফেলেছেন, প্রত্যক্ষভাবে না বলে, পরোক্ষভাবে বলেছেন – নব্য-ডারউইনবাদের আয়ু শেষ।]
- Ernst Mayr (1970), Populations, Species, and Evolution: An Abridgment of Animal Species and Evolution (Harvard University Press) p. 253-254
- Alessandro Minelli (2015), Grand challenges in evolutionary developmental biology. *Front. Ecol. Evol.* 2:85
- Giuseppe Fusco & Alessandro Minelli (2010), Phenotypic plasticity in development and evolution: facts and concepts. *Phil. Trans. R. Soc. B* 365 : 547–556

www.QuranerAlo.net

পাথরের কথা

- Michael J. Benton & David A. T. Harper (2009), Introduction to Paleobiology & the Fossil Record (UK: Wiley Blackwell) p. 70 - 72
- গাজী আজমল ও গাজী আসমত (২০১৯), জীববিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি; পৃ. ৩৪৮
- ড. আবদুল আলীম (২০১৯), জীববিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি; পৃ. ৩৫৮
- প্রফেসর ড. নূর-ই-পারভীন খানম ও অন্যান্য (২০১৯), জীববিজ্ঞান। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি; পৃ. ৪০৭
- Stephen Dornbos et.al. (2016), A new Burgess Shale-type deposit from the Ediacaran of western Mongolia. Scientific Reports 6 : 23438
- প্রফেসর ড. নিশীথ কুমার পাল (২০১৪), বিবর্তনবিদ্যা (আলেয়া বুক ডিপো) পৃ. ২৬
- T.S. Kemp (1999), Fossils and Evolution (Oxford University Press) p. 16
- Matthew W. Pennell (2014), Is there room for punctuated equilibrium in macroevolution? Trends in Ecology & Evolution, Vol. 29, No. 1, p. 23-32
- Stephen C Meyer (2013), Darwin's Doubt: The Explosive Origin of Animal Life and the Case for Intelligent Design (New York: HerperOne)
- Alexander M. Dunhill (2014), Disentangling rock record bias and common-cause from redundancy in the British fossil record. Nature Communications, 5:4818
- Henry Gee (2013), The Accidental Species: Misunderstandings of Human Evolution (University of Chicago Press) p. 15-16
- Henry Gee (2000), In search of deep time: beyond the fossil record to a new history of life (Cornell University Press), p. 113-117

আর্কিওপটেরিক্স

- G.A. Kerkut (1960), Implications of evolution (Pergamon Press), p. 6
- প্রফেসর ড. নিশীথ কুমার পাল (২০১৪), বিবর্তনবিদ্যা, পৃ. ৬৩
- ড. জাফর ইকবাল (২০১৮), বিগ ব্যাং থেকে হোমো স্যাপিয়েনস (জ্ঞানকোষ প্রকাশনী) পৃ. ৩৯
- Henry Gee (1999), Of dinosaurs and dragons. Nature
- Henry Gee (2002), Fossil forgery's front half revealed. Nature
- ScienceDaily (2009), Oregon State University. "Discovery Raises New Doubts About Dinosaur-bird Links."
- ScienceDaily (2010), Oregon State University. "Bird-from-dinosaur theory of evolution challenged: Was it the other way around?."
- Alan Feduccia, Riddle of the Feathered Dragons: Hidden Birds of China (Yale University Press, 2014)
- Henry Gee (1998), Birds and dinosaurs - the debate is over. Nature
- R. A. Thulborn (1984), The Avian Relationships of Archaeopteryx and The Origin Of Birds. Zoological Journal of the Linnean Society, 82: 119-158
- Larry D. Martin (1985), The Relationship of Archaeopteryx to other birds in The Beginnings of Birds (Eichstatt: Freunde des Jura-Museums), p. 177
- John Schwartz, New Evolution Research Ruffles Some Feathers. The Washington Post, November 15, 1996

www.QuranerAlo.net

Contents

- Henry Gee, In search of deep time; p. 195-197
- Matt Kaplan, Archaeopteryx no longer first bird. Nature, July 2011
- Rowe, T., Ketcham, R., et al. The Archaeoraptor forgery. Nature 410, 539–540 (2001)

আধুনিক ঘোড়ার বিবর্তন

- Richard Gawne (2015), Fossil Evidence in the Origin of Species. *BioScience*, Vol. 65 No. 11
- প্রফেসর ড. নিশীথ কুমার পাল (২০১৪), বিবর্তনবিদ্যা (আলেয়া বুক ডিপো) পৃ. ৬৩
- গাজী আজমল ও গাজী আসমত (২০১৯), জীববিজ্ঞান। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি; পৃ. ৩৪৮
- প্রাগুক্ত
- প্রফেসর ড. নূর-ই-পারভীন খানম ও অন্যান্য (২০১৯), জীববিজ্ঞান। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি; পৃ. ৪০৭; মাজেদা বেগম ও অন্যান্য (২০১৯), জীববিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি; পৃ. ৪৭৮; প্রফেসর ড. নিশীথ কুমার পাল (২০১৪), বিবর্তনবিদ্যা, পৃ. ৬৩-৬৪
- ড. আবদুল আলীম (২০১৯), জীববিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি; পৃ. ৩৫৮
- Bruce J. MacFadden (2005), Fossil Horses—Evidence for Evolution. *Science*, 307:1718
- Christina I. Barrón-Ortiz (2019), What Is Equus? Reconciling Taxonomy and Phylogenetic Analyses. *Front. Ecol. Evol.*, vol. 7, article 343
- Elizabeth Pennisi (2018), Ancient DNA upends the horse family tree. *Science* | News. https://doi:10.1126/science.aat3998
- Bruce J. MacFadden et al. (2012), Fossil Horses, Orthogenesis, and Communicating Evolution in Museums. *Evo. Edu. Outreach* 5:29–37
- Encyclopædia Britannica, Evolution Of The Horse. Last update: October 2019

কঙ্কালের কান্না

- Lydia Pyne (2016), Seven Skeleton (Viking, epub edition)
- Ian Anderson (1983), Hominid Collarbone exposed as dolphine's rib. NewScientist
- Michal Kent (2000), Advanced Biology (Oxford: Oxford University Press) p. 458
- Bernard Wood (2005), Human evolution: A Very Short Introduction (Oxford: Oxford University Press), p. 63
- Constance Holden (1981), The Politics of Paleoanthropology. Science Vol. 213, Issue 4509, pp. 737-740
- Rex Dalton (2009), Fossil primate challenges Ida's place. Nature 461, 104
- Chris Beard (2009), Why Ida fossil is not the missing link. NewScientist
- Ewen Callaway (2017), Oldest Homo sapiens fossil claim rewrites our Species' History. Nature | News, doi:10.1038/nature.2017.22114
- Colin Barras (2019), Rare 3.8-million-year-old skull recasts origins of iconic 'Lucy' fossil. Nature | News, doi: 10.1038/d41586-019-02573-w

www.QuranerAlo.net

- Bernard Wood (2005), Human evolution, p. 69
- Henry Gee (2000), In search of deep time: beyond the fossil record to a new history of life (Cornell University Press), p. 32
- Geoffrey Clark (1997), Through a Glass Darkly: Conceptual Issues in Modern Human Origins Research, p. 60
- প্রফেসর ড. নিশীথ কুমার পাল (২০১৪), বিবর্তনবিদ্যা (আলেয়া বুক ডিপো) পৃ. ১৪২-১৪৩
- Seth Borenstein (2007), Fossils paint messy picture of human origins: New findings raise questions about who evolved from whom. The Associated Press, NBCNEWS
- Sid Perkins (2013), Skull suggests three early human species were one. Nature | News, doi:10.1038/nature.2013.13972
- Ernst Mayr (2004), What Makes Biology Unique? (Cambridge University Press) p. 198
- Bernard Wood (2014), Human evolution: Fifty years after Homo habilis. Nature 508:31-33
- Joe Alper (2003), Rethinking Neanderthals. Smithsonian Magazine Online

> “In the minds of the European anthropologists who first studied them, Neanderthals were the embodiment of primitive humans, subhumans if you will,” says Fred H. Smith, a physical anthropologist at LoyolaUniversity in Chicago who has been studying Neanderthal DNA. “They were believed to be scavengers who made primitive tools and were incapable of language or symbolic thought.”Now, he says, researchers believe that Neanderthals “were highly intelligent, able to adapt to a wide variety of ecologicalzones, and capable of developing highly functional tools to help them do so. They were quite accomplished.”

- Dr. Jon C. Sanford & Christopher Rupe (2019), Contested Bones (FMS Publications, 2nd print)
- Bernard Wood (2005), Human evolution, p. 55
- Gerard D.Gierlinski et.al. (2017), Possible hominin footprints from the late Miocene (c. 5.7 Ma) of Crete? Proceedings of the Geologists' Association, Vol. 128, Issues 5–6, p. 697-710
- Emily Chung (2018), One hell of an impression. CBCNews
- Jerry A. Coyne (2009), Why evolution is true (Oxford, Oxford University Press), p. 70
- Shaena Montanari (2016), 3.6-Million-Year-Old Early Human Footprints Have Been Discovered In Tanzania. Forbes
- Mark Collard & Leslie C. Aiello (2000), From forelimbs to two legs. Nature, vol. 404, p. 339–340
- Bernard Wood (2005), Human evolution, p. 55
- Gorilla Walks/Runs Upright Like a Man. BGS Video, Youtube.
see: https://youtu.be/0MXWMSXFigM
- Nick Ashton (2014), Hominin Footprints from Early Pleistocene Deposits at Happisburgh, UK. PLOS ONE, Volume 9, Issue 2, p. 1-13
- Michael A. Cremo (2014), Forbidden Archaeology. Talks at Google. https://

www.QuranerAlo.net

youtu.be/DKfGC3P9KoQ.

১৯৬০ সালে মেক্সিকোর হুয়েটলাকো-তে পাথরের তৈরি কিছু উন্নত সরঞ্জাম পাওয়া যায়। বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, কেবল আধুনিক মানুষই এমন হাতিয়ার তৈরিতে সক্ষম। আমেরিকার ন্যাশনাল সাইন্স ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে তিনজন গবেষক সেগুলোর বয়স নির্ধারণ করতে আসেন। তারা চারটি ভিন্ন-ভিন্ন পদ্ধতিতে এইসব সরঞ্জামের বয়স নির্ধারণ করে দেখেন, এই সরঞ্জামগুলো অন্তত ২.৫ লক্ষ বছর আগের! কিন্তু বিবর্তনের প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী ১ লক্ষ বছর আগে এমন হাতিয়ার পাওয়ার কথা না। গবেষকদের একজন ভার্জিনিয়া স্টিন-ম্যাকিনটায়ার অনেক চেষ্টা করেছেন তাদের গবেষণাপত্র প্রকাশ করতে। পরিণামে অপমান, গঞ্জনা, বঞ্চনা সহ্য করতে হয়েছে। ফসিলবিদেরা পাঠ্যপুস্তকে মানবেতিহাস নতুন করে লিখতে চান নি। প্রায় ২১ বছর পরে একটি জার্নালে তিনি গবেষণাপত্র প্রকাশে সক্ষম হন। ততদিনে হাতিয়ারগুলো লোকচক্ষুর অন্তরালে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এমনই অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিলন থমাস ই. লি। কানাডা'র ম্যানিটোলিন দ্বীপে ১৯৫০-এর দিকে সে-দেশের জাতীয় মিউজিয়ামের গবেষক থমাস ই. লি কিছু উন্নত পাথরের সরঞ্জাম খুঁজে পান। ওয়েইন স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূবিজ্ঞানী জন স্যানফোর্ড গবেষণা করে জানান, এই সরঞ্জামগুলো অন্তত ৬৫ হাজার থেকে ১ লক্ষ ২৫ হাজার বছরের পুরনো। কিন্তু বিবর্তনের অনুমান অনুযায়ী এসকল সরঞ্জাম তৈরি করতে সক্ষম আধুনিক মানুষ উত্তর আমেরিকাতে আসে মাত্র ১২ হাজার বছর পূর্বে! বিবর্তনবাদিরা কিছুতেই এ প্রমাণ মেনে নেয় নি। উপরন্তু থমাস-কে চাকরীচ্যুত করা হয়েছে, অপমান করা হয়েছে; সকল ফসিল-প্রমাণ জাদুঘরের স্টোর রুমে ফেলে তালা মেরে দেয়া হয়েছে। থমাস বুক ভরা আক্ষেপ নিয়ে বলেছিলেন, তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে! বিস্তারিত দেখুন: Michael Cremo & R.L. Thomson (2017), The Hidden History of The Human Race (Los Angeles, Bhaktivedanta Book Publishing Inc., 11th printng)

দ্য মিথ অফ ১%

- M. King & A. Wilson (1975), Evolution At Two Levels In Humans And Chimpanzees. Science 188:4184: 107-116.
- Elliott Sober (2008), Evidence and Evolution: The Logic behind the Science (Cambridge University Press), p. 296-297
- Jonathan Marks (2002), What It Means to Be 98% Chimpanzee: Apes, People, and Their Genes (University of California Press), p. 32-33
- Ibid, p. 34-35
- Giorgio Bernardi (2019), The Genomic Code: A Pervasive Encoding/ Molding of Chromatin Structures and a Solution of the "Non-Coding DNA" Mystery. BioEssays 1900106
- ScienceDaily (2011), Georgia Institute of Technology. 'Junk DNA' defines differences between humans and chimps.
- ড. জাফর ইকবাল (২০১৮), বিগ ব্যাং থেকে হোমো স্যাপিয়েনস, পৃ. ৫৩
- ড. আবুল হাসান (২০১৯), জীববিজ্ঞান প্রথম পত্র। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি, পৃ. ৬০
- Natalie Wolchover (2011), Chimps vs. Humans: How Are We Different? LiveScience
- Jeremy Taylor (2009), Not A Chimp: The Hunt to Find the Genes that Make Us Human (Oxford University Press), p. 73
- Trisha Gura (2000), Bones, molecules...or both? Nature, 406:230–233
- Jeremy Taylor (2009), Not A Chimp, p. 77

www.QuranerAlo.net

- Jon Sanford & Wesley Brewer (2015), The waiting time problem in a model hominin population. Theor Biol Med Model 12, 18 আরো দেখুন: M.J. Behe (2009), Waiting longer for two mutations. Genetics, 181:819–20.
- Jon Cohen (2007), Relative Differences: The Myth of 1%. Science, Vol. 316, Issue 5833, p. 1836

রয়েছো নয়নে নয়নে

- ড. জাফর ইকবাল (২০১৯), আরো একটুখানি বিজ্ঞান (কাকলী প্রকাশনী), পৃ. ৮৫
- Steven Stosny, Ph.D. (2014), What's Wrong with Criticism. Psychology today
- Richard Dawkins (1986), The Blind Watchmaker (New York: W.W. Norton), p. 93
- ড. জাফর ইকবাল (২০১৯), আরো একটুখানি বিজ্ঞান, পৃ. ৮৬-৮৭ (emphasis added)
- ড. জাফর ইকবাল (২০১৬), অক্টোপাসের চোখ (ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী) পৃ. ১২-১৩
- Louise A. Bye, Neil C. Modi & Miles Stanford (2013), Basic Sciences for Ophthalmology (Oxford: Oxford University Press), p. 70
- Rafael Simó et.el. (2010), The Retinal Pigment Epithelium: Something More than a Constituent of the Blood-Retinal Barrier—Implications for the Pathogenesis of Diabetic Retinopathy. Journal of Biomedicine and Biotechnology, 190724:1-15
- Margaret Wong-Riley (2010), Energy metabolism of the visual system. Eye and Brain 2:99–116
- Stuart H Ralston et.al. (2018), Davidson's Principles and Practice of Medicine (Elsevier, 23th edition) p. 1167
- Stephan Junek, Silke Agte et.al. (2011), Muller Glial Cell-Provided Cellular Light Guidance through the Vital Guinea-Pig Retina. Biophysical Journal 101:2611–2619
- Jonathan Webb (2015), Shape of eye's 'light pipes' is key to colour sorting. BBC News
- Kate Mcalpine (2010), 'Optical fibres' aid vision in our backward eyes. NewScientist [নিউসাইন্টিস্ট তাদের মূল ম্যাগাজীন সংখ্যায় উপরের শিরোনামে দিলেও, অনলাইন এডিশনে শিরোনাম দিয়েছে - Evolution gave flawed eye better vision- যাতে সাধারণ মানুষ ভুলেও ডিজাইন না ভাবতে পারে]
- A. M. Labin & E. N. Ribak (2010), Retinal Glial Cells Enhance Human Vision Acuity. Physical Review Letters, 104:158102
- Pablo Artal (2006), The human eye is an example of robust optical design. Journal of Vision, Vol.6, 1.
- Colin Blakemore & Shelia Jennett (2020), Blind spot in: The Oxford Companion to the Body. Encyclopedia.com.
- Francis Crick (1988), What Mad Pursuit: A Personal View of Scientific Discovery (New York, Basic Books, Inc.) p. 138-139
- John Hewitt (2014), Fiber optic light pipes in the retina do much more than simple image transfer. Phys.org

www.QuranerAlo.net

- Hayley Bennett (2018), The colour blind octopus that mastered the art of disguise. NewScientist
- ড. জাফর ইকবাল (২০১৬), অক্টোপাসের চোখ, পৃ. ১৫-১৬

এপেন্ডিক্স সরগরম

- Richard Dawkins (1986), The Blind Watchmaker (New York: W.W. Norton)
- Richard Dawkins in Nathan Frankowski (2008), Expelled: No Intelligence Allowed. IMDB
- ড. জাফর ইকবাল (২০১৯), আরো একটুখানি বিজ্ঞান, পৃ. ৮৯ (emphasis added)
- গাজী আজমল ও গাজী আসমত, জীববিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি, পৃ. ৩৪৬; প্রফেসর ড. নিশীথ কুমার পাল (২০১৪), বিবর্তনবিদ্যা (আলেয়া বুক ডিপো) পৃ. ৬৯
- Charles Darwin (1871), The Descent of Man and Selection in Relation to Sex (London: John Murray), vol-I, p. 27

> ‘..are either absolutely useless… or they are of such slight service to their present possessors, that we cannot suppose that they were developed under the conditions which now exist. Organs in this latter state are not strictly rudimentary, but they are tending in this direction.

- ড. জাফর ইকবাল (২০১৯), আরো একটুখানি বিজ্ঞান, পৃ. ৮৮
- ড. আবদুল আলীম, জীববিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি, পৃ. ৩৬০-৩৬১
- ScienceDaily (2017), Appendix may have important function, new research suggests. Midwestern University
- Christopher Wanjek (2006), The Appendix: Slimy But Not Worthless. LIveScience
- A.K. Dutta (2018), Essentials of Human Anatomy, Part-I (Kolkata: Current Books International), p. 189
- Professor Loren G. Martin (1999), What is the function of the human appendix? Did it once have a purpose that has since been lost? Scientific American
- Richard J. A. Berry (1900), The true caecal apex, or the vermiform appendix: Its minute and comparative anatomy. Journal of Anatomy and Physiology 35: 83–100.
- Amanda Macmillan (2017), Your Appendix May Not Be Useless After All. TIME Magazine
- Rob Dunn (2012), Your Appendix Could Save Your Life: The humble organ may help us recover from serious infections. Scientific American
- Gene Y. Im et.al. (2011), The appendix may protect against Clostridium difficile recurrence. Clinical Gastroenterology and Hepatology 9: 1072–1077
- ড. জাফর ইকবাল (২০১৯), আরো একটুখানি বিজ্ঞান, পৃ. ৮৮
- Kate Johnson (2019), The Human Appendix: Vital or Vestigial? Columbia Undergraduate Science Journal
- Heather F. Smith et.al. (2017), Morphological evolution of the mammalian cecum and cecal appendix. Comptes Rendus Palevol 16:39–57
- A.K. Dutta, Essentials of Human Anatomy, Part-I, p. 189

www.QuranerAlo.net

Contents

- Joseph A. Kuhn, MD (2012), Dissecting Darwinism. Proc (Bayl Univ Med Cent) 25(1): 41–47.
- ড. আবদুল আলীম, জীববিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি, পৃ. ৩৬১
- Guyton and Hall (2016), Textbook of Medical Physiology (Philadelphia: Elsevier, 13th edition) p. 466-467
- Stuart H Ralston et.al. (2018), Davidson's Principles and Practice of Medicine (Elsevier, 23th edition) p. 67, 79
- PL Dhingra & S Dhingra, Diseases of Ear, Nose and Throat & Head and Neck Surgery (Elsevier, 6th Edition) p. 257
- Sean G. Byars et.al. (2018), Association of Long-Term Risk of Respiratory, Allergic, and Infectious Diseases With Removal of Adenoids and Tonsils in Childhood. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 144(7):594–603.
- Dr. Robert Sargis MD, PhD (2014), An Overview of the Pineal Gland: Maintaining Circadian Rhythym. EndocrineWeb
- Laura Spinney (2008), Vestigial organs: Remnants of evolution. NewScientist
- বিজ্ঞান। নবম-দশম শ্রেণি (২০১৯) পৃ. ১০৪; প্রফেসর ড. নিশীথ কুমার পাল (২০১৪), বিবর্তনবিদ্যা, পৃ. ৬৯
- Lesley Smallwood Lirette (2014), Coccydynia: An Overview of the Anatomy, Etiology, and Treatment of Coccyx Pain. *Ochsner J.* 14(1): 84–87
- Sarah J. Gaskill & Arthur E. Marlin (1989), Neuroectodermal appendages: the human tail explained. *Pediatr Neurosci*, 15(2):95-9

‘One of the earliest etiological explanations for the 'human tail' was that it was a remnant of the embryologic tail seen during gestation. There are several problems with this theory, the most obvious being that these occur in locations other than the embryologic sacrococcygeal region. Additionally, there have been no reports in the literature of bony elements or even cartilaginous elements in association with these tails as we see them in development. These two facts would tend to discount the hypothesis that these tails are remnants from early development... In conclusion, neuroectodermal appendages are midline, posterior, papillary structures formed as an extension of a congenital dermal sinus tract.

- Fabiola Muller and Ronan O'Rahilly (2004), The Primitive Streak, the Caudal Eminence and Related Structures in Staged Human Embryos. Cells, Tissues, Organs 177: 2–20

‘The eminence produces the caudal part of the notochord and, after closure of the caudal neuropore, all caudal structures, but it does not produce even a temporary 'tail' in the human... The term tail-bud or Schwanzknospe, however, should be used for tailed species only, and hence is not appropriate for the human, despite the etymology of the word 'caudal'.

- প্রফেসর ড. নিশীথ কুমার পাল (২০১৪), বিবর্তনবিদ্যা, পৃ. ৬৯
- Laura Spinney (2008), Vestigial organs: Remnants of evolution. NewScientist
- ড. জাফর ইকবাল (২০১৮), বিগ ব্যাং থেকে হোমো স্যাপিয়েনস, পৃ. ৪০
- ড. জাফর ইকবাল (২০১৯), আরো একটুখানি বিজ্ঞান, পৃ. ৮৮-৮৯
- প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯

www.QuranerAlo.net

দি ডিসেপশন পয়েন্ট

- রাফান আহমেদ (২০১৯), অবিশ্বাসী কাঠগড়ায় (ঢাকা: সমর্পন প্রকাশন) পৃ. ১০০-১০৮
- Henry Gee (2013), Science: The religion that must not be questioned. The Gurdian

> Why do we … demand such definitive truths of science, but are happy to have all other spheres of human activity wallow in mess and muddle? I think it goes back to the mid-20th century, especially just after the second world war, when scientists – they were called "boffins" – gave us such miracles as radar, penicillin and plastics; jet propulsion, teflon, mass vaccination and transistors; the structure of DNA, lava lamps and the eye-level grill. They cracked the Enigma, and the atom. They were the original rocket scientists, people vouchsafed proverbially inaccessible knowledge. They were wizards, men like gods, who either had more than the regular human complement of leetle grey cells, or access to occult arcana denied to ordinary mortals. They were priests in vestments of white coats, tortoiseshell specs and pocket protectors. We didn't criticise them. We didn't engage with them – we bowed down before them…. And all this because scientists weren't honest enough, or quick enough, to say that science wasn't about Truth, handed down on tablets of stone from above, and even then, only to the elect; but Doubt, which anyone (even girls) could grasp, provided they had a modicum of wit and concentration. It wasn't about discoveries written in imperishable crystal, but about argument, debate, trial, and – very often – error.

- James A. Herrick (2008), Scientific Mythologies: How Science and Science Fiction Forge New Religious Beliefs (IVP Academic)
- BBC (2020), Helen Sharman: Aliens exist and could be here on Earth. https://www.bbc.com/news/uk-51003374
- Michael Shermer (2016), Skeptic: Viewing the World with a Rational Eye (New York: Henry Holt), p. 125
- Richard Dawkins (2008), The God Delusion (Houghton Mifflin Co.) p. 98
- Lee Billings (2015), Alien Supercivilizations Absent from 100,000 Nearby Galaxies. *Scientific American*
- Jim Al Khalili (2018), Aliens may not exist – but that's good news for our survival. The Guardian
- HuffPost (2011), Stephen Hawking: Humans Should Fear Aliens
- Guillermo Gonzalez (2014), Setting the Stage for Habitable Planets. *Life* 4:35-65
- Howard A. Smith (2011), Alone in the Universe. *American Scientist*, Vol. 99, p. 320-327
- প্রথম আলো (২০২০), অ্যাভেঞ্জার্স এন্ডগেমের অগ্রিম টিকিট নিয়ে কাড়াকাড়ি। ইউটিউব https://youtu.be/velHWsywJXk
- Frank D. Drake and Dava Sobel (1992), Is Anyone Out There? The Scientific Search for Extraterrestrial Intelligence (New York: Delacorte Press) p. 160
- Encyclopaedia Britannica Online (2015), SETI https://www.britannica.com/event/SETI
- Rachael Revesz (2017), Nasa Offering Six-Figure Salary for New 'Planetary

www.QuranerAlo.net

Contents

Protection Officer' to Defend Earth from Aliens. The Independent
- Martin Rees qioted in John Brockman (etd., 2006), What We Believe but Cannot Prove (Perfectbound) p. 1-2
- Steven J. Dick (2001), Life on Other Worlds: The 20th-Century Extraterrestrial Life Debate (Cambridge: Cambridge University Press) p. 252-254
- Islam QA (2000), Who is the Dajjaal and what are his attributes?

৬ ইসলামের অবস্থান হলো দাজ্জাল অ্যালিয়েন নয়। বরং সে বনী আদমের অন্তর্গত। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায়:

একবার সাহাবি তামীম আদ্ দারী (রাযি:) লাখ্ম ও জুযাম গোত্রের ত্রিশজন লোকসহ একটি সামুদ্রিক জাহাজে আরোহণ করেছিল। সামুদ্রিক ঝড় এক মাস পর্যন্ত তাদেরকে নিয়ে খেলা করতে থাকে। অত:পর সূর্যাস্তের সময় তারা সমুদ্রের এক দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করে। তারপর তারা ছোট ছোট নৌকায় বসে ঐ দ্বীপে প্রবেশ করে। দ্বীপে নামতেই জন্তুর ন্যায় একটি জিনিস তাদের দেখতে পায়। তার পূর্ণ দেহ পশমে ভরা ছিল। পশমের কারণে তার আগাগোড়া চেনার উপায় ছিল না। লোকেরা তাকে বলল, হতভাগা, তুই কে? সে বলল, আমি জাস্সা-সাহ্। লোকেরা বলল, 'জাস্সা-সাহ্' আবার কি? সে বলল! ঐ যে গীর্জা দেখা যায়, সেখানে চলো। সেখানে এক লোক গভীর আগ্রহে তোমাদের অপেক্ষা করছে। তামীম আদ্ দারী বলেন, তার মুখে এক লোকের কথা শুনে আমরা ভয়ে শঙ্কিত হলাম যে, সে আবার শাইতান নয় তো! আমরা দ্রুত পদব্রজে গীর্জায় প্রবেশ করতেই এক দীর্ঘাকৃতির এক লোককে দেখতে পেলাম। ইতোপূর্বে এমন আমরা আর কক্ষনো দেখিনি। লোহার শিকলে বাঁধা অবস্থায় দু' হাটুর মধ্য দিয়ে তার উভয় হাত ঘাড়ের সাথে মিলানো। আমরা তাকে বললাম, তোর সর্বনাশ হোক, তুই কে? সে বলল, তোমরা আমার সন্ধান কিছু না কিছু পেয়েই গেছ। এখন তোমরা বলো, তোমাদের পরিচয় কি? তারা বলল, আমরা আরবের বাসিন্দা। আমরা সমুদ্রে নৌকায় চড়ে ভ্রমণ করছিলাম। আমরা সমুদ্রকে উত্তাল তরঙ্গে উদ্বেলিত অবস্থায় পেয়েছি। এক মাস পর্যন্ত ঝড়ের কবলে থেকে অবশেষে আমরা তোমার এ দ্বীপে এসে পৌঁছেছি। অত:পর ছোট ছোট নৌকায় আরোহন করে এ দ্বীপে আমরা প্রবেশ করেছি।... সে বলল, তোমরা আমাকে বাইসানের খেজুর বাগানের সংবাদ বলো। আমরা বললাম, এর কোন্ বিষয়টি সম্পর্কে তুই সংবাদ জানতে চাচ্ছিস? সে বলল, বাইসানের খেজুর বাগানে ফল আসে কি না, এ সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করছি। তাকে আমরা বললাম, হ্যাঁ, আছে। সে বলল, সেদিন নিকটেই যেদিন এগুলোতে কোন ফল ধরবে না। তারপর সে বলল, আচ্ছা, তিবরিয়্যা সমুদ্রের ব্যাপারে আমাকে অবগত করো। আমরা বললাম, এর কোন্ বিষয় সম্পর্কে তুই আমাদের থেকে জানতে চাচ্ছিস? সে বলল, এর মধ্যে পানি আছে কি? তারা বলল, হ্যাঁ, সেখানে বহু পানি আছে। অত:পর সে বলল, সেদিন বেশী দূরে নয়, যখন এ সাগরে পানি থাকবে না। সে আবার বলল, 'যুগার'-এর ঝর্ণার ব্যাপারে তোমরা আমাকে অবহিত করো। তারা বলল, তুই এর কি সম্পর্কে আমাদের নিকট জানতে চাচ্ছিস? সে বলল, এর ঝর্ণাতে পানি আছে কি? আর এ জনপদের লোকেরা তাদের ক্ষেত্রে এ ঝর্ণার পানি দেয় কি? আমরা বললাম, হ্যাঁ, এতে অনেক পানি আছে এবং এ জনপদের লোকেরা এ পানির মাধ্যমেই তাদের ক্ষেত আবাদ করে। সে আবার বলল, তোমরা আমাকে উম্মীদের নাবীর ব্যাপারে খবর দাও। সে এখন কি করছে? তারা বলল, তিনি মাক্কাহ্ থেকে হিজরত করে মাদীনায় চলে এসেছেন। সে জিজ্ঞেস করল, আরবের লোকেরা তার সাথে যুদ্ধ করেছে কি? আমরা বললাম, হ্যাঁ, করেছে। সে বলল, সে তাদের সঙ্গে কিরূপ আচরণ করেছে। আমরা তাকে খবর দিলাম যে, তিনি আরবের পার্শ্ববর্তী এলাকায় জয়ী হয়েছেন এবং তাঁরা তার বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে। সে বলল, এ কি হয়েই গেছে? আমরা বললাম, হ্যাঁ। সে বলল, বশ্যতা স্বীকার করে নেয়াই জনগনের জন্য কল্যাণকর ছিল। এখন আমি নিজের ব্যাপারে তোমাদেরকে বলছি, আমিই মাসীহ্ দাজ্জাল। অতি সত্বরই আমি এখান থেকে বাইরে যাবার অনুমতি পেয়ে যাব। বাইরে যেয়ে আমি সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠ প্রদক্ষিণ করব। চল্লিশ দিনের ভেতর এমন কোন জনপদ থাকবে না, যেখানে আমি

www.QuranerAlo.net

প্রবেশ না করব। তবে মাক্কাহ্ ও তাইবাহ্ এ দু'টি স্থানে আমার প্রবেশ নিষিদ্ধ। ... [বুখারি (ইসলামিক ফাউন্ডেশন), হাদিস ৭১১]
- Abu Jakaria (2019), The Forbidden Prophecies (London: iERA Publication)

পরিশিষ্ট ১

- Daniel Dennett (1996), Darwin's Dangerous Idea: Evolution and the Meanins of Life (New York: Simon and Schuster) p. 63
- Whitley R.P. Kaufman (2016), Human Nature and the Limits of Darwinism (New York: Springer Nature) p. 68
- Francis Crick (1994), The Astonishing Hypothesis: The Scientific Search for the Soul (New York: Charles Scribner's Sons) p. 262
- Max Tegmark, Our Mathematical Universe (Vintage Books, 2015) p. 05
- Donald Hoffman (2019), The Case Against Reality: How Evolution Hid the Truth from Our Eyes (London: W. W. Norton & Company Ltd.)

পরিশিষ্ট ২

- Richard Dawkins (2008), The God Delusion (London: Bantam Press) p. 14
- Philosophy Basics, Article: Naturalism. Available at: https://www.philosophybasics.com/branch_naturalism.html

> Naturalism is the belief that nature is all that exists, and that all things supernatural (including gods, spirits, souls and non-natural values) therefore do not exist. It is often called Metaphysical Naturalism or Philosophical Naturalism or Ontological Naturalism to distinguish it from Methodological Naturalism

- Robert Stewart (ed. 2007), Intelligent Design: William A. Dembski & Michael Ruse in Dialogue (Minneapolis, MN: Fortress Press) p.37
- রায়হান আবীর ও অভিজিৎ রায় (২০১৬), অবিশ্বাসের দর্শন (ঢাকা: শুদ্ধস্বর প্রকাশন, ৪র্থ সংস্করণ) প্রথম সংস্করণের ভূমিকা
- Raymond Tallis (2004), Why the Mind Is Not a Computer: A Pocket Lexicon of Neuromythology (Societas; 2nd edition) p. 25-16
- RT News (2012), Scientists only understand 4% of universe
- রায়হান আবীর ও অভিজিৎ রায় (২০১৬), অবিশ্বাসের দর্শন, পৃ. ২৯
- Hugh G. Gauch (2012), Scientific Method in Brief (Cambridge University Press) p. 98
- Lee Billings (2019), Atheism Is Inconsistent with the Scientific Method, Prizewinning Physicist Says. Scientific American
- Suzan Mazur (2013), Evolution Scientist Carl Woese Dies: The Most Important Evolution Scientist of the 20th Century. Huffpost
- তসলিমা নাসরিন, ফেইসবুক পোস্ট, ২৭ অক্টোবর ২০১৮। [http://archive.is/0QAAM]

www.QuranerAlo.net

Contents

সন্ধান

অ

অক্টোপাস ১২৩-১২৪, ১২৮
অগাস্ট ভাইজম্যান ৭৪
অজ্ঞাত-পদার্থ (Dark matter) ৩৪-৩৫
অজ্ঞাত-শক্তি (Dark energy) ৩৪-৩৫
অটল মহাবিশ্ব মডেল ৩১
অনুকল্প ৫১
অন্ধবিন্দু ১২৬
অপারিন ও হ্যলডেন ৭৯
অরোরা ৪১
অস্ট্রালোপিথিকাস ১১২-১১৫, ১১৯

আ/A

আইনস্টাইন ২৮-৩১, ৩৫, ৩৯, ৪৬
আইডা ১১১-১১২
আইজ্যাক নিউটন ২৭-২৮
আকাশগঙ্গা ১৮
আর্কিওপটেরিক্স ১০৩-১০৫
আর্কিওরেপ্টর ১০৫
আর্ডিপিথিকাস ১১২
আর্নেস্ট মায়ার ৬৬, ৯৮
আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস ৬৪-৬৫
আলেক্সান্ডার ফ্রিডম্যান ৩০
অ্যাডাম স্মিথ ২১
অ্যানালজি ৭০
অ্যান্ড্রোমিডা ১৯
অ্যাবডোমিনাল টনসিল ১৩১
অ্যালগরিদম ২৪
অ্যালিয়েন ১৩৯-১৪৩
অ্যাস্ট্রোল্যাব ২৫
Assumptions of science ৪৬

ই/E

ইকোলজিক্যাল প্রজাতি ৭৬
ইনফ্লেশন ৩২-৩৩
ইনডাকশন ৫২-৫৩, ৫৫
ইভো-ডিভো ৯৬, ৯৮

উ/U

উপগ্রহ ১৮
UV-B ৪১
UNESCO ৬৬

এ

এনকোড প্রজেক্ট ৮৭-৮৮
এপেন্ডিক্স ১২৯-১৩২
এমিবা ৭৯

ক/K

ককসিক্স ১৩২-১৩৩
কিং ও উইলসন ১১৭
কুফী বর্ণমালা ২৪
কোকা-কোলা ৫৭
কোডিং এলাকা ৮৭, ১১৮, ১২০
কোয়ান্টাম মেকানিক্স ৩৫-৩৬
ক্যামব্রিয়ান বিস্ফোরণ ৭৩, ১০১-১০২
ক্যারোলাস লিনিয়াস ৭০

খ

খচ্চর ৭৬

গ

গর্ভধারণ ১২২
গোল্ডেন এইজ ২১
গোল্ডিলকস জোন ৩৯
গ্রহ ১৮
গ্রহাণু ১৮
গ্যালাক্সি ১৮, ২৯, ৩১, ৩৬, ৭৯

ঘ

ঘোড়ার বিবর্তন ১০৭-১০৮

চ

চাঁদ ১৭, ১৯, ৩৯-৪১
চার্লস লায়েল ৬০

ছ/C

ছায়াপথ ১৮
central dogma ৮৭, ৯০

www.QuranerAlo.net

Contents

coding region ৮৭

জ/G

জজ ওয়াল্ড ৯৩
জর্জ ল্যামেটার ৩০-৩১
জুপিটার ৪০-৪১
জুলিয়ান হাক্সলি ৬৬,
জেনারেল রিলেটিভিটি ২৮, ৩৫
জেনেটিক কোড ৮৯-৯০
জোনাকি ১৬
টমাস ম্যালথাস ৬১
Gemmules ৬৩

ট/T

টনসিল ১৩২-১৩৩
Theory Ladenness ৫২
Tree of Life ৭০, ৭৩

ড/D

ডলফিন সঙ্ঘ ১৪০-১৪১
ডারউইন ৫০, ৫৪, ৫৭, ৬১, ৬৩-৬৬, ৭১, ৭৩-৭৪, ৭৯, ৯৪-৯৬, ১০১-১০২, ১০৪,
ডারউইনের বুলডগ ৬৪
ডায়নোসর ৬৫, ১০৪-১০৫
ডেভিড এটেনব্রা ১১২
ডেভিড গার্লেন্টার ৭৮
Descent with modifcation ৬৩

ত

ত্রিকোণমিতি ২৪
ত্রিত্ববাদ ২৮

থ

থাইমাস ১৩২
থিওডোসিয়াস ডবঝানস্কি ৬৬, ৭৫

ধ

ধর্ম ২১, ২৪, ৩০, ৩৭, ৪৬-৪৭, ৫০, ৫৭, ৬৪-৬৭, ৭৮, ১২১, ১৩৮, ১৪৩
ধূমকেতু ১৮

ন/N

নব্য-ডারউইনবাদ ৫৪, ৭৪-৭৫, ৯৬
নাসা ৩৩, ৪০-৪১
নিউট্রিনো ১৯, ৩৪
নিয়েনডারথাল ১১৪
নীহারিকা ১৮-১৯
নোবেল ৩৫, ৫৬
natural history museum ৬৪

প/P

পল এম. ডিরাক ২৭
পরিসংখ্যান ৫১, ৫৩
পাদ্রি ৫০
পিনিয়াল গ্রন্থি ১৩৩
পিয়ার রিভিউ ২৫, ৫৬
পিল্টডাউন ম্যান ১০০
পুনরাবৃত্তি মতবাদ ৯৪-৯৫,
প্রকৃতিবাদ ৪৭-৪৯, ৬৯, ৭৯
প্রক্সিমা সেন্টোরি ১৯
প্লাজমা ১৮-১৯
P Value ৫৩, ৯৩, ১১৭
Pale blue dot ১৯
Paradigm shift ৫২
Post-transcriptional modifcation ৮৮
Post-translational modifcation ৮৮
Problem of Induction ৫২
Problem of underdetermination ৫২
Project Ozma ১৪১
Punctuated equilibrium ১০২

ফ/F

ফাইন-টিউনিং ৩৮, ৪২
ফিনোটাইপিক প্লাস্টিসিটি ৯৮
ফিঞ্চ ৭৬
ফেইসবুক ৪৪
ফ্রান্সিস ক্রিক ৮৪, ৮৬, ১২৭
ফ্রেড হয়েল ৩১
FM Radio 38

ব/B

বর্ণবাদ ৫৭
বর্ণান্ধ ১২৮
বাইবেল ২৭
বায়োলজিক্যাল প্রজাতি ৭৬

www.QuranerAlo.net

Contents

বাংলাদেশ ৯১
বিজ্ঞানবাদ ৪৪, ৫০, ৫৫, ১৪৩
বীজগণিত ২৪

ভ/V

ভন বেয়ার ৯৪, ৯৬
ভয়েজার-১ ১৯
ভইজম্যান বাধা ৭৪-৭৫
ভিক্টোরিয়ান ইউরোপ ৫০, ৬০, ৬৪
ভূত এফএম ৩৮
ভ্যারিয়েন্ট কোড ৮৯, ৯১

ম/M

মথপোকা ৬২
মডার্ন সিন্থেসিস ৬৬-৬৭
মহাজাগতিক ডিম ৩০
মার্টিন রিস ১৪২-১৪৩
মাল্টিভার্স ৪৭-৪৮
মিল্কিওয়ে ১৮
মিলার-উরি ৮১-৮৩
মুলার কোষ ১২৬
মোনালিসা ১১২
মৌলিক বল ৩৮
ম্যাক্রোবিবর্তন ৭৫-৭৭, ৯৬
Methodological naturalism ৪৭

য/J

যাকাত ২৪
যুদ্ধ ২০
Junk DNA/ DNA আবর্জনা ৮৭-৮৯, ১১৮

র/R

রজার বেকন ২৫
রয়াল সোসাইটি ৬৭
রিচার্ড ফাইনম্যান ২৭, ৩৫
রেটিনা ১২৩-১২৭
RNA World ৮৪

ল/L

লিন মার্গুলিস ৭৭
লেতোলি, তানজানিয়া ১১৫
ল্যামার্ক ৬০-৬১

শ

শপিং ট্রলি ১১১
শয়তানের চার্চ ৬৬
শিম্পাঞ্জি ১০৯-১২১

স/S

সালামান্ডার ৭৬
সিঙ্গুলারিটি ৩২
স্টিফেন হকিং ৩৮, ৫২, ৯৬, ১৪০
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ১১১
সূর্য ১৮, ৩৯
সৌরঝড় ৪১
semantic information ৯১

হ/H

হাবল, এডুইন পাওয়েল ৩০-৩১, ৩৩
হাক্সলি, থমাস ৬৪-৬৫
হাসান ইবনু হাইসাম ২৪
হেকেল, আর্নেস্ট ৯৪-৯৭
হেনরি গী ৬৮ ,১০৩
হোমিনিড ১১০-১১৪
হোমো হ্যাবিলিস ১১২, ১১৪
হোমো হ্যাবিলিস ১১৪
হোমোপ্লেইজি ৭২
হোমোলজি ৬৯-৭৩, ১০১
Horizontal gene transfer ৭৩

W

waiting time problem ১১৯-১২০
warm little pond ৭৯

www.QuranerAlo.net